বিশ্বভারতী
পত্রিকা
সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কার্তিক-পৌষ ১৩৫১

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বসন্তবাহার

শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্বানুবৃত্তি

রবিবার [২৬ অক্‌টোবর ১৮৯০]। সকাল থেকে একটু ঝোড়ো রকম হয়ে আছে। সকলেই আক্ষেপ করচে জাহাজে রবিবার অত্যন্ত dull— সময় কাটে না। মেয়েদের মধ্যে একটা খুব excitement, চিত্রবিচিত্র বনেট মাথায় দিয়ে রাবিবারিক বেশ পরিধান।— ইংরেজ মেয়েদের বনেটের উপর ভারি ঝোঁক— বনেটে পরস্পরকে হারিয়ে দেওয়া একটা জীবনের লক্ষ্য। Miss Mull, Miss Oswald সকলেই বনেট বনেট করে অস্থির— কিন্তু আমার চোখে অধিকাংশ বনেট অত্যন্ত কুৎসিত এবং বর্ব্বর বলে ঠেকে। আর এক সপ্তাহ। নিশিদিন উল্‌টে পাল্‌টে কেবল কলকাতার ছবি মনে করচি।

জাহাজের দিন :— সকালে ডেক্ ধুয়ে দিয়ে গেছে— এখনো ভিজে রয়েছে— দুইধারে ডেকচেয়ার বিশৃঙ্খলভাবে রাশিকৃত ;— খালি পায়ে রাতকামিজ পরা পুরুষগণ কেউবা বন্ধুসঙ্গে কেউবা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্চে— ক্রমে যখন আটটা বাজ্‌ল এবং একটি আধটি করে মেয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান। স্নানের ঘরের সম্মুখে ভয়ানক ভিড়— তিনটি মাত্র স্নানের ঘর, আমরা জন চল্লিশেক লোক— সকলেই হাতে একটি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ নিয়ে দ্বারমোচনের অপেক্ষায় আছে— দশ মিনিটের বেশি স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই। স্নান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়েছে— ঘনঘন টুপি উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক মহিলাদের এবং পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদন-পূর্ব্বক শীত-গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করা গেল। ক্ষণেক বাদে নটার সময় ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল— Breakfast প্রস্তুত, বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপান পথ দিয়ে নিম্নকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে— ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট রইল না, কেবল সারি সারি শূন্যহৃদয় চৌকি ঊর্দ্ধমুখে প্রভুদের জন্যে অপেক্ষা করে রইল। ভোজনশালা প্রকাণ্ড ঘর— মাঝে দুইসার লম্বা টেবিল, এবং তার দুই পাশে খণ্ড খণ্ড ছোট ছোট টেবিল— আমরা দক্ষিণপার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র টেবিল অবলম্বন করে সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুধা নিবৃত্তি করে থাকি। মাংস, রুটি, ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরা এবং হাস্যকৌতুক গল্পগুজবে এই অনতিউচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ-নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়— ডেক ধোবার

সময় কার চৌকি কোন্‌খানে টেনে নিয়ে রেখেচে তার ঠিক নেই— তার পরে চৌকি খুঁজে নিয়ে আপনার জায়গাটুকু গুছিয়ে নেওয়া বিষম দায়— যেখেনে একটু কোণ, যেখেনে একটু বাতাস, যেখেনে একটু রৌদ্রের তেজ কম, যেখেনে যার অভ্যেস সেইখেনে ঠেলে ঠুলে টেনে টুনে পাশ কাটিয়ে পথ করে আপনার চৌকিটি রাখ্‌তে পারলে তার পরে সমস্ত দিনের মত নিশ্চিন্ত। তার পরে দেখা যায় কোন চৌকিহারা ম্লানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করচে, কিম্বা কোন বিপদ্‌গ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে আপনার চৌকিটি বিশ্লিষ্ট করে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারচে না, তখন আমরা পুরুষগণ নারী-সহায়ব্রতে চৌকি-উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে সুমিষ্ট ধন্যবাদ উপার্জ্জন করে থাকি। তার পরে যে-যার চৌকি-অধিকার করে বসে যাওয়া যায় — ধূম্রসেবীগণ হয় ধূমকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্ত মনে ধূমপান করচে। মেয়েরা অর্দ্ধনিলীন অবস্থায় কেউবা নভেল পড়চে, কেউবা সেলাই করচে— মাঝে মাঝে দুই একজন যুবক ক্ষণেকের জন্যে পাশে বসে মধুকরের মত কানের কাছে সহাস্য গুন্‌গুন্‌ করে আবার চলে যাচ্চে। আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্রই Quoit খেলা আরম্ভ হল। দুটি বাল্‌তি পরস্পর থেকে হাত-দশেক দূরে স্থাপিত হল— দুইযুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধীপক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বস্ব স্থান থেকে কতকগুলি রজ্জুচক্র বিপরীত বাল্‌তির মধ্যে নিক্ষেপ করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল— যে পক্ষ সর্ব্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারি জিৎ। কেউবা দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, কেউবা গণনা করতে লাগ্‌ল, কেউবা যোগ দিলে, কেউবা আপন আপন পড়ায় কিম্বা গল্পে নিবিষ্ট হয়ে রইল। একটার সময় lunchএর ঘণ্টা বাজ্‌ল। আবার একচোট আহার। তার পরে উপরে গিয়ে দুই স্তর খাদ্যের ভারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত, আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্চে, কেদারায় হেলান্‌ দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ নীলনয়নে নিদ্রাবেশ হয়ে আস্‌চে; কেবল দুই একজন পাশাপাশি বসে দাবা, backgammon কিম্বা draft খেল্‌চে, এবং দুই একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্তদিন Quoit খেল্‌চে— কোন রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখ্‌চে এবং কোন শিল্পকুশলা কৌতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহযাত্রীর ছবি আঁকবার চেষ্টা করচে। ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল, তখন তাপক্লিষ্ট ক্লান্তকায়গণ নীচে নেবে এসে রুটিমাখন মিষ্টান্ন সংযোগে চা-রসপান করে শরীরের জড়তা পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্ব্বার যুগলমূর্ত্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং হাস্যালাপ আরম্ভ হল। কেবল দুচারজন পাঠিকা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারচে না, দিবাবসানের ক্ষীণালোকে একান্ত নিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করচে। দক্ষিণে জলন্ত কনকাকাশ এবং অগ্নিবর্ণ জলরাশির মধ্যে সূর্য্য অস্ত গেল, এবং বামে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্ব হতেই চন্দ্রোদয় হয়েচে— জাহাজ থেকে পূর্ব্বদিগন্ত পর্য্যন্ত বরাবর জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্‌ ঝিক্‌ করচে— পূর্ণিমার সন্ধ্যা যেন নীল সমুদ্রের উপর আপনার শুভ্র অঙ্গুলি স্থাপন করে আমাদের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত পূর্ব্বভারতবর্ষের পথ নির্দ্দেশ করে দিচ্চে। জাহাজের ডেকের উপর এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে উঠ্‌ল। ছটার সময়ে ডিনারের প্রথম ঘণ্টা বাজ্‌ল— বেশপরিবর্ত্তনের জন্যে স্বস্ব ক্যাবিনে প্রবেশ করলে— তার পরে আধঘণ্টা বাদে যখন দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজ্‌ল— ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল— সারিসারি নরনারী বসে গেছে, কারো বা কালো কাপড়, কারো বা রঙীন্‌ কাপড়, কারো বা শুভ্রবক্ষ অর্দ্ধ অনাবৃত, মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুৎ আলোক জ্বলচে, গুন্‌গুন্‌ আলাপের

সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাচামচের ঝন্‌ঝন্ টুংটাং শব্দ উঠ্‌চে— এবং বিচিত্র খাদ্যের পর্য্যায় পরিচারকদের হাতে হাতে স্রোতের মত যাতায়াত করচে। আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল বায়ু সেবন— কোথাওবা যুবকযুবতী অন্ধকার একটি কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গুন্‌গুন্ করচে, কোথাওবা দুজনে জাহাজের বারান্দা ধরে ঝুঁকে পড়ে রহস্যালাপে নিমগ্ন, কোন কোন যুগল সহাস্য গল্প করতে করতে আলোক এবং অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দ্রুতপদে চলে বেড়াচ্চে— কোথাওবা একধারে পাঁচসাতজন স্ত্রীপুরুষে জটলা করে উচ্চহাস্য এবং বিবিধ প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বসিত করে তুল্‌চে,— অলস পুরুষরা কেউবা বসে কেউবা দাঁড়িয়ে কেউবা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় চুরট খাচ্চে— কেউবা Smoking saloonএ কেউবা নীচে খাবার ঘরে Whisky soda পাশে নিয়ে চার চার জনে দল বেঁধে Whist খেল্‌চে। এদিকে Music saloonএ সঙ্গীতপ্রিয় দুচারজনের সমাবেশ হয়েচে— গানবাজনা এবং মধ্যে মধ্যে করতালি শোনা যাচ্চে। মাঝে মাঝে নৃত্যের আয়োজন হয়— কিন্তু পুরুষনর্ত্তকদের স্বভাবসিদ্ধ আলস্য এবং অমনোযোগিতাবশতঃ কিছুদিন থেকে নাচ তেমন জম্‌চে না। ক্রমে সাড়ে দশটা বাজে, মেয়েরা নেবে যায়— ডেকের উপরের আলো হঠাৎ নিবে যায়— ডেক্ নিঃশব্দ নির্জ্জন অন্ধকার হয়ে আসে— এবং চারিদিকে নিশীথের নিস্তব্ধতা, চন্দ্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের চিরকলধ্বনি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সোমবার [২৭ অক্‌টোবর]। Red Seaর গরম ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌চে। ডেকের উপরে মেয়েরা সমস্ত দিন তৃষাতুর হরিণীর মত pant করচে, রৌদ্রদগ্ধ ফুলের মত তাদের তাপক্লিষ্ট ম্লানমুখ দেখে দুঃখ হয়। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে ধীরে ধীরে পাখা নাড়চে, স্মেলিং সল্ট শুঁকচে— এবং যুবকেরা যখন পাশে এসে করুণস্বরে কুশল জিজ্ঞাসা করচে তখন নিমীলিতপ্রায় নেত্রপল্লব অলসভাবে ঈষৎ উন্মীলন করে ম্লান সহাস্যে গ্রীবাভঙ্গীদ্বারা ইঙ্গিতে আপন দুরবস্থা ব্যক্ত করচে; কিন্তু যতই Lemon Squash এবং পরিপূর্ণ করে lunch খাচ্চে ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়চে, ততই নেত্র নিদ্রালস এবং সর্ব্বশরীর শিথিল হয়ে আস্‌চে। আমাকে কেউ কেউ ঈষৎ ক্রোধের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করচে— I suppose *you* like this weather। আমি বিনীত দুঃখিত কাতরভাবে নতশিরে সসঙ্কোচে অপরাধ স্বীকার করে নিচ্চি।

লোকেনকে চিঠি লেখা গেল— আজকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন খবর না থাকাতে উপরোক্ত প্যারেগ্রাফ্ লোকেনের চিঠি থেকে উদ্ধৃত করে রাখা গেল। কাল একটা কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করেছিলুম লিখ্‌তে লিখ্‌তে ডিনারের ঘণ্টা বেজে গেল আজ ক্যাবিনে পড়ে পড়ে সেটা শেষ করলুম। একটা সামান্য কবিতা লিখ্‌তে মনটাকে কি রকম করে নিংড়ে বের করতে হয়, যারা পড়ে তারা বোধ হয় তার কিছুই বুঝতে পারেনা, তারা কেবল ভালমন্দ সমালোচনা করে মাত্র। কাল সকালে এডেনে পৌঁছব— তার পরে বম্বে— তার পরে কলকাতা।

মঙ্গল [২৮ অক্‌টোবর]। আজ সকালে Turnbull আমার কাছে স্বজাতির উপরে খুব আক্রোশ প্রকাশ করছিল। বল্‌ছিল Selfish stuck up stiff, no manner in them. বল্‌ছিল জাহাজে একদিন বসেছিলুম একজন মেয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল আমি ভদ্রতা করে তাকে চৌকি ছেড়ে দিলুম, সে একটি ঘণ্টা ধরে আমার চৌকি জুড়ে বসে রইল, উঠে যাবার সময় একটি thank দিয়ে গেলনা। Gibb গল্প করছিল Crowded' Busএ আমি ভদ্রতা করে একজন মেয়েকে যেম্‌নি জায়গা ছেড়ে দিলুম অমনি অম্লানবদনে তিন চারজন মেয়ে এসে আমার সমস্ত জায়গা জুড়ে বস্‌ল। তারা মনে করে তাদের

এটা অধিকার— কিছুমাত্র ভদ্রতার সঙ্কোচ নেই। Turnbull বল্‌ছিল একদিন Picture Galleryতে Lady Friend নিয়ে গিয়েছিল— শ্রান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে ছিল— পাশে একজন মেয়েকে দাঁড়াতে দেখে তাকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিল, অমনি তার সহচরী কোর্ত্তা ধরে টেনে বসিয়ে দিলে বল্লে 'Don't be a fool, you are not on the Continent!' অর্থাৎ এখানকার লোকেরা ত ভদ্রতার মর্য্যাদা বোঝে না।

এডেনে পৌছন গেছে। একরাশ আরব এসে ভয়ানক গোল বাধিয়ে দিয়েচে। মনে মনে একটুখানি চিঠির আশা ছিল। Steward একটা চিঠি এনে দিলে জ্যোতিদাদার হাতের অক্ষরে "S. Tagore Esq. Passenger P & O Mail Steamer, Aden" তার থেকে বোঝা যাচ্ছে— যে চিঠিতে আমি এডেনে উত্তর লিখতে অনুরোধ করেছিলুম সেটা বাবিরা পেয়েচে। যাহোক্ আমার অদৃষ্টে কিছু নেই। শুনচি রবিবার রাত একটার সময় জাহাজ বম্বে বন্দরে পৌছবে তাহলে তার পরদিন সমস্ত দিন গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এমন বিশ্রী লাগ্‌চে! একটা Messagerie জাহাজ এডেনের কাছে জলে ডুবে রয়েচে দেখ্‌লুম— Messagerie লাইনের আর একটা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল।

বিকেলটা কাটাবার জন্যে বসে বসে একটা কবিতা লেখা গেল। এক এক সময়ে কবিতা লিখে মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে— এক এক সময়ে কবিতা রচনা মনের উপরে যেন একটা বেদনার রক্তরেখা রেখে দিয়ে যায়— এবং সেইখানটা বরাবর ব্যথা করতে থাকে।— সমস্ত দিন কোনক্রমে কেটে যায়—কিন্তু দীর্ঘ সন্ধেবেলা ভারি ছটফটানি ধরে। সাড়ে ছটার সময় ডিনার, তার পরে কতক্ষণ চুপচাপ করে বসে থাকি— Gibbs Hurricane deckএ বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করে, তখন ভারি বিরক্ত ধরে— এই সকল নানা কারণে আমার মত moody লোকের পক্ষে বন্ধুত্ব ভারি দুঃসাধ্য।

বুধবার [২৯ অক্‌টোবর]। দালাল বলে একজন পার্সি আমাদের জাহাজে আছে। তাকে প্রায় অবিকল যোগেশের মত দেখ্‌তে— সেইরকম মুখের বেড়, সেইরকম দাড়ির ছাঁট, সেইরকম ভ্রূ এবং কপাল— কেবল এর চোখ দুটো খুব বড়। অল্প বয়স। নমাস য়ুরোপে বেড়িয়ে বিলিতি পোষাক এবং চালচলন ধরেচে— বলে India like করেনা— বলে তার য়ুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশ মেয়ে) কাছ থেকে ইতিমধ্যে তিনশো চিঠি পেয়েছে— কিন্তু "আমি কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইনে, যখন আমার আলাপীরা মনে করে আমি তাদের বন্ধু— তখন সে ভুল ভাঙ্গিয়ে দিতে আমি বিলম্ব করিনে।— There's no fun keeping friends— only lot of troubles। তার পরে বল্লে I don't care for flirting. There's *no fun* in it. I have flirted with great Italian German French English girls—I am tired of it. You tell lot of lies to a girl, and she hits you with her fan—not much fun in it—I don't like the Englishmen who come from India.—Therefore I don't speak to the people in this boardship—ofcourse if they come to me and speak to me I speak to them. I speak to some twelve thirteen people in this steamer—I speak for about two hours to a gentleman every morning. (ভাল ইংরিজি বলেনা এবং ঈষৎ নতুন রকমের উচ্চারণ— speakকে spick বলে) বাঙ্গালীদের বাবু বলে— আমাকে বলে You speak very good English— where did

you learn it ? বলে With my European dress people take me for an Italian or a French. I am not dark enough for an Indian. (লোকটা আমারি মত dark) লোকটা খুব লম্বা লম্বা কথা বলে— ভারি অদ্ভুত, ভারি stupid। বলে আমি Scientific বই ভালবাসি— আমি বল্লুম আমাকে দুই একটা ধার দিতে পার— বল্লে তোরঙ্গের নীচে আছে, বের করা শক্ত।

বুধবার। একটা ইংরিজি কাগজ পড়ছিলুম তাতে আমাদের দিশি মেয়েদের দুরবস্থা সম্বন্ধে খুব কাতরভাবে লিখেছে। আমাদের দিশি মেয়েদের ঠিক অবস্থা ইংরেজদের পক্ষে বোঝা ভারি শক্ত। আমার ত মনে হয় আমাদের মেয়েরা ইংরেজ মেয়েদের চেয়ে ঢের বেশি সুখী। ভালবাসাতেই মেয়েদের জীবনের প্রকৃত সফলতা— তার থেকে আমাদের মেয়েরা বঞ্চিত নয়— নিজের ছেলেমেয়ে, নিজের স্বামী, এবং বৃহৎ পরিবারের মধ্যে তাদের হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করে— ভালবাসার সমস্ত শাখাপ্রশাখা চতুর্দ্দিকে আপনাকে প্রসারিত করবার স্থান পায়; আর যাই হোক্ কার্য্যাভাবে তাদের হৃদয় কঠিন ও শুষ্ক হবার অবসর পায় না। একজন ইংরেজ Old maidএর হৃদয় কি শূন্য কি সঙ্কীর্ণ এবং নীরস হয়ে আছে। আমাদের বালবিধবারা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ Old maidএর সমতুল্য— কিন্তু বৃহৎ পরিবারের মধ্যে শিশুস্নেহ গুরুভক্তি সখিত্ব বিচিত্র প্রবাহে তাদের নারীহৃদয়কে সর্ব্বদা কোমল ও সরস করে রাখে— সভা কিম্বা কুকুরশাবকের দ্বারা সমস্ত শূন্য জীবনকে ব্যাপৃত রাখ্‌বার আবশ্যক হয় না। আমার মনে হয় সভ্যতার আকর্ষণে ইয়ুরোপীয় মেয়েরা এতদূর বেরিয়ে এসেছে যে তাদের কেন্দ্র থেকে ছিন্ন হয়ে কক্ষের বাহির হয়ে পড়েচে। তারা প্রমোদের পাকেই ঘূর্ণ্যমান হোক্, কিম্বা কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হোক্, কিম্বা বিজনে কৌমার্য্য বা বৈধব্য যাপন করুক তাদের স্ত্রীপ্রকৃতির মধ্যে শান্তি নেই— হয় তারা প্রমোদে উন্মত্ত, নয় তারা আন্তরিক অসন্তোষে আক্রান্ত। আর যাই হোক্, আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে যতই ব্যাঘাতজনক হোক্, আমাদের বৃহৎ পরিবার মেয়েদের পক্ষে একান্ত উপযোগী। কারণ ভালবাসাহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক— মরুভূমির স্বাধীনতা গৃহপ্রিয় লোকের পক্ষে যেমন নিদারুণ শূন্য। আমরা যাকে বন্ধন মনে করি মেয়েদের পক্ষে তা বন্ধন নয়। অবিশ্যি সুখদুঃখ পুরুষদের মত মেয়েদের জীবনেও আছে— পুরুষদের অগত্যাকাজ যেমন কঠিন, ভালবাসার কর্ত্তব্যও তেমনি সকল সময়ে লঘু নয়— ভালবাসারও অনেক দায় অনেক বালাই আছে। কিন্তু ভালবাসার ত্যাগস্বীকার অনেক সহজ— আমার পক্ষে বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে চাপকান পরে আপিসে যাওয়া যত কঠিন, মায়ের পক্ষে সন্তানের অনুরোধে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা তত কঠিন নয়। এইজন্যে মেয়েদের জীবন পুরুষের চক্ষে যত কঠিন ঠেকে মেয়েদের পক্ষে ততটা নয়। তাদের নিভৃত সুখদুঃখের মধ্যে থেকে উৎপাটন করে তাদের বাইরে এনে দাও তারা কখনই সুখী হবে না। আমাদের মেয়েরা যে ইংরেজ মেয়েদের চেয়ে অসুখী বা নির্ব্বোধ বা অশিক্ষিত তা নয়— আপন সীমানার বাইরে তারা নির্ব্বোধ শঙ্কিত সঙ্কুচিত— বাইরে নিয়ে গেলে তারা জানেনা কি করতে হবে কোথায় যেতে হবে— কিন্তু আমাদের ঘরের মধ্যে তারা সহৃদয় প্রতিভাশালিনী। তারা আমাদের সেবা করে, আমাদের সকলের খাওয়া হয়ে গেলে তবে খায় তার থেকে যদি কেউ মনে করে আমাদের মেয়েদের আমরা অনাদর ও পীড়ন করি তবে সে মহা ভুল। অন্তঃপুরে তারা কর্ত্রী, আমরা তাদের অতিথি— তাই আমাদের এত আদর— আমরা কর্ত্তা বলে নয়। এমন কথা কে কবে বলেছে আমাদের

উপার্জ্জনকার্য্যে মেয়েরা সাহায্য করেনা অতএব তারা স্বার্থপর ও হৃদয়হীন— কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা কর্ত্তা— সেখানকার সমস্ত কষ্ট আমরা বহন করে মেয়েদের তার থেকে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। (উদর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের Fable)

আমাদের মেয়েরা খুব বেশি লেখাপড়া শেখেনি তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষার কি ফল কে জানে। না হয় ঘরের মধ্যে একটা দিশি শিক্ষার দুর্গ রইল তাতে ক্ষতি কি? বাল্যকাল থেকে বিদেশী ভাষা শিক্ষায় আমাদের মস্তিষ্ক অবসন্ন এবং চিন্তাশক্তি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আমরা পুরুষরা ত ইংরিজি শিক্ষার তা' লেগে লেগে অতি শীঘ্র অকালে পেকে যাচ্চি— আমাদের অন্তঃপুরে না হয় অন্তর থেকে বাঙ্গলা রসাকর্ষণ করে অল্পে অল্পে স্বাভাবিক পরিণতির একটা পরীক্ষাস্থল থাক্। ইংরিজি শিক্ষা বাঙ্গলার মধ্যে দিয়ে তাদের নাড়ির মধ্যে প্রবেশ করুক এবং বর্ত্তমান অবস্থাবিপর্য্যয়ের সঙ্গে অল্পে অল্পে তাদের সামঞ্জস্যসাধন হোক। এই যে বইগুলো লিখ্‌চি এবং ছাপাচ্চি এবং বঙ্গবাসীতে বিজ্ঞাপন দিচ্চি, নিদেন মেয়েরা পড়ুক, না পড়ে ত কিনুক্।

ইংরেজরা একটা বুঝ্‌তে পারেনা— যে, ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ এবং দিশি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বৈলক্ষণ্য প্রায় সমান। ইংরাজ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যদি শিক্ষা স্বাধীনতার সাম্য থাকৃত, তাহলে Millএর বই লেখবার এবং বর্ত্তমান বিদুষীমণ্ডলীর বিদ্রোহ করবার কোন কারণ থাকৃত না। আমরা মাটি কাম্‌ড়ে কোনমতে ঘরের প্রাঙ্গণটিতে পড়ে থাকি আমাদের মেয়েরা সেই ঘরের অন্তঃপুরে বিরাজ করে— তোমরা পুচ্ছ-আস্ফালনে সমস্ত সংসার ঘোলা করে বেড়াও, তোমাদের মেয়েরা তোমাদের অনুবর্ত্তী। কিন্তু এখনও তোমরা পুরুষরাই প্রধান, তোমরাই প্রভু— তোমাদের স্ত্রীরা অনুগত ছায়া। তোমাদের তুলনায় তোমাদের স্ত্রীরা অশিক্ষিত।

বিধবা বিবাহ না থাকাতে আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত কষ্ট? তোমাদের দেশে কুমারী বিবাহ বন্ধ হয়ে সমাজে যত অনাথা স্ত্রীলোকের আবির্ভাব হয়েছে আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ বন্ধ হয়ে তত হয়নি। সমাজের মঙ্গলের প্রতি যদি লক্ষ্য করা যায় তবে আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ অসম্ভব, তোমাদের দেশে অবস্থাবিশেষে বিধবা বিবাহ আবশ্যক। সকল সমাজনিয়মই আপেক্ষিক। আমাদের সমাজ তোমরা কিছুমাত্র জাননা— এইজন্য আমাদের সমাজ-সম্বন্ধে তোমরা কিছুই বুঝ্‌তে পারনা।

যেমন লোকভেদে তেমনি জাতিভেদে সুখদুঃখ বিভিন্ন। আমি যখন গাজিপুরে থাকতুম, তখন ইংরেজরা মনে করত, আমোদ প্রমোদ খেলা ও সঙ্গ অভাবে আমি বুঝি ভারি ম্রিয়মাণ হয়ে আছি— তাই আমাকে ক্রমাগত নিমন্ত্রণ করত এবং ক্লাবের মেম্বর হবার জন্যে অনুরোধ করত। আমি যে আমার ঘরের কোণে সন্ধেবেলা আলোটি জ্বেলে আমার আপনার লোক নিয়ে কত সুখে থাকৃতুম তা তারা বুঝ্‌তে পারত না। একজন Lady Dufferin-মেয়ে-ডাক্তার আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যখন দেখে অপরিষ্কার ছোট ঘর, ছোট জানলা, ময়লা বিছানা, মাটির প্রদীপ, দড়িবাঁধা মশারি, আর্ট্‌ষ্টুডিয়োর রং-লেপা ছবি— তখন সে মনে করে কি সর্ব্বনাশ— কি ভয়ানক কষ্টের জীবন— এদের পুরুষরা কি স্বার্থপর— স্ত্রীলোকদের জন্তুর মত করে রেখেচে। জানেনা আমাদের দশাই এই। আমরা মিল পড়ি, রস্কিন পড়ি, স্পেন্সর পড়ি, কেরাণীগিরি করি, খবরের কাগজে লিখি, বই ছাপাই, ওই মাটির প্রদীপ জ্বালি, ঐ মাদুরে বসি, অবস্থা স্বচ্ছল হলেই স্ত্রীর গয়না গড়িয়ে দিই, এবং ঐ দড়িবাঁধা মোটা মশারির

মধ্যে আমি, আমার স্ত্রী, এবং মাঝখানে একটি কচি খোকা নিয়ে তালপাতার হাতপাখা খেয়ে রাত্রিযাপন করি। ওগো, তবু আমরা জন্তু নই। আমাদের কৌচ কার্পেট কেদারা নেই কিন্তু তবুও আমাদের দয়ামায়া ভালবাসা আছে। তক্তপোষের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে তোমাদের সাহিত্য পড়ি, তবুও অনেকটা বুঝতে পারি এবং সুখ পাই, ভাঙ্গা প্রদীপে খোলা গায়ে তোমাদের ফিলজফি অধ্যয়ন করে তবুও আমাদের ছেলেরা তোমাদেরি মত agnostic হয়ে আস্‌চে।— আমরা আবার তোমাদের ভাব বুঝতে পারিনে। তোমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা আর এক রকমের। কৌচ কেদারা তোমরা এত ভালবাস যে স্ত্রীপুত্র না হলেও চলে। আরামটি তোমাদের আগে, তার পরে তোমাদের ভালবাসা— আমাদের ভালবাসা নিতান্তই আবশ্যক, তার পরে আরাম থাক্ বা না থাক্।

কিন্তু তোমরা খুব সভ্য জাতি, তোমরা অনেক মহৎ কার্য্য করেছ, অতএব তোমাদের সমস্ত প্রথাকেই মানবের উন্নতির অনুকূল বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমরাও এককালে উন্নত জাতি ছিলুম, এই বিপুল স্ত্রীপুত্র পরিবারের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আমাদের পতন হয়েছে— এবং কে বল্‌তে পারে ঐ উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল স্তূপাকৃত আরামের মধ্যেই তোমাদের সভ্যতার সমাধি হবেনা। ভারতবর্ষে পারিবারিক প্রথা ক্রমে এত বিপুল এবং জটিল হয়ে পড়েছিল যে সমাজের সমস্ত শক্তি পরিবার রক্ষার মধ্যেই পর্য্যবসিত হয়েছিল— সংহত পরিবারের চাপে ব্যক্তিগত মহত্ত্বের স্ফূর্ত্তি বন্ধ হয়ে সমস্ত একাকার হয়ে এসেছিল। তোমাদের আরাম ক্রমেই এত বেড়ে উঠ্‌চে, যে স্বাধীন গতিবিধির পথ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েচে। তোমাদের পরিবার প্রতিষ্ঠার শক্তি বন্ধ হয়ে আস্‌চে— পণ্ডিতগণ ভীত ভাবে মন্ত্রণা দিচ্চেন, এবং socialism মধ্যে মধ্যে নখদন্ত বিকাশের উপক্রম করচে।

মাঝের থেকে মেয়েদের আর মেয়ে থাক্‌বার যো নেই তাদের পুরুষ হওয়া বিশেষ আবশ্যক হয়েছে। য়ুরোপে ক্রমে গৃহ নষ্ট হয়ে হোটেল বৃদ্ধি হচ্চে— যে যার নিজে নিজে উপার্জ্জন করচে, এবং আপনার ঘরটি, Easychairটি, কুকুরটি, ঘোড়াটি, চুরটের পাইপ্‌টি এবং একটি ক্লাব নিয়ে নির্ব্বিঘ্ন আরামের চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে। সুতরাং মেয়েদের মৌচাক ভেঙ্গে যাচ্চে। পূর্ব্বে সেবকমক্ষিকারা মধু অন্বেষণ করে চাকে সঞ্চয় করত এবং রাজ্ঞীমক্ষিকারা কর্ত্তৃত্ব করত— এখন চাক বাঁধা বন্ধ করে যে যার আপনার একটি কক্ষ ভাড়া করে সকালে মধু উপার্জ্জন করে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একাকী নিঃশেষে উপভোগ করচে। সুতরাং রাণীমক্ষিকাদের এখন বেরোতে হচ্চে, কেবলমাত্র মধু দান এবং মধু পান করবার সময় আর নাই। স্ত্রীপুরুষের এই স্বাভাবিক অবস্থাবিপর্য্যয়ের জন্য য়ুরোপীয় সমাজের কি কোন ক্ষতি হবেনা? একবার ভাল করে ভেবে দেখ আমাদের স্ত্রীরা অসুখী, না তোমাদের স্ত্রীরা অসুখী। আমাদের স্ত্রীরা গাড়ি চড়ে হাওয়া খায়না, কিন্তু তাদের কোমল স্নেহশীল হৃদয় সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ— কোন অবস্থাতেই তারা গৃহহীন নয়।

কেউ যেন না মনে করে মেয়েদের গাড়ি চড়ে হাওয়া খাওয়াকে আমি দূষণীয় জ্ঞান করি। আমার বলবার অভিপ্রায় এই, গাড়ি চড়ে হাওয়া না খেয়েও তারা একরকম সুখে আছে, হাওয়া খেয়ে তারা আরো সুখী হয় আরো ভাল। অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে থেকেও তাদের হৃদয়ের অভাব নেই— জ্ঞান ও স্বাধীনতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের হৃদয়ের প্রসারতা আরো বাড়ে ত আরো ভাল। আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে আমাদের মধ্যে মন্দ যেমন আছে তেমনি ভালও আছে— তোমরা যতটা বিভীষিকা

দেখ ততটা কিছু নয়। আমার ধর্ম্ম যে মানে না সে চিরনরকে দগ্ধ হবে এ যেমন গোঁড়া খৃষ্টানী, আমাদের মত যাদের প্রথা নয় তারা অসুখী এও তেমনি গোঁড়া দ্বৈপায়নতা।

শুক্রবার [৩১ অক্‌টোবর]। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তন হয়ে আস্‌চে। এখন আমাদের বাইরে বিক্ষিপ্ত হবার সময়— কেবলমাত্র পরিবার-প্রতিপালন আমাদের একমাত্র কাজ বলে ধরে নিলে চল্‌বেনা। ইংরেজের সংঘর্ষে এসে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আমাদের একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েচে। চিরদিন অপমানিত এবং ধিক্কৃত হয়ে আর জীবনধারণ করা চলে না। শিক্ষা করতে এবং শিক্ষা দিতে হবে, আপনার শক্তি দেশে বিদেশে পরিচালিত করতে হবে— পৃথিবীতে আপনার উপযোগিতা প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং মেয়েদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এখন কেবল তাদের গৃহের সামগ্রী করলে চল্‌বেনা। তাদেরও জাগ্রত হয়ে আমাদের জাগ্রত করতে হবে। তাদের মধ্যেও এই নবজীবনের উন্মেষ আবশ্যক।

আজ সন্ধের সময় Hamiltonএর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। সে বল্‌ছিল— তোমরা আর যাই কর, য়ুরোপের নকল কোরোনা— Then you are nowhere, you are lost! তোমাদের ধর্ম্ম, তোমাদের সভ্যতা সহস্র সহস্র বৎসর টিঁকে আছে। কিন্তু চারশো বৎসর আগে আমরা কি ছিলুম? চারশো বৎসর পরে আমরা কি থাক্‌ব? আমাদের বড় বড় নগরের মধ্যে কি ভয়ানক পঙ্কিলতা প্রবেশ করেছে ভেবে দেখ্‌লে আশা থাকেনা।

শনিবার [১ নবেম্বর]। Dillon মৃত্যুশয্যায় শয়ান। বম্বে পর্য্যন্ত পৌঁছবে কিনা সন্দেহস্থল। বৃদ্ধ আমাদেরি সঙ্গে এক জাহাজে য়ুরোপে গিয়েছিল। কাল সন্ধেবেলায় যখন গানবাজনা নাচ হচ্ছিল, এবং আজ সকালে যখন খেলা চীৎকার হাসি চলছিল, তখন চতুর্দ্দিকের এই জীবনের কলরব তার কানে প্রবেশ করে কিরকম লাগ্‌ছিল। আজ সুন্দর সকালবেলা, ঠাণ্ডা বাতাস বচ্চে, সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করচে, উজ্জ্বল রোদ্দুর উঠেছে, কেউবা Quoit খেলচে, কেউবা নবেল পড়চে, কেউ গল্প করচে, Music Saloonএ গান চল্‌চে, Smoking Saloonএ তাস চল্‌চে, Dining Saloonএ lunch খাবার আয়োজন হচ্চে— আর Dillon মরচে।

আজ সন্ধে আটটার সময় Dillonএর মৃত্যু হল। আজ সন্ধের সময় একটা অভিনয় হবার কথা ছিল, হলনা।

Gibbs আজ আবার তাদের মেয়েদের কথা বল্‌ছিল। বল্‌ছিল মেয়েরা ক্রমে ভারি নির্লজ্জ হয়ে আস্‌চে— তারা অম্লানবদনে প্রকাশ্যে উলঙ্গপ্রায় পুরুষদের ব্যায়ামক্রীড়া ও Swimming match দেখ্‌তে যায়— এবং Picture Saloonএর কথা বল্লে। আমার কিন্তু এগুলো ততটা খারাপ লাগেনা— এই উলঙ্গ দৃশ্যের মধ্যে একটা বেশ অসঙ্কোচ Healthiness আছে— আর্দ্ধেক ঢাকাঢাকি এবং Suggestivenessই কুৎসিত— যেমন Ball-roomএ মেয়েদের বুকখোলা কাপড়, এবং নাচ। Waltz নাচ সম্বন্ধে Gibbs যেরকম করে বলছিল সে আমি লিখ্‌তে পারিনে— সে শুনে আমার ভারি লজ্জা এবং কষ্ট হচ্ছিল। Youngmanরা এ সম্বন্ধে যেরকমভাবে কথা কয় মেয়েদের শোনা উচিত— ইতিপূর্ব্বে একদিন আশু এবং লোকেনের কাছে এ বিষয়ে অনেক কথা শুনেছিলুম।

ডিনার টেবিলে Third Officer গল্প করছিল— Hurricane ডেকের উপর তাদের ঘরের পাশে,

আজকাল সন্ধেবেলায় অন্ধকারে অনেক চুম্বনের শব্দ শোনা যাচ্চে— জাহাজ গম্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হয়েচে, বিদায়ের সময় এসেচে, তারি আয়োজন। শুনে Miss Hedistedt লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল। 3^d Off. গল্প করলে— আর একবার সমুদ্রযাত্রায় সে চীনদেশ থেকে কাপড়ের পাড় কিনে নিয়ে যাচ্ছিল তাই দেখাবার জন্যে একজন মা এবং মেয়ে যাত্রীকে তার ক্যাবিনে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। পাড় দেখা হয়ে গেলে মা এগিয়ে গেল মেয়ে একটু পিছিয়ে রইল। Officer তার কারণ অনুসন্ধান করতে যাওয়াতে মেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে— 'Won't you kiss me ?'—Off. No. Why ? মেয়ে—But other officers always kiss me when they take me to their cabin। শুনে আমরা এবং মেয়েরা সবাই অপ্রস্তুত। লোকটার মুখে কিছুই বাধেনা।

রবি [২ নবেম্বর]। আজ সকাল আটটার সময় ডিলনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে গেল। আমি দেখ্‌তে গেলুম। একটা টেবিলের উপরে কফিন পড়ে আছে। Hamilton, Connolly, একদল পর্টুগীজ ভৃত্য, এবং দুতিনজন ক্যাথলিক মেয়ে হাঁটু গেড়ে কফিন্ ঘিরে রোমান ক্যাথলিক Burial Service পড়চে। আর সকলে কালো কাপড় পরে' টুপি খুলে' চারিদিকে নীরবে দাঁড়িয়ে। প্রার্থনা হয়ে গেলে পরে কফিন্ সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। তার পরে জাহাজ আবার চল্‌তে লাগ্‌ল। এই অন্ত্যেষ্টিসংকারের সঙ্গে আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন আগত হল।

আজ রাত্তিরে জাহাজ বম্বে পৌঁছবে। স্পেশল ট্রেনে আমাকে যেতে দেবে কিনা কে জানে— তা না হলে মেজদাদাদের চিঠি একদিন আগে গিয়ে পৌঁছবে— আমার হঠাৎ গিয়ে পড়বার কল্পনা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। কূলে এসে তরী ডোবা একেই বলে।

আর ডায়ারি বন্ধ করা যাক্।—

২ মাস এগারো দিন কেটে গেল। মনে হচ্চে কত যুগ। রাত দুপুরের সময় বম্বে পৌঁছন গেল। স্পেশল ট্রেন ধরতে পারলুম না— তাই ভারতবর্ষে পৌঁছেও মন ভারি বিগ্‌ড়ে আছে— হঠাৎ গিয়ে পড়ব বলে কত কি কল্পনা করেছিলুম একদিনের জন্যে সমস্ত ফস্কে গেল। বাড়ি যতই কাছে আস্‌চে মন ততই যেন অস্থির হয়ে উঠ্‌চে। Gravitationএর নিয়মানুসারে ভার পৃথিবীর যতই নিকটবর্ত্তী হয় তার বেগ ততই বাড়ে— মনেরও সেই নিয়ম দেখ্‌চি। কাল সমস্ত রাত এক মুহূর্ত্ত ঘুমইনি। আজ সকালে তাড়াতাড়ি Watson Hotelএ বেরিয়ে পড়লুম। এখেনে এসে দেখি আমার টাকার ব্যাগটি জাহাজে ফেলে এসেছি— মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল— তার মধ্যে আমার Return Ticket এবং টাকা— তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে আবার সেই জাহাজে চল্লুম— সেই পুরোণো ক্যাবিনের Pegএ ব্যাগ্‌টি ঝুলচে— ধড়ে প্রাণ এল— এরকম ফিরে পেলে হারিয়ে সুখ আছে— ব্যাগটি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে সমস্ত পৃথিবী আনন্দময় বোধ হল। আমার মত লোকের ঘর ছেড়ে এক পা বেরোনো উচিত নয়। যখন আমার Biography বেরোবে তখন এই সমস্ত অন্যমনস্কতার দৃষ্টান্তগুলো পাঠকদের কাছে ভারি আমোদজনক এবং কবির উপযুক্ত শোনাবে— কিন্তু আপাতত ভারি অসুবিধে। এই ব্যাগ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল সন্ধেবেলায় একবার মনে উদয় হয়েছিল— তার পরে মনকে বিশেষ করে সাবধান করে দিলুম ব্যাগটা যেন না ভোলা হয়— মন বল্লে, ক্ষেপেছ, টাকার ব্যাগ আমি ভুলি। আজ সকালে তাকে আচ্ছা একচোট গাল দিয়ে নিয়েছি— সে নিরুত্তর হয়ে রইল— তার পরে যখন ব্যাগ ফিরে পাওয়া গেল তখন

আবার তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে হোটেলে ফিরে এসে স্নান করে বড় আরাম বোধ হচ্চে। ভরসা করি আজ সন্ধেবেলায় আবার ভুলব না। আজ সন্ধেবেলায় সমস্ত গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে যখন গাড়িতে চড়ে বসব তখন মনটা একবার নৃত্য করে উঠবে— তার পরে হুগ্‌লির কাছাকাছি গিয়ে যখন সকাল হবে— তখন—। ঐ Breakfastএর ঘণ্টা বাজল— খেয়ে আসি, ক্ষিধে পেয়েছে।

গাড়ির জন্যে একটা বালিশ কিনেছিলুম— সেটা হোটেলে ফেলে এসেচি।

আমাদের Good morning প্রভৃতি কোনরকম greeting নেই বলে Gibbs আমাদের নেহাৎ অসভ্য মনে করেচে।

Truth কাগজ থেকে একটা জায়গা উদ্ধৃত করে রাখি।

The expression of a fashionably-dressed woman is now emphatically one of nakedness. Her sleeveless bodice, cut halfway to her waist, betrays much and suggests more. Her large white arms, her uncovered shoulders crossed with an airy line, her bust displayed to the last inch permitted by the law which protects morality and forbids obscenity, her back bared in a wedge-shaped track to her band, the colour of her gown scarce distinguishable from her skin, and the "fit" one which moulds the figure and makes no pretence at disguise— in this indecent nudity she offers herself to public admiration ; and the bold looks of the men are the caresses which make her purr with pride and pleasure. Her dress is her note of invitation ; and if but few honestly confess, no one is deceived.

Orientalদের dishonesty সম্বন্ধে ইংরেজরা প্রায় আলোচনা করে থাকে— তাই নিম্নের খবরটা টুকে রাখা গেল। Truth. Oct. 16, 1890.

The writer was yesterday in a city restaurant, when, in an adjoining box he overheard scraps of conversation which, at first, were meaningless to him ; but, in the light of something he had heard earlier in the day, he was able to piece out one of those stories of trickery and fraud in connection with the Stock-Exchange which, as a rule, the public only hear of after the victims are ruined. The party were very jubilant, and the copious champagne that they indulged in made them possibly more reckless than in their sober moments they would have been. Briefly, what was overheard made it clear that the party were members of a ring which had for its purpose the breaking down of the credit of some wellknown South African shares, and some important information was alluded to that was being kept in the background until the right moment— that is, when an immediate rise was to follow. . .

The writer encloses his private card, and, in confidence, would be happy to answer any inquiries.—

Editor remarks :— My correspondent, who is highly respectable, and is unconnected with financial jobbery etc.—

আসল কথা হচ্চে পরের জাত সম্বন্ধে আমরা যেটা দেখি এবং শুনি সেইটেই আমাদের কাছে মস্ত হয়ে ওঠে— তার সমস্তটা আমরা তদন্ত করতে পারিনে। এইজন্যে তাড়াতাড়ি generalize করে একটা মত খাড়া করি। [সমাপ্ত

রসের প্রেরণা

শ্রীনন্দলাল বসু

চিত্রশিল্প আমার বড় প্রিয় জিনিস ; সেইজন্য শিল্পী মাত্রকেই আমি ভালোবাসি, তাদের ছবি দেখতে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করি ও বড় আনন্দ পাই। আমি ছবির সমালোচক নই, আমিও তাঁদের মতো ছবি আঁকি মনের আনন্দ প্রকাশ করবার জন্য। সুখ ও দুঃখের সাগর মন্থন করে যে আনন্দরূপ অমৃত ওঠে তার অর্ঘ্য নিবেদন করাই শিল্পীদের কাজ।

নবীন শিল্পী-ভাইদের সাহায্য হবে বলে কয়েকটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণার কথা বলব।

সব শিল্প-সৃষ্টিই খেলার ছলে মনের খেয়াল খুসী থেকেই আরম্ভ। কিন্তু, অসংযত, অহংকারী, স্বার্থান্ধ ও সংকীর্ণ মনের আর সমদর্শী, সদানন্দ, রসে ও ছন্দে ভরপুর দরদী শিল্পীর সংযত ও উদার মনের তফাত লক্ষ্য করবার বিষয়। অর্বাচীন নবীন শিল্পী প্রকৃতি থেকে সহজ উত্তরাধিকার-সূত্রে যে নবীন অনুরাগের অধিকারী হন তা খুবই প্রাণবান ও প্রশংসনীয় ; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং পৃথিবীর দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতে ও দুনিয়ার দুনিয়াদারির সংস্রবে এসে, মনের জটিলতা কাঠিন্য ও সন্দিগ্ধতা বেড়েই চলে। সেই মনকে আবার সরল ও নবীন করে তুলতে হবে, সন্দিগ্ধ ও ভীত মনকে নির্ভীক করে তুলতে হবে, কঠিন মনকে সরস ও আনন্দের ছন্দে ছন্দোময় করে তুলতে হবে। এই হল আমাদের সাধনার পথ। দ্রষ্টা দরদী ও রসিক শিল্পীর প্রতি, তাঁদের সৃষ্টির প্রতি, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রাখতে হবে। গুণী ও নামজাদা শিল্পীদের সৃষ্ট শিল্পের সঙ্গে নিজের শিল্পসৃষ্টির তুলনা করে এগোতে হবে। কেবল তাঁদের বাহ্যিক অনুকরণ করা নয়। চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে তাঁদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রেখে, তাঁদের ভাবে ভাবুক, গুণে গুণী ও মহান্ হতে হবে।

শিল্প-সৃষ্টির মূলমন্ত্র ও টেক্‌নিক্-শিক্ষার গুহ্য কথা হল প্রকৃতির রূপ ও গুণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ও অহৈতুক আকর্ষণ ও তার সহিত একাত্মবোধ। এ হলে সৃষ্টি করা ও টেক্‌নিক্ শিক্ষার কাজ অতি সহজ হয়ে যায়। কখন ঠিক শিল্প-সৃষ্টি হয় জানতেও পারা যাবে না। পক্ষান্তরে, কেবল দম্ভ ক'রে, বড় শিল্পী হবার লোভ রেখে, প্রচুর পরিশ্রম করেও সব শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে। শেষে ভগ্নমনোরথ হতে হবে। শিল্পীসমাজে নামও হবে না ; উপরন্তু ঠিক রসের অনুভূতি না পেয়ে অন্তর কঠিন হয়ে যাবে ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। একূল ওকূল দু কূল যাবে। শুধু ফাঁকি দিয়ে, লোকের চোখে ধুলো দিয়ে, নাম কুড়োনোতে কী দীনতা— তা ভেবে দেখবার জিনিস।

স্বাধীনতা ও মৌলিকতা অর্জন করতে হলে অহংকেন্দ্রিক চঞ্চল মনের অনিচ্ছাকৃত দাসত্ব থেকে আমাদের ক্রমশ মুক্তি পেতে হবে। টেক্‌নিকের মাস্টার হতে হবে। তদুপরি আবেগ প্রীতি ও ভাবের দোলা চাই, সেই তো আমাদের সৃষ্টির মূল আধার। ভাবাবেগকে চালনা করার উপযোগী মমত্বশূন্য শক্তি ও টেকনিকের সাহায্যে সৃষ্টি করার নিরহংকার কৌশল, আয়ত্ত করে নিতে হবে। আবেগকে ও টেক্‌নিক্‌কে চালনা করবার কর্তা শিল্পী ; আবেগ বা টেক্‌নিক্ শিল্পীকে চালনা করলে কাজ পণ্ড হবে।

আর একটা কথা। এ যুগে, কেবল টেক্‌নিক্ ও নানারূপ কৌশলের পরীক্ষণে ও প্রদর্শনে শিল্পের সার্থকতা এই মত কোথাও কোথাও প্রচারিত হচ্ছে— শিল্পী রসের প্রেরণায়, আবেগে যখন মনের কথা প্রকাশ করবার জন্য হাঁকুপাঁকু করে, অন্ধের মতো পথ হাৎড়ায়, তখনই ওইরকম পরীক্ষার সার্থকতা। কিছু বলবার নেই, প্রেরণা নেই, শুধু পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা করুণ ও কষ্টদায়ক। টেক্‌নিক্ তো চাই-ই। দেহ ও প্রাণের যে সম্বন্ধ টেক্‌নিক্ ও রসের প্রেরণাতেও সেই সম্বন্ধ। প্রাণ ছাড়া দেহ কিছু না ; দেহ বিনা প্রাণের প্রকাশ অসম্ভব। (প্রেরণা বলতে— কোনো বস্তু ও গুণের প্রতি অহৈতুক আকর্ষণ। সেই আকর্ষণ থেকে যখন শিল্পীর মনে একটা অভূতপূর্ব বেদনার আবির্ভাব হয় ও সেই বেদনা কোনো-একটা রূপ-অবলম্বনে, কোনো একটা রসের ভিতর দিয়ে আনন্দে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে শিল্প-সৃষ্টি বলব।) সাবধান ! শুধু আঙ্গিকের দম্ভ ও হাতের কৌশলের ভোজবাজি ও ভাবের ঘরে চুরি করে নিছক হেঁয়ালি সৃষ্টি— এ সব থেকে শিল্প বহু দূরে। এ সবে সাধারণের মনে কৌতূহল জাগায় এবং চমক লাগায় মাত্র— কিন্তু রসিকের কাছে তা আদরের হয় না।

চীনদেশীয়রা বলেছেন টেক্‌নিক্-ই সব, আবার প্রেরণাই সব। কেউ যদি বলে টেক্‌নিকের আদৌ দরকার নেই, ও কিছু না ; আবার কেউ যদি বলে রসের ইনস্‌পিরেশনের দরকার নেই, ও কিছু না —দু দিকেই ভুল হবে। সার্থক সৃষ্টিতে আঙ্গিক ও প্রেরণা অবিচ্ছিন্ন এক হয়ে উঠেছে। আঙ্গিক থেকেও নেই।

আশিসপ্রার্থী শিল্পশিক্ষার্থীদের উদ্দেশে লিখিত

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯২৭ সালে অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এই কয়মাস ধ'রে মালয়দেশ, দ্বীপময় ভারত (সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ) আর তার পরে শ্যামদেশ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখে আসবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। এই ভ্রমণ আমার নিজের জীবনের পক্ষে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, আর যে কবি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার পক্ষে এটী একটী চরম আত্মপ্রসাদের কথা যে, কবির সঙ্গে আমাদের এই যে ভ্রমণের একটা দৈনন্দিন বর্ণনা আমি লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলুম, এবং পরে সেটী 'দ্বীপময় ভারত' নাম দিয়ে প্রথম ধারাবাহিক ভাবে 'প্রবাসী' পত্রিকায়, আর পরে স্বতন্ত্র বইয়ের আকারে প্রকাশ করি, সেটী কবির কাছে প্রশংসা পেয়েছিল। কলকাতা ত্যাগ করার দিন থেকে যবদ্বীপ ত্যাগ করার দিন পর্য্যন্ত তারিখ ধ'রে-ধ'রে যথাসম্ভব খুঁটিয়ে' আমাদের ভ্রমণের কথা প্রকাশিত হ'য়েছে।— পুস্তক-আকারে বেরিয়ে যাবার পরে কবি আমার বই প'ড়েছিলেন, এবং তার পূর্বেই তিনি আমায় চিঠি লিখে শ্যামভ্রমণের কাহিনীও পূরো ক'রে প্রকাশ ক'রতে বলেন। আমার খাতায় প্রত্যেক দিনের ঘটনা দিনাঙ্ক ধ'রে লেখা আছে; আর তা ছাড়া এই ২৩ বছর কেটে গেলেও প্রত্যেক ব্যাপারটী এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে। শ্যামদেশ থেকে ফিরে এসে, ওদেশের যাঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল, তাঁদের কারো-কারো সঙ্গে যোগসূত্র ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে দেখা-সাক্ষাতের দ্বারা আর চিঠিপত্র যোগে রক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন শ্যামী, ভারতীয় ও ফরাসী, আর এই জন্য শ্যামদেশের সঙ্গে আমার যোগ একেবারে বিনষ্ট হয় নি। এখন না জানি আমাদের পরিচিত ব্যাঙ্কক নগরে আর অন্যত্র কত না পরিবর্তন এসে গিয়েছে! রবীন্দ্রনাথের আদেশ শিরোধার্য ক'রে এতদিন পরে দ্বীপময়-ভারত-ভ্রমণের খিল বা পরিশিষ্টরূপে আমাদের শ্যাম-যাত্রার কথা দিনলিপি আর স্মৃতিকে অবলম্বন ক'রে লিখতে বসছি।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭। Mijer 'মাইয়র' জাহাজে ক'রে বাতাবিয়ার বন্দর থেকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করকে সঙ্গে নিয়ে শ্যামদেশের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। আমাকে আর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মাকে একদিনের জন্য রয়ে যেতে হ'ল। আমরা তার পরের দিন, ১লা অক্টোবর শনিবার দিন, Melchior Treub মেল্‌খিওর্ ত্রয়্‌ব্ জাহাজে যাত্রা করলুম, বিকাল পৌনে তিনটায়। কথা ছিল যে আমরা সিঙ্গাপুরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হবো, আর সেখান থেকেই আমরা একত্র শ্যামদেশে যাত্রা ক'রবো।

আমাদের দলের শ্রীযুক্ত A. A. Bake বাকে আর তাঁর স্ত্রী যবদ্বীপেই রয়ে গেলেন। ধীরেনবাবু আমাদের সঙ্গে আর শ্যামে যাবেন না, তিনি পিনাং থেকেই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরবেন। শ্রীযুক্ত Ariam Williams আরিয়ম্ (এখন ইনি আর্য্যনায়কম্ নামে পরিচিত) আমাদের সঙ্গে যবদ্বীপে আর বলিদ্বীপে যান নি, আমরা মালয়দেশ ত্যাগ করার পরে উনি কিছুদিন ওখানেই কাটান, পরে উনি শ্যামে চ'লে যান, সেখানে আমাদের পৌছাবার আগেই যাতে কবির কোন অসুবিধা না হয়, সেই-মত সব ব্যবস্থা ক'রে রাখবেন।— শ্যামে আরিয়ামের মত লঙ্কাদ্বীপ থেকে আগত অনেক তমিল ভদ্রলোক উঁচুপদ অধিকার ক'রে আছেন, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আরিয়মের আত্মীয়, আরিয়ম্ উপস্থিত থাকলে এঁদের দিয়ে বিশ্বভারতীর পক্ষে কিছু প্রচারের সুবিধা হতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ যে জাহাজে ৩০শে সেপ্টেম্বর যবদ্বীপ ত্যাগ করেন, সেখানি ছিল আকারে ছোট, আর

আমাদের জাহাজ ছিল তার চেয়ে ঢের বড়। একদিন পরে বেরিয়েও আমাদের জাহাজ যেদিন আর যে সময়ে সিঙ্গাপুরে পৌছাবার কথা, সেইদিন প্রায় ঠিক সেই সময়েই অর্থাৎ ৩রা অক্টোবর সকাল ৭॥ টার দিকে 'মাইয়র' জাহাজও সিঙ্গাপুরে পৌছবে। সুতরাং সিঙ্গাপুরে ওঁদের ধরতে আমাদের কষ্ট হবে না।

শনিবার, ১লা অক্টোবর ১৯২৭। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা তো যাত্রা ক'রলুম। অভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে যবদ্বীপীয় অধ্যাপক ডাক্তার হুসেন জয়দিনিঙ্‌রাৎ আর আমাদের প্রিয় Koper-berg বা তাম্রচূড়,ছিলেন। আমরা কদিন ধ'রে একটু ধকলের মধ্যে ছিলুম ব'লে, জাহাজে ক্যাবিনে বিছানায় শুয়ে' বড় শ্রান্ত বোধ করতে লাগলুম— সায়মাশ সেরে নিয়ে সকাল সকাল শুতে গেলুম।

রবিবার, ২রা অক্টোবর ১৯২৭। আজ সকালে বেলা ১২টায় আমাদের জাহাজ Banka বাঙ্কাদ্বীপের Muntok মুন্তোক বন্দরে ভিড়্‌ল। ডেক-যাত্রীদের কেউ কেউ নাম্‌ল। একটী জাপানী মেয়েকে দেখলুম মালাই পোষাকে, তার যবদ্বীপীয় স্বামীর সঙ্গে নাম্‌ল। ওদের চেনে এমন একজন সিন্ধী সহযাত্রীর কাছে খবর পেলুম যে মেয়েটি জাপানী। তাহ'লে মুসলমান যবদ্বীপীয়ের সঙ্গে বৌদ্ধ বা শিন্তো জাপানীদের বিয়ে-থা হয়। মেয়েটিকে মালাই পোষাকে দেখাচ্ছিল চমৎকার।

জাহাজে সহযাত্রীদের সঙ্গে যথারীতি ভাব জমালুম। শ্রীযুক্ত Overbeck ওফরবেক নামে একটী জার্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, ইনি সিঙ্গাপুরে আর অন্যত্র জার্মান কন্সালরূপে ২৩ বছর এ অঞ্চলে কাটিয়েছেন; মালাই সাহিত্যের উপর বই লিখেছেন। বলিদ্বীপের সম্বন্ধে এঁর সঙ্গে কথা হ'ল— ইনি তো মানতেই চান না যে বলিদ্বীপের হিন্দুরা কোন গভীর দার্শনিক বিষয়ে আলাপ করতে পারে— তাদের সে শক্তিও নেই, প্রবৃত্তিও নেই। এঁর মতে, মালাই জাতের লোকেরা বোঝে কেবল magic অর্থাৎ যাদু আর ভোজবিদ্যা। ভদ্রলোকের কথার ধরণে এদের প্রতি একটু অবজ্ঞার ভাব দেখলুম— বললুম, ম্যাজিকের কথা ব'লছেন? তা আপনাদের ইউরোপের লোকেরাও কম যায় না। এই ব'লে, ইটালিতে আর ইউরোপের অন্যত্র লোকের অন্ধবিশ্বাসের কতকগুলি কথা যা আমার অভিজ্ঞতাজাত তা শুনিয়ে দিলুম— ইটালির রোমান ক্যাথলিক চাষা বিশ্বাস করে (আর তার পাদরিরা এই বিশ্বাসের সমর্থনও করে) যে গির্জাবিশেষে মা-মেরীর মূর্তির চোখ থেকে জল পড়ে, বুক থেকে রক্ত বেরোয়। আর এ ছাড়া সাধারণ ইউরোপীয় শিক্ষিত লোকের charm আর mascot-এ বিশ্বাস সর্বত্র বিদ্যমান। ভদ্রলোক তখন স্বীকার করলেন যে magic-এ বিশ্বাস খালি এশিয়ার মানুষেরই একচেটে নয়। সেকেণ্ডক্লাসের যাত্রীদের সঙ্গে আর আলাপ করবার প্রবৃত্তি হ'ল না। মোটা মোটা সব মেয়ে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের ফ্রক পরা, গুর্খাদের মতন পেশীবহুল খালি পা, পুরুষালি চলন, মাথার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা, মুখে সিগারেট— দূর থেকে দেখেই, স'রে পড়তে ইচ্ছা করে। একটি ডাচ সরকারী চাকুরে যাচ্ছে— তার যবদ্বীপীয় স্ত্রী, দেশী পোষাকে, আর এদের একটী ছোট মেয়ে, এদের বেশ লাগ্‌ল। ডাচেদের মধ্যে এখনও ফিরিঙ্গি বা সঙ্কর জাতির প্রতি সেভাবের ঘৃণা নেই, যেমনটা ইংরেজ সমাজে আছে; তাই দেখতুম, এই যবদ্বীপীয় মহিলাটীকে অন্য ডাচ যাত্রীরা একঘরে' বা কোণঠাসা করে নি।

ডেক-যাত্রীদের মধ্যে দুটি সিন্ধীকে দেখলুম সুরাবায়া থেকে ক'লকাতায় যাচ্ছে; একটী বুড়ো আরব, এক কোণে তার একখানা কোরাণ নিয়ে বসে আছে। ডেকে একদল হজযাত্রী যবদ্বীপীয় মেয়ে; এই আরবটী এদেরই দলের 'মুআল্লিম্‌' বা পাণ্ডা হবে। একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, নাম বললেন

Mr Alsagoff আলসাগফ, বাড়ী মক্কার বন্দর জেদ্দায়, সিঙ্গাপুর থেকে কাঠ রপ্তানী করেন আরবদেশে হেজাজে— ধর্ম বা অন্য কিছু পরিচয় দিলেন না। তবে মনে হ'ল ইহুদী আর সম্ভবতঃ জার্মান ইহুদী। চীনা ডেক-যাত্রী অনেক ছিল, তবে তারা উপরের খোলা ডেকে বেশী থাকে না— তারা নীচের বন্ধ ডেকেই ডেকচেয়ারে ব'সে আর মেজেয় শুয়ে সময় কাটায়।

আজ সন্ধ্যাটা ডেকচেয়ারের উপরে শুয়ে আকাশে ষষ্ঠীর চাঁদ দেখে খানিকটা সময় কাটানো গেল— সঙ্গের পাঁজি থেকে আগেই জানতুম যে আজ শারদীয়া ষষ্ঠী।

সোমবার, ৩রা অক্টোবর ১৯২৭। সকাল সাড়ে-সাতটায় আমাদের জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছল। কবিকে নিয়ে 'মাইয়র' জাহাজ একটু আগেই সিঙ্গাপুরে এসে গিয়েছে, কিন্তু ছোট জাহাজ বলে তার মর্য্যাদা কম, তাকে মাঝ-দরিয়ায় লঙ্গর ক'রতে হ'য়েছে। লঞ্চে ক'রে যাত্রীদের জাহাজ-ঘাটায় আনা হ'চ্ছে।' কবি একদিন বেশী সমুদ্রের মধ্যে একটু নিরিবিলিতে কাটাতে পারবেন ব'লে ছোট জাহাজের কষ্ট স্বীকার ক'রেও আমাদের একদিন আগে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সাহিত্যের দিক থেকে এর একটী চিরস্থায়ী সুফল হয়েছিল— সেটী হচ্ছে ১লা অক্টোবর তারিখে মাইয়র জাহাজে ব'সে ব'সে লেখা বলিদ্বীপ সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব সুন্দর কবিতাটি, যার আরম্ভ এই—

সাগরজলে সিনান করি' সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।

কবিতাটী প্রবাসী পত্রিকায় প্রথম 'সাগরিকা'-শীর্ষকে প্রকাশিত হয় সম্পূর্ণ আকারে; পরে একটী অংশ বাদ দিয়ে এটিকে 'পূরবী'-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (এই পরিত্যক্ত অংশ সম্বন্ধে আমি একাধিক স্থানে আলোচনা করেছি[১]।) কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের এদিককার রচনার মধ্যে তাঁর যৌবনকালের রচনার হাওয়া যেন ফিরিয়ে এনেছে। এর ছন্দ 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পরে' কবিতা-দুটির ছন্দঝঙ্কার স্মরণ করিয়ে দেয়, যে ঝঙ্কারের রেশ গিয়ে পৌঁছয় জয়দেবের গীতগোবিন্দের

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

গানটীতে। বিষয়বস্তু বিচার ক'রলে এই কবিতাটীকে যে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ রোম্যান্তিক কবিতার সমপর্য্যায়ের ব'লতে কারো দ্বিধা হবেনা। বলিদ্বীপ আর দ্বীপময় ভারতের অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রাজকুমারীর মত গৌরবশালিনী তন্বী বলিদ্বীপকুমারী আর ভারত থেকে আগত রাজকুমারকে লক্ষ্য ক'রে কবি যেন আবার তাঁর যৌবনকালে আবাহন করা জীবনদেবতার স্পর্শ আর একবার নোতুন ক'রে পেয়েছিলেন— যে জীবনদেবতা সিন্ধুপারে গুহামন্দিরের মধ্যে কবিকে বরণ করেছিলেন, আর যিনি কবিকে নিয়ে নীল সাগরের উপর দিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলেন, তিনিই যেন দ্বীপান্তরের দেশে সাগরবেষ্টিত দ্বীপের মধ্যে কবির মুখ চেয়ে আর একবার তাঁর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছিলেন। — চকিতনেত্রে সেই মুখে দৃষ্টিপাত ক'রেই কবি যেন তাঁর নিজের যৌবনের দৃষ্টিভঙ্গী আবার ফিরে পান। আর তার ফলে হয় বলিদ্বীপের সৌন্দর্যের এই অভিনব প্রকাশ তাঁর 'সাগরিকা' কবিতাটীতে।

---

১ দ্র° দ্বীপময় ভারত, পৃ. ২২৪; 'সঞ্চয়িতা, গ্রন্থপরিচয়

জাহাজ থেকে আমরা ডাঙ্গায় নামলুম, কবি আর সুরেনবাবুও এসে গেলেন। সিঙ্গাপুরের বন্ধুরা আমাদের নিতে এসেছিলেন— নামাজী সাহেব এবারও আমাদের তাঁর Siglap সিগলাপ-এর বাড়ীতে অতিথি করবেন। আমরা মালপত্রের ব্যবস্থা ক'রে ঠিক করলুম, জাহাজ পাওয়া গেলে সিঙ্গাপুরে আর অপেক্ষা না ক'রে ঐ দিনই পিনাং যাত্রা ক'রব। আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানির শ্রীযুক্ত পিল্লৈ সব বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন, বিকালে ৩-৩০ মিনিটে Straits Steam Navigation Company-র ১২০০ টনের এক ক্ষুদে জাহাজ Kinta 'কিন্তা'-য় ক'রে আমরা যাত্রা করলুম। প্রথম শ্রেণীতে কবি একা ছিলেন, আর যাত্রীর আসার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু ইংরেজ জাহাজ কোম্পানির লোকেরা দুটো টিকিটের ভাড়া কবির জন্য আদায় ক'রলে এই ব'লে হুমকি দেখিয়ে যে তাদের ইচ্ছামতো তারা অন্য প্রথম শ্রেণীর যাত্রীকে দুই বার্থওয়ালা কবির কামরাতে ঢুকিয়ে দিতে পারে। এই ব্যবহারে মনটা গোড়াতেই খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু গরজ বড় বালাই। ডাচ, ফরাসী, জাপানী প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানির জাহাজওয়ালাদের সৌজন্য, কবিকে নিয়ে যেতে পারলে তাদের যেন কৃতার্থ হয়ে যাবার ভাব, তার সঙ্গে এই ছোট ইংরেজ কোম্পানির কবির সম্বন্ধে অজ্ঞতা আর অসৌজন্য বিশেষ পীড়া দিয়েছিল। শ্রীযুক্ত নামাজী সপরিবারে স্টীমার পর্যন্ত কবির প্রত্যুদ্গমন করলেন, শ্রীযুক্ত জুম্মাভাইও এসেছিলেন।

সুরেনবাবু, ধীরেনবাবু আর আমি সেকেণ্ড ক্লাসেই চড়লুম। এই স্টীমারের সেকেণ্ড ক্লাসের অবস্থা অতি খারাপ, তবে এতে রাগ করবার কিছু নেই, এগুলি Coastal Steamer অর্থাৎ একই দেশের সাগরপারের কাছাকাছি বন্দরে পাড়ি দেয়। পল্লীগ্রামের কেরাঞ্চি ঘোড়ার মতন— মহাসাগরগামী বিরাট লাইনারের আরাম এখানে কোথায়।

কদিন পরে উপরের খোলা ডেকে বসে কবির সঙ্গে আমরা অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলুম। প্রাকৃতিক দৃশ্য শান্তিপূর্ণ মনোরম, আমরা উত্তরমুখো মালক্কা প্রণালী দিয়ে যাচ্ছি, বাঁয়ে দুএকটা দ্বীপে অন্ধকারে কালো পাহাড়ের স্তূপ, তার মাথায় বাতিঘরের আলো ঘুরে ঘুরে জ্বলছে, আকাশ আর সাগরকে যেন এক রূপালি ধূসর রঙের পোঁছ দিয়ে মিলিয়ে কেউ একাকার ক'রে দিয়েছে।

কিন্তু এই শান্তিময় আবহাওয়াতেও দেশের তুচ্ছ সাহিত্যিক গেঁয়ো ঘোঁটের বদ্ধবায়ু যেন আমাদের উপরে চাপ দিচ্ছিল। কবির কোন্ লেখার উপর স্থূল হস্তাবলেপন করেছেন এক সাহিত্যদিগ্‌গজ, কবির অনুগত এক লেখক তার জবাবও দিয়েছেন— বাঙলা পত্রিকার গোছা পেয়ে কবি একটু বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির এই সান্ধ্যকালীন কোমল স্পর্শে তাঁর মনের উদ্বেগ দূর হতে দেরী হ'ল না।

আজ শারদীয়া সপ্তমী— কবি আর আমরা তিনজন বাঙালী বলে আমাদের মনে বার বার এ কথাটা উঠছিল।

মঙ্গলবার, ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৭। আজ মহাষ্টমী— আমাদের মনে এই কথা বার বার উদিত হচ্ছিল— তাছাড়া সাগরের মধ্যে এই দিনের কোন লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য চোখে লাগছিল না। সকালটা আমার পক্ষে কাটল চমৎকারভাবে। উপরের ডেকে জাহাজের মুখের দিকে একেবারে যেন জাহাজের নাকের উপর শরতের মিষ্টি রোদ্দুরের মধ্যে চমৎকার হাওয়ায় বসে কবির সঙ্গে ঘণ্টা-দুই ধরে সাহিত্য আর idealism বা আদর্শবাদ নিয়ে আলাপ হ'ল। কবি idealism কথার বাংলা প্রস্তাব করলেন 'ভাবনিষ্ঠতা'। কবি তাঁর প্রকাশ্যমান উপন্যাস 'তিন পুরুষ'-এর নূতন নামকরণ করবেন ঠিক করলেন— এই নোতুন

নাম ঠিক হ'ল 'যোগাযোগ'। আজ কবিকে বেশ প্রফুল্ল বলে বোধ হ'ল। দ্বীপময় ভারত ঘুরে তিনি খুব খুশী।

১২॥ টায় জাহাজ Port Swettenham-এ এসে পৌছল। কিছু মাল জাহাজ থেকে নামলে, কিছু নোতুন যাত্রীও এল। একটা জিনিস বড় দৃষ্টিকটু লাগল। একদল চীনে ডেকযাত্রী ভুল ক'রে উপরের প্রথম শ্রেণীর ডেকে এসে পড়েছিল। জাহাজের চীনা স্টুয়ার্ড বা প্রধান খানসামা এদের একজনকে ধ'রে লাথি মারতে লাগল, তখন সব ভয়ে দুড়দাড় ক'রে নীচে পালিয়ে গেল। চীনেরা স্বাধীন জাতি— আমরা তখনও স্বাধীন হই নি, তাই বিদেশীর চাকরের হাতে স্বদেশীয়ের এভাবে অপমান আমাদের চোখে আশ্চর্য লাগল। Port Swettenham থেকে আমরা বিকাল ৫॥ টায় যাত্রা করলুম।

বলিদ্বীপের উপর লেখা তাঁর কবিতাটী কবি আমায় পড়তে দিলেন। বলিদ্বীপের সৌন্দর্যময় বাতাবরণের মধ্যে স্বপ্নের মত কটা দিন কাটিয়ে, যবদ্বীপের ভ্রমণও যখন আমরা প্রায় শেষ করেছি, তখন আমার মনে হ'ল, কবি তো যবদ্বীপের উপরে আর বরবুদুরের উপরে এমন দুটী সুন্দর কবিতা লিখলেন, কিন্তু আমি জানি বলিদ্বীপ তাঁর মনে কতটা গভীর রেখাপাত করেছে, সেই বলিদ্বীপ সম্বন্ধে তিনি নীরব থাকবেন? আমি রোজ তাঁকে নির্বন্ধ ক'রে বলা আরম্ভ করলুম— বলিদ্বীপ সম্বন্ধে কিছু আপনাকে লিখতেই হবে। উত্তরে তিনি হাসতে হাসতে বলতেন— বলিদ্বীপ, সে অন্য ব্যাপার হে। ঠিকমত ভাব না এলে কি অমন সুন্দর একটা জিনিসের সম্বন্ধে কিছু লেখা যায়? রোজকার এই হট্টগোলে একটু বসে ভেবে লিখবার সময় কোথায়? আমি তাঁকে রোজ তাগাদা দিতুম, তিনি উত্তরে ব'লতেন, হবে হে হবে, বলিদ্বীপের উপরে লিখ্‌বো, তোমায় কথা দিচ্ছি, এমন কবিতা লিখ্‌বো যে তুমি খুশী হয়ে যাবে।

কবি তাঁর কথা রেখেছিলেন, আর এই কবিতাটীতে কেবল আমাকে নয় সমগ্র বাঙালী পাঠকসমাজকে এখনকার আর অনাগতকালের সকলকেই তিনি খুশী ক'রে দিয়েছেন আর খুশী করবেন। আমি তাঁকে খালি বললুম যে আপনি বলিদ্বীপের রোম্যান্টিক দিকটা সৌন্দর্যের দিকটা বেশী করেই ফুটিয়েছেন, কিন্তু আপনি তো নিজের চোখে দেখেছেন, নিজের কানে শুনেছেন যে বলিদ্বীপের জীবনে একটা গভীরতা, একটা অন্তর্মুখিতা আছে; তার একটু ঝলক আপনার এই কবিতাতে দেখাবেন না? কবি উত্তরে বললেন যে কবিতাটী তিনি আবার ভাল ক'রে সংশোধন করবেন আর তখন তাতে আমার প্রস্তাবমত নোতুন সংযোজনও করবেন।

কবি 'নামান্তর'[২] ব'লে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নোতুন নামকরণ সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র মন্তব্য লিখে শেষ করলেন। আজ সন্ধ্যায় বলিদ্বীপে সংস্কৃত প্রচার আর ভারতবর্ষের সঙ্গে নোতুন ক'রে যোগ সংস্থাপনের কাজ কিভাবে হতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল। কবির বিশ্বাস, বিশ্বভারতীর কর্তব্য হবে নোতুন ক'রে বৃহত্তর ভারতের নানা দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে নাড়ীর যোগ আছে তাকে আবার পুনঃস্থাপিত করা। আমরা মন্থর গতিতে স্টীমারে ক'রে যাচ্ছি। কবির মনে খেয়াল হ'ল শ্যামযাত্রা শেষ ক'রে আমরা রেঙ্গুন অবধি স্টীমারে না গিয়ে যদি মৌলমেনে নামি আর সেইখান থেকে রেলে যদি রেঙ্গুন যাই, কিংবা উত্তর শ্যাম থেকে যদি মোটরের পথ থাকে তাহ'লে সেই পথে যদি মৌলমেন হয়ে ফিরি, তাহলে কেমন হয়? কিন্তু আমাদের সঙ্গে মাল আছে অনেক, সেগুলো নিয়েই হল চিন্তা।

২ দ্র°. রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়

কবি যবদ্বীপে বরবুদুর দেখেছেন, প্রাম্বানান্ দেখেছেন। শ্যামে গেলে ভারতীয় স্থাপত্যের আর ভাস্কর্য্যের অবিনশ্বর কীর্তি আঙ্করও তাঁকে দেখতেই হবে। আমার এ নির্বন্ধ কবি উৎসাহের সঙ্গে স্বীকার করলেন।

বুধবার, ৫ই অক্টোবর ১৯২৭। আজ মহানবমীর দিন। আমরা পরশু দিন সিঙ্গাপুর ছাড়বার সময়ে পিনাং-এর বন্ধুদের তার ক'রে দিই— তাই আজ সকালে আটটায় জাহাজ বন্দরে পৌঁছুতেই দেখি, নাম্বিয়ার-রা দুই ভাই আর কতকগুলি তমিল আর পঞ্জাবী ভদ্রলোক এসেছেন কবিকে নিয়ে যেতে। শহরের বাইরে Tanjong Bungah তাঞ্জং-বুঙাঃ-র বাংলাটাতে, যেখানে আমরা গতবার এসেছিলুম, সেখানে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে আমাদের এবারও যেতে হ'ল। আমরা বাসায় গুছিয়ে নিয়ে অবশ্যকর্তব্য কাজ কতকগুলো ছিল তা করবার জন্য শহরে এলুম— শ্যামের কন্‌সালের সঙ্গে দেখা, B.I S.N. জাহাজ কোম্পানির আপিসে, জাপানী ফোটোর দোকানে। নাম্বিয়ারদের গাড়ী সারাক্ষণ আমাদের জন্য ছিল। আমাদের পুরাতন চীনা বন্ধু পিনাং-এর হাক্ লিম, আর তমিল বন্ধু কৃষ্ণস্বামী দুপুরে আমাদের বাসায় এলেন। আমাদের সঙ্গে তাঞ্জং-বুঙাঃ-তেই মধ্যাহ্নাহার সারলেন। বিকাল আর সন্ধ্যা পিনাং-এর এই কেরল, তমিল আর চীনা বন্ধুদের সাহচর্য্যে কাট্‌ল। বাঙালী ডাক্তার মিত্র-ও জমা হ'লেন। আজ ছিল প্রায় সারা দিন মুষলধারে বৃষ্টি। রাত্রে সুরেনবাবু আব আমি শ্যামের জন্য আমাদের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলুম।

বৃহস্পতিবার, ৬ই অক্টোবর ১৯২৭। আজ বিজয়া দশমী। সারা দিন ধ'রে আজও খুব বৃষ্টি চ'লল— একেবারে Tropical rains, মুষলধারে। সঙ্গে জোর হাওয়াও আছে, ঝড় ব'ললেই হয়। বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে শহরে গিয়ে নানা কাজ ছিল চুকাতে হ'ল— টাকা ভাঙানো, তার করা নানা জায়গায়, চিঠি পাঠানো। দুপুরে হঠাৎ আমাদের চীনা বন্ধু আর দোভাষী শ্রীযুক্ত ফ্যঙ চিঃ-চেঙ্, বৃষ্টির মধ্যে এসে হাজির— তিনি এখানে এক চীনা কাগজের সম্পাদক হ'য়ে আছেন। তাঁর কাগজের জন্য কবির ছবি তুল্‌লে।

বিকালে স্থানীয় ভারতীয়দের ক্লাবে এক চা পান সভায় কবিকে যেতে হ'ল, স্বদেশীয়দের উৎসাহে তাঁর দেখা দিতে হ'ল, সংক্ষেপে তাঁর শ্যামভ্রমণ সম্বন্ধে দু কথা তাঁকে ব'লতেও হ'ল।

রাত্রে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে Ellis ব'লে এক আমেরিকান সাংবাদিক এসে হাজির— ভদ্রলোক ব্যাঙ্ককে প্রকাশিত আমেরিকানদের এক ইংরেজী কাগজের সম্পাদক। তিনি কাল আমাদের সঙ্গে ব্যাঙ্ককে ফিরবেন। ছোকরা বয়সের, খুব সপ্রতিভ, আর মিশুক দিলখোলা মানুষ। আমরা এর সঙ্গে কথা ক'য়ে খুশীই হ'লুম। কবির কাছে তার কাগজের জন্য এক 'বাণী' চাইলে। বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে কবি সংক্ষেপে ব'ললেন, লিখে নিলে।

আমরা কাল শ্যাম যাত্রা ক'রবো, এই দুইদিনে সব ব্যবস্থা ঠিক হ'য়েছে।

শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর ১৯২৭। সকালে মালপত্র পাঠিয়ে দিলুম। কৃষ্ণস্বামী আর নাম্বিয়ারদের যত্নে আমরা সকাল আটটায় যাত্রা করলুম, মুষলধারে বৃষ্টি প'ড়ছে তখন। পিনাং হ'চ্ছে একটী ছোট দ্বীপ, ওপাশে মালয়দেশের ভূভাগের অংশে Wellesley ওয়েলেস্‌লি শহরে স্টীমারে ক'রে পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেনে উঠতে হবে— সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাঙ্কক পর্য্যন্ত এই লাইন চ'লেছে। আমরা পিনাং-এর স্টীমার-ঘাট Victoria Pier-এ এলুম— সেখানে ভারতীয় বন্ধুরা বৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে বিদায়ের জন্য ফুলমালা-

টালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কবির প্রতি শ্রদ্ধা অসীম এঁদের। নাম্বিয়ার আর অন্য ভারতীয়দের চেষ্টায় Harbour Master-এর খাস লঞ্চ্ আমাদের ওপারে নিয়ে যাবার জন্য ঠিক হ'য়েছিল। তাতে ক'রে আমরা ওপারে Prai প্রাই স্টেশনে ন-টায় গিয়ে পৌছুলুম।

রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছেন শ্যামের ভারতীয় অধিবাসী আর শ্যামসরকারের আমন্ত্রণে। তাঁর জন্য সেলুন গাড়ীর ব্যবস্থা হ'য়েছে। সুরেনবাবু আর আমি তাঁর সেলুনের লাগোয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে আছি।

ট্রেন তৈরী ছিল— সপ্তাহে দু'দিন ক'রে যায়, International Mail 'আন্তর্জাতিক ডাকগাড়ী' এর নাম, সোজা ব্যাঙ্কক অবধি যায়। প্রাইতে আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন কৃষ্ণস্বামী আর নাম্বিয়াররা, আর ধীরেনবাবু। ধীরেনবাবু আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন— তিনি কৃষ্ণস্বামীদের কাছে দু দিন থাকবেন, তাঁর জাহাজ মিললেই তিনি ক'লকাতা যাত্রা করবেন।

ট্রেনের সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকান সাংবাদিক এলিস, আর সিঙ্গাপুরের শ্যামী কনসাল-জেনেরাল ফ্রা প্রবন্ধ ভূবাল (ভূপাল), তাঁর স্ত্রী, শিশুপুত্র।

বন্ধুদের বিদায় গ্রহণ হ'যে গিয়েছে। যাত্রাকালে বৃষ্টি থেমেছে। আমাদের শ্যামযাত্রা শুরু হ'ল।

মালয়দেশ আর শ্যামের সংযোগসূত্র এই রেল লাইনটা আমাদের দেশের আসামের বা তিরহুট-আওধ লাইনের মত সরু লাইন। ভারতবর্ষ থেকে ইঞ্জিনিয়ার ঠিকাদার কুলী দিয়ে এই লাইন তৈরী ক'রেছে। রেল বিভাগের কর্মচারী কি মালয়দেশে কি শ্যামে বেশীর ভাগই ভারতীয়। গাড়ীগুলি ছোট হ'লেও ব্যবস্থা ভাল।

আমরা যাত্রা করলুম— পথে মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি। Alor Star আলোর স্তার বলে একটা বড় স্টেশনে, রবীন্দ্র-দর্শনেচ্ছু বিস্তর ভারতীয়ের সমাগম। সংখ্যায় ৫০।৬০ জন হবে— মালয়দেশের একটা ছোট শহরের পক্ষে এটা বেশ বড় সংখ্যা বলতে হবে। বেশীর ভাগ হচ্ছে তমিল, দু-চার জন শিখ আর পাঠান; প্রায় সকলেই রেলে কাজ করে। রেলই উপজীব্য— কর্মচারী, মিস্ত্রী, কেরানী, কুলি, ঠিকেদার। তমিলদের তরফ থেকে স্থানীয় ভারতীয়দের হয়ে কবিকে মালাচন্দন (সাদা ফুলের গ'ড়ে মালা, বাটীতে গোলা চন্দন) নারকল কলা রাম্বতান প্রভৃতি ফল দেওয়া হ'ল। এই সব ভারতবাসী ধনী লোক নন— কিন্তু ভারতীয় আদর্শের প্রচারের জন্য ভারতীয় বিদ্যা বিদেশাগত শিক্ষিতকামদের দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর জন্য টাকা চাই, তাই এঁরা যথাশক্তি চাঁদা দিয়ে কিছু টাকা তুলেছেন। Kedah কেডা:, প্রাচীন কটাহ-দেশ, এই অঞ্চলটার নাম। Kedah Indian Association থেকে তার প্রতিনিধিরূপে গাড়ীতে উঠে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ক'রলেন শ্রীযুক্ত Muthukarppan Chettiyar মুত্তুকর্প্পণ চেট্টিয়ার, স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী, আর শ্রীযুক্ত এস্. নাগলিঙ্গম্, P.W.D-র কেরানী, সিংহলের জাফনা-বাসী তমিল ইনি।

ট্রেন চলেছে সবুজের বানের মধ্য দিয়ে। ঝুপঝাপ বৃষ্টি আছে। খানিকটা পথ জুড়ে ট্রেনের লাইনের ধারে কেবল অতি ছোট আকারের বাঁশের ঝাড়— দেখতে ভারী চমৎকার। তার পরে আমরা Padang Besar পাড়াং বেসার স্টেশনে এসে পৌছুলুম, বিকালের দিকে।

এটা ব্রিটিশ মালায়া আর শ্যামদেশের সীমা। আমাদের শ্যামরাষ্ট্রে প্রবেশ হ'ল। গাড়ী এখানে দাঁড়াল' অনেক ক্ষণ ধ'রে। ইংরেজ এলাকা ছেড়ে রেললাইন আর গাড়ী এল শ্যামী এলাকায়। ইংরেজের,

চাকর রেলের তাবৎ কর্মচারী নেমে গেল— চালক, ফায়ারমান, গার্ড, সকলেই। তাদের স্থান নিলে শ্যামের কর্মচারী— এরাও কিন্তু ভারতীয়। শ্যামের পুলিশ এল, পাসপোর্ট দেখে গেল আমাদের, শ্যামে প্রবেশের অনুমতির ছাপ ঠিক আছে কি না। পাড়াং বেসারে কবির সেলুনের সামনে বেশ বড় গোছের ভীড়। এখানেও কবিকে মালা আর চন্দন দিলে।

পাড়াং বেসার থেকে গাড়ী যাত্রা ক'রল। আমরা গাড়ীর রেস্তোরাঁ-কারে গিয়ে খেয়ে নিয়েছি। ব্যবস্থা ভারতের রেলেরই মত। বাবুর্চী খানসামা ভারতীয় মুসলমান। শ্যামদেশে প্রবেশ করলেও, শ্যামীলোকের দেখা প্রথমটায় পেলুম না। আমরা Kra ক্রা-যোজক ধরে চলেছি। তার শ্যামের অধীন অংশের বেশীর ভাগে মালাই জাতির লোকে বাস করে। পরে বেশ খানিকটা উত্তরে গিয়ে শ্যামীলোকেদের গ্রাম নজরে প'ড়ল। শ্যামী মেয়েরা গৃহকার্য্যে রত ট্রেন থেকে দেখা যাচ্ছে— কাছা দেওয়া ফানুম বা লুঙ্গী পুরুষদেরই মত পোষাক, বুকে একটা কাপড় জড়ানো, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলি কালো। চেহারাকে কুশ্রী আর আকর্ষণবিহীন করবার জন্য শ্যামী মেয়েরা যেন কোমর বেঁধে তৈরী।

আমরা শুয়ে-বসে জানলা দিয়ে দেশ দেখতে দেখতে যাচ্ছি। আর পালা করে কবির খোঁজ নিচ্ছি, তাঁর কোনও কষ্ট না হয়। কবিডর গাড়ী, আর তাঁর সেলুন আমাদের গাড়ীর পাশেই। পাড়াং বেসার ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে যাবার পরে, আমাদের গাড়ীতে একটী শ্যামী ভদ্রলোক এসে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন। বেঁটেখাটো মানুষটী, সাধারণ বাঙালীর মত চেহারার, তবে মুখখানি মোঙ্গোলীয় ধাঁজের। পোষাকটী অদ্ভুত লাগল— পরণে নীল রঙের ফানুম অর্থাৎ মালকোঁচা মেরে পরা লুঙ্গী, হাঁটু পর্য্যন্ত সেই ফানুম নেমেছে; গায়ে সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট, মাথায় এক সোলা-টুপী, পায়ে সাদা সুতির মোজা হাঁটু পর্য্যন্ত, আর তার নীচে ইংরিজি ফিতা-বাঁধা জুতা। পরে দেখলুম, এইটীই শ্যামদেশের offical dress বা সরকারী চাকুরেদের পোষাক বা উর্দী। ভদ্রলোক চোস্ত ইংরিজিতে আমাদের বললেন— মাফ করবেন, আমি শ্যামদেশের রেলের লোক, এই ট্রেনের সঙ্গে যাচ্ছি, আমায় বিশেষ করে সরকারের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে কবির যাতে কোনও কষ্ট বা অসুবিধা না হয় তা দেখতে। আমার পক্ষ থেকে কোনও সেবার দরকার আছে কি ?— আমরা তাঁকে বসতে বললুম, তাঁর সঙ্গে আলাপ জমালুম। তিনি তাঁর পরিচয়পত্র দিলেন। একদিকে শ্যামী অক্ষরে লেখা, অন্য দিকে রোমান অক্ষরে, ইংরিজিতে। শ্যামী বর্ণমালা ভারতবর্ষীয় (দক্ষিণভারতের) লিপি থেকে হয়েছে— আসলে এই বর্ণমালা হচ্ছে কম্বোজের, কম্বুজদেশীয় লোকেদের কাছ থেকে শ্যামীরা শিখে একটু বদলে নিয়েছে। অ আ, ক খ— এইভাবে আমাদের নাগরী আর বাঙলার পর্য্যায়ের লিপি। ইংরিজি ভাগে লেখা— Phra Rathacharn-prachaks Mr. K L. Indaransi, District Traffic Superintendent, R. S. Ry. কার্ডের ওদিকের শ্যামী অক্ষরগুলি এই ইংরিজি লেখার সাহায্যে কিছুটা পড়তে পারলুম। বুঝলুম—"বরঃরথচারণপ্রত্যক্ষ", যার শ্যামী উচ্চারণ হচ্ছে "ফ্রা-রথচারন্ প্রচকস্" সেটী হচ্ছে ভদ্রলোকের পদাধিকার, ইংরিজি Traffic Superintendent-এর শ্যামী অনুবাদ এইভাবে করা হয়েছে। তাহ'লে শ্যামদেশে এখন এইভাবে সংস্কৃতের মর্য্যাদা দেওয়া হয়। সরকারী পদ বা পদবীর অনুবাদে শ্যামী ভাষায় সংস্কৃতেরই ব্যবহার হয়। শ্রীযুক্ত Indaransi ইন্দ্রাংশী(?)-কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি

বললেন, "হাঁ, ও তো আপনাদের সংস্কৃতেরই কথা— আমরা যে আমাদের ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে থাকি।" মনে মনে একটা আনন্দ হল, আবার এ প্রশ্নও হল— সংস্কৃতের এই মর্য্যাদা তো প্রাচীন ধারা অনুসারে; শ্যামী জাতীয়তাবোধ স্বদেশীয়ানা আর স্বভাষাপ্রীতির দিকে বেশী ঝোঁক দিলে সংস্কৃতের এ স্থান বেশী দিন থাকা আর সম্ভবপর হবে না। পরে শ্যামদেশে সংস্কৃতের উপস্থিত অবস্থা যা দেখেছি তা বলবো। R. S. Ry. অর্থাৎ Royal Siamese Railway।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রাংশী অতি সজ্জন— কবির সঙ্গে আমরা এঁর পরিচয় করিয়ে দিলুম। সন্ধ্যের পরে আমাদের কামরায় এসে আলাপ ক'রলেন। সমস্ত এশিয়া মহাদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে, ভারতের সম্বন্ধে, ইন্দোচীনে ভারতের প্রভাব সম্বন্ধে বেশ আলাপ ক'রলেন। খবরাখবর রাখেন, ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, তাঁর সরকারী পোষাকে আমাদের ধুতির বদলে কাছা দেওয়া যে লুঙ্গী (যাকে 'ফানুম' বলে) তিনি প'রে ছিলেন তার নীল রঙটী সরকারী কর্মচারীদের কাপড়ের সম্বন্ধে যে বিধি প্রচলিত আছে তার অনুসারে নির্ধারিত হ'য়েছে। কথাটী হ'চ্ছে এই— এখন যিনি শ্যামের রাজা, তাঁর আগে ছিলেন তাঁর এক বড় (বৈমাত্রেয়) ভাই 'বজিরাবুধ' (সংস্কৃত বজ্রায়ুধের পালি রূপ) রাজা, বজিরাবুধ বা বজ্রায়ুধের মৃত্যুর পরদিন রাজা হন। বজ্রায়ুধের জন্মদিন ছিল শনিবার— শনি তার অধিষ্ঠাতা গ্রহ, শনির প্রিয় রঙ হ'চ্ছে নীল, সেইজন্য রাজা বজ্রায়ুধ স্থির ক'রে দেন, সরকারী কর্মচারীদের 'ফানুম'-এর রঙ হবে নীল।

সন্ধ্যের দিকে একটা ছোট স্টেশনে গাড়ী থামতে প্লাটফর্মে কতকগুলি পাঠানকে দেখলুম। তাদের ডেকে হিন্দিতে আলাপ ক'রতে তারা বড় খুশী হ'ল। তাদের বাড়ী হাজরা জেলায়— সীমান্ত প্রদেশে। শ্যামের ঐ অঞ্চলে তারা রঙীন ছিটের কাপড় বিক্রী করে বেড়ায় যেমন কাবলীওয়ালারা বাঙলাদেশের গাঁয়ে গরম কাপড় বিক্রী ক'রে থাকে।

রাত্রে রেস্তোরাঁ-কারে ডিনার চুকিয়ে, সঙ্গের আমেরিকান সহযাত্রী শ্রীযুক্ত এলিসের সঙ্গে আমাদের যবদ্বীপ আর বলিদ্বীপ ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল।

শ্রীযুক্ত Woodall বলে এক জাফনার তমিল খ্রীষ্টান ভদ্রলোক আর তাঁর শ্যামী স্ত্রী, এঁরা ব্যাঙ্ককের বিশিষ্ট ব্যক্তি, মাঝে কি-একটা জংসন স্টেশনে নিজেদের গাড়ী করে এসে কবির সঙ্গে দেখা করে আলাপ ক'রে গেলেন।

রাত্রে আমরা ঘুমোবার জন্য ব্যবস্থা করে শুয়েছি, বেশ ঘুমিয়েও পড়েছি। মাঝে কি একটা স্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় রাত তখন দুটো আড়াইটে হবে। গাড়ী দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি না আমার ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানালার ধারে আমার নীচেকার বার্থ, পাশের কামরা থেকে কবির গলার আওয়াজ পেলুম। ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে দেখি কবি তাঁর সেলুনের বিছানায় জেগে ব'সে আছেন, খোলা জানালা দিয়ে তিনি কথা কইছেন হিন্দীতে কতকগুলি পুলিসের চৌকিদার শ্রেণীর লোকের সঙ্গে, এরা প্রায় ৮।১০ জন তাঁর সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এদের কথায় বুঝলুম, এরা শ্যাম সরকারের বেতনভোগী রেলওয়ে পুলিসের বা অনুরূপ কাজের লোক, সব কয়টাই ভোজপুরী হিন্দু, রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছেন শুনে তাঁর দর্শনের আশায় এরা দাঁড়িয়ে আছে। কবি তখন জেগে ছিলেন, খোলা জানালা দিয়ে কবিকে দেখে এঁরা তাকে বিনীতভাবে প্রণাম করে। তাতে কবি

এদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেন। এরা কি কাজ করে, বেশ মনের সুখে আছে কি না, তা জিজ্ঞাসা করেন। এরা পঞ্চমুখে শ্যামদেশের রাজা আর প্রজা দুইয়েরই প্রশংসা ক'রলে। আমিও শুনতে লাগলুম, কবিকে আর বিরক্ত ক'রলুম না— এরা ব'লছে, "জী হাঁ মহারাজ, হমলোগ ইস মুলুকমেঁ বড়া সুখ চৈন মেঁ হৈঁ, দেশ ভলা হৈ, রাজা ভী ভলা হৈ, দেশকে লোগ ভী আচ্ছা হৈ— রাজা হিন্দু হৈঁ, বোধ গর্গ হৈঁ, আদত নেক হৈঁ, হিন্দুস্থানকে লোগকো য়ে লোগ পসন্দ করতে হৈঁ। রেলকে স্বামী অফসর লোগ হমকো বোলা কি তুমহারে মুলুক কা এক বড়া ভারী বিদবান আদমী জা রহে হৈঁ।" এইভাবে এরা অনেকক্ষণ ধ'রে কবির সঙ্গে কথা ক'য়ে খুব খুশী হ'ল। এরা ট্রেন ছাড়বার সময়ে 'বন্দেমাতরম্' আর 'জয় রামজী' ক'রে জয়ধ্বনি ক'রলে।

সারা বিকাল আর সন্ধ্যেবেলা গাড়ীর বাইরে দেশ দেখতে দেখতে মনে হ'চ্ছিল, দেশে যেন মানুষ নেই— মাইলের পর মাইল ধ'রে কত শত মাইল পরিষ্কার চাষের উপযুক্ত সমতল জমি যেন খালি প'ড়ে র'য়েছে।

শনিবার, ৮ই অক্টোবর ১৯২৭। সকালে Hua Hin হুআ-হিন স্টেশনে গাড়ী পৌঁছুল। এটী সমুদ্রের ধারের একটী জনপ্রিয় স্থান, শ্যামদেশের বিশেষতঃ ধনীলোকেদের বিনোদস্থান। সিঙ্গাপুরের কন্সাল জেনেরাল এখানেই নেমে গেলেন— ভদ্রলোকটী বিনয়ী, তবে বেশী কথা বলেন না, হুআ-হিনেই তাঁর বাড়ী। বন্ধুবর অরিয়ম আমাদের আগবাড়া হ'যে নিয়ে যাবার জন্য ব্যাঙ্কক থেকে এখানে এসেছিলেন, তিনি আমাদের সঙ্গে এসে মিললেন। ব্যাঙ্ককে আমরা প্রায় ন' দিন থাকবো, তার প্রত্যেক দিনের কার্য্যক্রমের একটা খসড়া তিনি ক'রে এনেছেন। আমাদের অনেক কিছু দেখতে হবে, অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। ব্যাঙ্ককে একটী রাজপ্রাসাদকে প্রথম শ্রেণীর একটী হোটেলে রূপান্তরিত করা হ'য়েছে, হোটেলের স্বত্বাধিকারী হ'চ্ছে শ্যামের সরকার— এটীর নাম Phya Thai Palace Hotel ফ্যা থাই প্যালেস হোটেল। এখানেই আমাদের অধিষ্ঠান হবে— ব্যাঙ্ককে ভারতীয়েরা আর শ্যাম গভর্ণমেণ্ট দুইয়ে মিলে এই ব্যবস্থা করেছেন।

বিকালে সন্ধ্যার দিকে আমরা ব্যাঙ্ককের Central Station প্রধান স্টেশনে পৌঁছুলুম। কবি-সন্দর্শনার্থী ভারতবাসীদের ভীষণ ভীড়। বেশীর ভাগ বিহারী আর সংযুক্তপ্রদেশের লোক, ভোজপুরী, আর কিছু গুজরাটী আর পঞ্জাবী। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধুক্কি খুব— নিয়মানুবর্তিতার অভাব। শ্যামী দর্শনার্থীও কিছু ছিল। ভারতবাসীদের ভীড় ঠেলে কোনও রকমে কবিকে স্টেশন থেকে উদ্ধার ক'রে এনে মোটরে চড়িয়ে বাসস্থানে আনা গেল। সেখানে অনেকগুলি ভারতীয় নিজ নিজ কারে আমাদের সঙ্গেই এলেন, অনেকে আগে থাকতেই অপেক্ষা ক'রছিলেন।

ফ্যা-থাই-প্রাসাদটী একটী রাজোচিত প্রাসাদ বটে। বিরাট এক বাগানের মধ্যে। ইউরোপীয় কায়দায় বাড়ীটী, কিন্তু মাঝে মাঝে শ্যামী ভাবও আছে। বাগানের মধ্যে একটী বাঁধা পুকুরের মতন, তার পাশে শ্যামী শিল্পরীতি অনুসারে তৈরী অতি সুন্দর ব্রঞ্জের মূর্তি, দণ্ডায়মান বরুণদেব শাঁখ বাজাচ্ছেন। প্রশস্ত হাতা, ঘরগুলি বড় বড়, ইউরোপীয় প্রাসাদের চালে আসবাব দিয়ে সাজানো।

ব্যাঙ্ককের ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ওয়াহেদ আলী সাহেব (এখন ইনি পরলোকগত) পুত্র আর ভ্রাতুষ্পুত্র সঙ্গে এসেছেন। অন্য বাঙালী ভদ্রলোক কতকগুলি অপেক্ষা ক'রছেন— ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বড় কেরাণী— ইংরেজ কোম্পানির আপিসে।

একটা দিকে আমাদের হোটেলের জন্য কতকগুলি ঘর ঠিক করা ছিল, কবিকে তাঁর ঘরে বিশ্রামের জন্য তাঁকে ঠিক করে বসিয়ে দিয়ে আরিয়ম্‌, সুরেনবাবু আর আমি আমাদের ঘর ঠিক করে নিলুম। এখানকার রাজবংশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত আর বিদ্যোৎসাহী Prince Damrong Rajanubhab রাজকুমার দামরঙ্গ রাজানুভাব তাঁর এক সেক্রেটারিকে রবীন্দ্রনাথের শ্যামী সেক্রেটারির কাজের জন্য, সব সময়ে হামেহাল থেকে আমাদের সাহায্য করবার জন্য স্থির ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এঁর নাম ফ্রা রাজধর্মনিদেশ (বেয়াচথর্মনিথেৎ)। এর হাতেই আমাদের যেন সঁপে দেওয়া হ'ল। উপস্থিত ভারতীয় সজ্জনেরা বিদায় নিলেন। সন্ধ্যে হল, আমাদের মহলে আমরা ডিনার খেলুম। কবি তাঁর বরবুদুর সম্বন্ধে কবিতাটির অনুবাদ শোনালেন। শ্যামী ভাষায় সেটী অনুবাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন শ্রীরাজধর্মনিদেশ। এইভাবে আমরা কিঞ্চিৎ আলাপ আলোচনা করে, পথশ্রান্ত ছিলুম বলে গুছিয়ে নিয়ে সকাল সকাল বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রলুম। [ক্রমশঃ

বাংলার বাউল

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

২

সংহিতার পরে নানা ক্ষেত্রে বাউলিয়া-তত্ত্ব

বৈদিক সংহিতার পর আসিল কর্মকাণ্ড লইয়া বিচার ও আচারের যুগ। এই যুগের শাস্ত্রকে 'ব্রাহ্মণ' বলে। এই 'ব্রাহ্মণের' মধ্যে তো বাউলিয়া মতের কোনো প্রভাবই থাকিবার কথা নয়। ইহাতে শুধু প্রাচীনপন্থী কর্মকাণ্ডই থাকার কথা।

তবু যজ্ঞগুলির মধ্যে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অধ্যাত্মবাদ আসিয়া যে প্রবেশ করিতেছিল তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেসব যাগযজ্ঞ পূর্বে জীবহিংসায় ভরা ছিল তাহা ক্রমে অহিংস হইতে লাগিল। যাগযজ্ঞের মধ্যেও আচারে বিচারে ক্রমে গভীর অধ্যাত্ম সত্যের ইঙ্গিত (symbolism) দেখা দিতে লাগিল। ক্রমে সম্পূর্ণ যাগযজ্ঞটা একটা আত্মসমর্পণের প্রতীক হইয়া উঠিল।

এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় পরলোকগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে কাজ করিয়াছেন তাহার মহত্ত্বের তুলনা হয় না। যাগযজ্ঞের ক্রমবিকাশ বিষয়ে কিছু বুঝিতে হইলে তাঁহার 'যজ্ঞকথা' পুস্তকখানি ভালো করিয়া পড়িয়া দেখা দরকার। যাগযজ্ঞঘটিত অতি বিপুল সাহিত্য মন্থন করিয়া তিনি তাঁহার অমৃতময় নির্যাস জিজ্ঞাসুদের দিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, যাগযজ্ঞের মধ্যেও মরমীদের মর্মকথা বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যেও নানাভাবে আপনাদের প্রকাশ করিতেছে। ক্রমে যজ্ঞও একটা মরমী (mystic) ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। বাহ্যতর কর্মকাণ্ড হইলেও ইহা ক্রমে অন্তর্নিহিত ভাবেরই বিগ্রহ (symbol) হইয়া দাঁড়াইল। যজ্ঞকথার আলোচনা আর এখানে করিতে চাহি না। যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা যজ্ঞকথা গ্রন্থখানি যেন পড়িয়া দেখেন।

ব্রাহ্মণযুগেও এক-একবার এক-একটি স্থান আমাদের বিস্মিত করিয়া দেয়।

জৈনদের উপহাস করা হইত যে নিয়ত ঊর্ধ্বগমনই নাকি তাহাদের স্বর্গ। এখনকার Sublimation ও Evolutionএর যুগে, অর্থাৎ নিয়ত উন্নতির দ্বারা আত্মসার্থকতার যুগে, এই কথা লইয়া উপহাস কিছুতেই খাটে না। বরং নিরন্তর ঊর্ধ্বগমনটা যে ভারতে কোনো সম্প্রদায় স্বর্গ বলিয়া মানিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে নিজেদের ধন্য মনে করি।

জৈনদের কথা এখানে আলোচ্য নহে। এখন কর্মকাণ্ডীদের ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির কথা বলিবার অবসর।

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণটি এক অপূর্ব গ্রন্থ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণকে অনেকে উপহাস করেন এই বলিয়া যে ইহারাও নিয়ত অগ্রসর হইয়া চলাকেই পরমপুরুষার্থ মনে করেন। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' এই কথাটা আসিল কেমন করিয়া তাহা বলা যাউক।

তখন যজ্ঞস্থল ছিল শিক্ষার ক্ষেত্র। এক ব্রহ্মর্ষি আপন ব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে যজ্ঞস্থলে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু আপন শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে উপেক্ষা করিলেন। প্রত্যাখ্যাত শূদ্রার পুত্র আপন

মাতাকে এই দুঃখ জানাইলে মাতা বলিলেন, "বাছা, আমি শূদ্রকন্যা। কাজেই মাতা-পৃথিবীর আমি সন্তান (children of the soil)। আমি আপন মাতাকে স্মরণ করি।" পৃথিবী আসিয়া ঐ পুত্রকে দ্বাদশবৎসর রসাতলে বসিয়া শিক্ষা দিলেন। তিনি শিক্ষা পাইয়া শূদ্রার পুত্র বলিয়া ঐতরেয় নামে এবং মহীর শিষ্য বলিয়া মহীদাস আত্মপরিচয় দিয়া ঋগ্‌বেদের অপূর্ব ঐতরেয় ব্রাহ্মণ লিখিলেন। তাহাতে পর পর পাঁচটি মন্ত্র (৭.১৫.১-৫)—

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
চরৈবেতি চরৈবেতি।

'শ্রেষ্ঠ হইলেও যে জন বসিয়া থাকে সে পাপী হইয়া যায়। যে চলিতে চলিতে অগ্রসর হইতে হইতে শ্রান্ত, তাহার নানা শ্রী। দেবতাও অগ্রগামী চলন্তদের সখা অর্থাৎ সহচর। অতএব আগে চল আগে চল।'

পুষ্পিণ্যো চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্‌মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ॥
চরৈবেতি চরৈবেতি।

'নিয়ত চলাতেই দেহের ও আত্মার মহত্ত্বের ক্রমবিকাশ। চলন্ত লোকের সব পাপ ও হীনতা মুক্তপথে (open road) আপনিই পড়ে শুইয়া। অতএব আগে চল আগে চল।'

আস্তে ভগ আসীনস্য ঊর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ॥
চরৈবেতি চরৈবেতি।

'যে বসিয়া থাকে তাহার ভাগ্যও রহে বসিয়া। যে উঠিয়া দাঁড়ায় তাহার ভাগ্যও উঠিয়া দাঁড়ায়। যে শুইয়া পড়ে তাহার ভাগ্যও পড়ে শুইয়া। অতএব আগে চল আগে চল।'

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠং স্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্॥
চরৈবেতি চরৈবেতি।

'শুইয়া থাকাই কলিকাল, জাগিয়া ওঠাই দ্বাপর, উঠিয়া দাঁড়ানোই ত্রেতা যুগ, অগ্রসর হইয়া চলাই সত্যযুগ। অতএব চল চল।'

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥
চরৈবেতি চরৈবেতি।

'চলাটাই মধু, চলাটাই স্বাদু ফল অর্থাৎ চলাটাই চলার অমৃতময় ফল। চাহিয়া দেখ সূর্যের অফুরন্ত আলোকসম্পদ, সৃষ্টির আদি হইতে চলিতে চলিতে যে একদিনও হয় নাই ক্ষান্ত। অতএব আগে চল আগে চল।'

এসব তো যজ্ঞের কথা নয়। আরও অপূর্ব সব কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। যজ্ঞের কথা বলিতে গিয়া ঐতরেয় বলিলেন, যাঁহার যাহা শিল্প তাহাতেই তাঁহার সাধনা। মানুষ তাহার আপন শিল্প দিয়াই দেবশিল্পের স্তবগান করে। মানুষশিল্প তো দেবশিল্পেরই অনুকরণ।

শিল্পের এই মর্ম জানিলেই শিল্পের যথার্থ মহত্ত্ব বুঝা যায়। এই শিল্পযজ্ঞের ফলে আর কোনো পুণ্য বা স্বর্গ বা পার্থিব কোনো শুভ ফল লাভ না করিলেও ইহাতে আত্মসংস্কৃতি লাভ হয়। ইহার দ্বারা যজ্ঞমান আপনাকে বিশ্বছন্দে ছন্দোময় করিয়া তোলেন।

ওঁ শিপানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে· ·। শিল্পং হাস্মিন্ অধিগম্যতে য এবং বেদ যদেব শিল্পানী*। আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬ ৫.১

আজ পর্যন্ত শিল্পের যথার্থ মহত্ত্ব সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় কথা আর কোথাও ঘোষিত হয় নাই। এইখানে বাউল মদনের একটা গান তুলনীয়।

মদন ছিলেন মুসলমান। বাউল মদন গানই গাহিতেন। শাস্ত্রপন্থী মুসলমানেরা বাউল মদনের গান গাহিবার নিন্দা করিলে মদন গাহিলেন—

যদি করছ মানা ওগো বন্ধু মানি এমন সাধ্য নাই।
আমার নামাজ আমার পূজা গানে গানে চলছে তাই।
কোনো ফুলের নামাজ রংবাহারে
কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে
আবার বীণায় নামাজ তারে-তারে
আমার নামাজ কণ্ঠে গাই। · ·

নিয়ত অগ্রসর হইবার যে তাগিদ চরৈবেতি মন্ত্রে পাই তাহারই প্রতিধ্বনি দেখা যায় পরবর্তী কবীরের অগ্রসর-বাণীর মধ্যে। কবীর বলেন—

বহতা পানী নির্মলা বন্ধা গন্ধিলা হোয়।

'যে জল বহিয়া চলে তাহা নির্মল থাকে। বদ্ধ জল উঠে পচিয়া।'

তাই কবীর বলেন—

মারগ চালতা জো গিরৈ
তাকো লগে ন দোষ।

'পথে চলিতে গিয়া যদি পড়িয়াও যাও তবু তাহাতে দোষ নাই'।

এই জন্যই কবীর-সাধুদের মুখে শুনি—

করনা নহী মন দিলগিরী।
জব জাগো তব মুসাফিরী॥

'মন অবসন্ন হইও না, যতক্ষণ জাগিয়া থাক ততক্ষণ নিজেকে যাত্রী মনে করিবে।'

ব্রাহ্মণযুগের পর আসিল উপনিষদের যুগ। অধ্যাত্ম সাধনাই উপনিষদের সার তত্ত্ব, যাগযজ্ঞ নহে। গুরুর কাছে বসিয়া লোকালয় হইতে দূরে এই অধ্যাত্ম বিদ্যা লাভ করিতে হয়। গুরুর কাছে বসিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্ব শুনিতে হয় বলিয়াই এই বিদ্যার নাম উপনিষৎ।

উপনিষদে দেখা যায় বিশ্বের সব সত্যের মধ্যে পুরুষই সব শ্রেষ্ঠ। তাহার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর এক-এক তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা। ক্রমে আসিল মহৎ তত্ত্ব। মহৎ হইতে অব্যক্ত বড়, অব্যক্ত হইতে পুরুষ বড়। পুরুষ হইতে বড় আর কিছুই নাই। তাহাই পরাকাষ্ঠা, তাহাই পরাগতি।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ কঠ ১-৩.১১

এই পুরুষ বিশ্বব্যাপী সত্য এবং তাহা সর্বলোকের অতীত। ইহাকে পাইলেই জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

··পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।

যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥ কঠ ২.৬.৮

মানবের হৃদয়ে একশত এক নাড়ী। তাহার মধ্য হইতে একটি নিঃসৃত হইয়া মূর্দ্ধায় গিয়াছে। তাহাতে উর্ধ্বে উঠিলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্

তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।

তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি··। কঠ ২. ৬. ১৬

এই তো পুরাপুরি কায়াযোগের কথা। বাউলদের সঙ্গে উপনিষদের এখানে কোনো পার্থক্য নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে বাজসনেয়ি সংহিতায় চরম স্থানে পাওয়া গিয়াছে উপনিষদের সার ঈশোপনিষৎ—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

সেই সত্যই সমস্ত উপনিষদে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। উপনিষৎ সাহিত্যটা আগাগোড়াই mystic বা মরমী—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবাহনুপশ্যতি।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ ঈশা ৬

আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনার মধ্যে দেখাই তো বাউলের সার সাধনা।

উপনিষৎ হইতে মরমীবাদ দেখাইতে হইলে সবই উদ্ধৃত করিতে হয়। কাজেই সারা উপনিষদের অসংখ্য বাণী হইতে দুই-একটা মাত্র এখানে উদ্ধৃত করা যাউক। সমস্ত উপনিষদে তাহাদেরই প্রতিধ্বনি দেখা যায়।

উপনিষৎ বলিলেন, বাহিরে সর্বত্র যাঁহাকে দেখিতেছ অন্তরের মধ্যেও তিনিই অন্তরময় পুরুষ।

যশ্চায়মস্মিন্ আকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ

তিনিই তোমার হৃদাকাশে অধ্যাত্ম (বৃহ. আ. ২.৫.৩০.)।

বাহিরে যাঁহাকে উপাসনা করিতেছ তিনি তো সেই পরমপুরুষ নহেন—

নেদং যদিদমুপাসতে। কেন ১. ৪-৮

জীব ও ব্রহ্ম দুইই পরম বন্ধু, প্রেমে মাখামাখি।

দ্বা সযুজা সখায়া॥ মুণ্ডক ৩. ১

তাঁহাকে বাহ্য কোনো ক্রিয়াকাণ্ডে চাহিবে না। তিনি যদি আপন প্রেমে ধরা দেন তবেই তাহার সন্ধান মিলিবে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ মুণ্ডক ৩. ২. ৩

বাউল

শ্রীনন্দলাল বসু

এবং

পুরুষান্ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। কঠ ২. ৩. ১১

এই সবই তো পুরাপুরি বাউলিয়া তত্ত্ব।

উপনিষদের লক্ষ্য হইল মুক্তি, স্বর্গ নহে। সত্যই ইহা মুক্তির আলোক দেখাইল। এই উপনিষৎ যে শুধু মানবকে ধর্ম বিষয়েই আলোক ও অধ্যাত্ম সত্য দিল তাহা নহে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত সকল দিকেও ইহা দীর্ঘকাল-সঞ্চিত পুরাতন নানা বাধাবন্ধন ঘুচাইয়া বাউলতত্ত্বের মত উপনিষদের সত্যও সর্বভাবে জাতি পংক্তি প্রভৃতি নানা বদ্ধ সংস্কার ভাঙিতে প্রবৃত্ত হইল।

বহু উপনিষদে তাহার এই বন্ধন-মুক্তির চেষ্টা দেখিতে পাই। কিন্তু একটিমাত্র উপনিষৎ হইতে তাহার যুক্তিবাদের একটু পরিচয় দিব। উপনিষৎটির নাম বজ্রসূচিকোপনিষৎ। বজ্রসূচি বলেন, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান। এই বেদবচনানুরূপ কথা স্মৃতি সকলেও উক্ত"—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং বর্ণানাং
ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্॥

এখন বিচার করিতে হইবে ব্রাহ্মণ বলিতে বুঝায় কাহাকে? জীব-দেহ-জাতি-জ্ঞান-কর্ম-ধার্মিক, ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কোনটা?—

তত্র চোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। কিং জীবঃ? কিং দেহঃ? কিং জাতিঃ? কিং জ্ঞানম্? কিং কর্ম? কিং ধার্মিক ইতি? তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন।

তাহার মধ্যে প্রথম হইল জীব। জীবই কি তবে ব্রাহ্মণ? তাহাও তো বলা চলে না। কারণ অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে নানা-জাতীয় দেহের মধ্য দিয়াই জীব চলিয়াছে। সে তো একরূপ। এক জীবেরই কর্মবন্ধে অনেক দেহ উৎপন্ন হয়। সর্বশরীরের জীবের একরূপত্বের কথা বিচার করিলেই বুঝা যায় জীব কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি
কর্মবশাদনেকদেহসংভবাৎ সর্বশরীরাণাং জীবস্যৈকরূপত্বাচ্চ।
তস্মান্ ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি—

তবে কি দেহই ব্রাহ্মণ? তাহাও তো নহে। আচণ্ডাল সকল মানুষেরই শরীর পাঞ্চভৌতিক এবং একই প্রকারের। সর্বত্রই জরামরণাদি একই রূপ ধর্মাধর্ম। ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ, এমন তো কোনো নিয়ম নাই। দেহটাই ব্রাহ্মণ হইলে মৃত পিতা প্রভৃতিদের দাহ করায় পুত্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়। কিন্তু তাহা তো হয় না। কাজেই দেহও ব্রাহ্মণ নহে।

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ ন। আচণ্ডালাদিপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণ-ধর্মাধর্মাদিসাম্যদর্শনাদ্। ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ। পিত্রাদিশরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদিদোষসম্ভবাচ্চ। তস্মান্ ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি।

তবে কি জাতিই ব্রাহ্মণ? তবে জাত্যন্তরবিশিষ্ট অনেক জন্তুতে অনেক জাতি হইত। আর সেইরূপ নানা জন্তুতে দেখা যায় অনেক জাতিবিশিষ্ট অনেক মহর্ষির জন্ম হইয়াছে। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুক, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্তকন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে

গৌতম, উর্বশী হইতে বসিষ্ঠ, কলস হইতে অগস্ত্যের জন্ম— এইরূপ শ্রুতি আছে। জাতির বাহিরেও জ্ঞান প্রতিপাদিতা বহু ঋষি আছেন, তাই জাতিও ব্রাহ্মণ নহে।

তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ন। তত্র জাত্যন্তর-জন্তুষু অনেকজাতিসম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বুকো জম্বুকাৎ, বাল্মীকো বল্মীকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াম্, শশপৃষ্ঠাদ্ গৌতমঃ, বসিষ্ঠ উর্বশ্যাম অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বপ্রাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি।

তবে কি জ্ঞানই ব্রাহ্মণ? অভিজ্ঞ পরমার্থদর্শী ক্ষত্রিয়ও তো অনেক আছেন। তাই জ্ঞানও ব্রাহ্মণ নহে—

তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থদর্শিন অভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি।

তবে কি কর্মই ব্রাহ্মণ? সকল প্রাণীরই প্রারব্ধ সঞ্চিত ও আগামী কর্মের সাম্য দেখা যায়, কর্মপ্রেরিত হইয়াই লোক কর্ম করে। তাই কর্মও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

তর্হি কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ন। সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসঞ্চিতাগামিকর্মসাধর্ম্যদর্শনাৎ কর্মাভিপ্রেরিতাঃ সন্তো জনাঃ ক্রিয়া কুর্বন্তীতি। তস্মান্ন কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি।

তবে কি ধর্মই ব্রাহ্মণ? তাহাও তো নহে। কারণ হিরণ্যদাতা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রও বহু আছেন। তাই ধার্মিকও ব্রাহ্মণ নহে।

তর্হি ধার্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন ধার্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি।

তবে কাহাকে বলা যায় ব্রাহ্মণ? যিনি অদ্বিতীয় জাতিগুণ ক্রিয়াতীত সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপ পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনিই যে ব্রাহ্মণ ইহাই শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসেরও অভিপ্রায়। আর কোনো মতেই ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

তর্হি কো ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিদাত্মানম্ অদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং· · সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং· · সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য· · বর্ততে· · স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব-সিদ্ধির্নাস্ত্যেব।

প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে (৯৭৩-৯৮১) খৃষ্টাব্দে, এই বজ্রসূচিকোপনিষৎ চীন ভাষায় রূপান্তরিত হয়। উপনিষৎখানি অবশ্য বহু প্রাচীন। এতকাল আগেও বাউলিয়া সমাজ-বিদ্রোহ দেশের মধ্যে দেখা গিয়াছে।

বড় বড় প্রধান উপনিষদগুলির পরিচয় অনেকেই জানেন। তাহা ছাড়া আরও বহু উপনিষৎ আছে যাহা সাধারণত সাধুসন্ন্যাসীদের মধ্যেই প্রচলিত। সেইসব উপনিষদের বাণীর সঙ্গে সন্ত ও বাউলদের মনের আরও বেশি মিল দেখা যায়। F. Otto Shrader মাদ্রাজ আডিয়ার লাইব্রেরি হইতে 'সংন্যাস উপনিষৎ' প্রভৃতি এইরূপ কয়েকখানি উপনিষৎ Minor Upanishads নামে ১৯১২ সালে বাহির করেন। সেখান হইতেই ১৯৩৩ সালে আরও কিছু অপ্রকাশিত উপনিষৎ প্রকাশিত হয়। তাহাদের মধ্যে শাট্যায়নীয়োপনিষৎ বলেন, মনই হইল মানুষের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ॥ পৃ ৩২১

বাউলদেরও এই একই কথা। 'বাহ্যবিচারে ফল নাই। ভিতরের বস্তু যে মন, তাহাকে আগে শুদ্ধ কর।' বাহ্য-শিখা-সূত্র-আচারাদি ব্যর্থ। পরব্রহ্মোপনিষৎ বলেন, যিনি মনকে সাধন করিয়াছেন, অন্তরেই তাঁহার শিখা, অন্তরেই তাঁহার উপবীত।

অথাস্য পুরুষস্যান্তঃশিখোপবীতিত্বম্॥ পৃ ২৯৫

ব্রহ্মোপনিষৎ বলেন, যাঁহার বোধ আছে তিনি বাহিরের শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া অক্ষয় পরব্রহ্মকেই সূত্র-স্বরূপে ধারণ করেন—

সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্ বুধঃ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্রমিতি ধারয়েৎ॥

যাঁহাদের এই অন্তরের জ্ঞান-যজ্ঞোপবীত আছে তাঁহারাই সূত্রবিৎ। তাঁহারাই যথার্থ যজ্ঞোপবীতধারী।

সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্।
তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ॥

নারদপরিব্রাজকোপনিষদেও (১৫১-১৫২) এই কথাই আছে।

পরব্রহ্মোপনিষৎ বলেন, ব্রাহ্মণ যদি মুক্তি চাহেন তবে অন্তঃশিখোপবীত ধারণ করিবেন—

ব্রাহ্মণস্য মুমুক্ষোরন্তঃশিখোপবীতধারণম্।

যাঁহাদের শিখা জ্ঞানময়ী এবং উপবীত জ্ঞানময়, তাঁহারাই পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ, অন্যদের কিছুই নাই—

শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য নেতরেষাং তু কিংচন।

তাই যোগবিজ্ঞানতৎপর বিপ্র বহিঃসূত্র ত্যাগ করিবেন—

বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্ বিপ্রো যোগবিজ্ঞানতৎপরঃ॥

জাবালোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য অত্রিকে এইরূপ উপদেশ দিয়াই বুঝাইয়াছেন যে, বাহ্য চিহ্নের কোনো প্রয়োজন নাই। ভিতরের চিন্ময় বস্তুই আসল সত্য।

পরমহংসপরিব্রাজকোপনিষৎ বলেন, আত্মজ্ঞানই যথার্থ যজ্ঞোপবীত, ধ্যাননিষ্ঠাই যথার্থ দেখা। এমন সাধকেরই কর্ম পবিত্র। তিনিই সর্বকর্মকৃৎ, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠাপর, তিনিই দীপ্যমান, তিনিই ঋষিশ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্বজ্যেষ্ঠ, তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই জগদ্‌গুরু—

যস্যাত্মাদ্বৈতমাত্মজ্ঞানং তদেব যজ্ঞোপবীতম্। তস্য ধ্যাননিষ্ঠৈব শিখা। তৎকর্ম্ম পবিত্রম্, স সর্বকর্মকৃৎ, স ব্রাহ্মণঃ, স ব্রহ্মনিষ্ঠাপরঃ, স দেবঃ, স ঋষিঃ, স শ্রেষ্ঠঃ, স এব সর্ব্বজ্যেষ্ঠঃ, স এব জগদ্‌গুরুঃ।

জাতির দ্বারা কাহারও যথার্থ পরিচয় দেওয়া চলে না। মহত্বের পরিচয় দিতে হইবে চরিত্রের সাহায্যে, জাতি দিয়া আবার কি মহত্ব? মানুষই হইল সকলের সার। এই কথা বলিয়াছিলেন অথর্ববেদ—

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্।

তাহার পর মহাভারতে ভীষ্ম বলিলেন—

ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ॥

সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ। তাহার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণেরও যথার্থ ঐশ্বর্য হইল তাহার একতা সমতা ও সত্যতার মধ্যে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব তাহার শীল অহিংসা সরলতা তপস্যা ও কর্মফলের ত্যাগশক্তি। ইহাও ভীষ্মেরই কথা—

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং
যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।
শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জবং
ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥ শান্তিপর্ব ১৭৫, ৩৭

মহাভারতে বাউলিয়া বহু তত্ত্ব আছে। আজ আর তাহা বলার স্থান নাই। মহাভারত মানুষেরই জয়গান করিয়াছেন। এখানে উপনিষদেরই আর কিছু বলা যাউক। ইতিহাসোপনিষৎ বলেন, ঋগ্বেদ যদি পড় তবে জানিবে বাহ্য দেবতাদের কথা, মানুষের তত্ত্ব তাহাতে নাই। যজুর্বেদে জানিবে শুধু বাহ্য যজ্ঞের কথা, অন্তরের সাধনা নহে। সামবেদ আনিলে বাহ্য আর-সব জানিবে, কিন্তু মানসবেদ জানিলেই অন্তরস্থিত ব্রহ্মকে জানা যাইবে—

ঋচো হ যো বেদ স বেদ দেবান্
যজূংষি যো বেদ স বেদ যজ্ঞম্।
সামানি যো বেদ স বেদ সর্বম্
যো মানসং বেদ স বেদ ব্রহ্ম॥

বর্ণাশ্রম ধর্ম ছাড়িয়া অন্তরের সাধনা করিয়াই মানুষ আনন্দ-তৃপ্ত হইতে পারে।

বর্ণাদিধর্মং হি পরিত্যজন্তঃ
স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি॥ মৈত্রেয় উপনিষৎ

কারণ, বাহ্য বিগ্রহ পূজায় মুক্তি নাই, তাই মুক্তির জন্য স্বহৃদয়ার্চন কর, বাহ্যার্চনা ছাড়।

পাষাণলোহমণিমৃন্ময়বিগ্রহেষু
পূজা পুনর্জননভোগকরী মুমুক্ষোঃ।
তস্মাদ্ যতিঃ স্বহৃদয়ার্চনমেব কুর্যাদ্
বাহ্যার্চনং পরিহরেদপুনর্ভবায়॥

বাউলদের মতই এইসব উপনিষদ্‌বাদীরা বাহ্য সন্ধ্যা পূজা মানেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, অশৌচ হইলে তো সন্ধ্যামন্ত্র নাই। আমাদের মোহ-মাতা মরিয়াছেন, বোধময় পুত্র জন্মিয়াছে। জাতাশৌচ মৃতাশৌচ দুই অশৌচ একত্রে উপস্থিত। কেমনে সন্ধ্যা করি?—

মৃতা মোহময়ী মাতা জাতো বোধময়ঃ সুতঃ।
সূতকদ্বয়সংপ্রাপ্তে কথং সন্ধ্যাম্ উপাস্মহে॥

দিনের অবসানে সূর্য অস্ত গেলে বা রাত্রির অবসানে সূর্যের উদয় হইলে তো সন্ধ্যা করা যায়। আমার হৃদয়াকাশে চিৎ-সূর্য সদাই আলোকে-আলোকে জ্যোতির্ময়। তাহার উদয়ও নাই অস্তও নাই। কেমনে সন্ধ্যা তবে করি—

হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতি।
নাস্তমেতি ন চোদেতি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥ মৈত্রেয় উপনিষৎ পৃ ১১৬

কাজেই বাউলদের মতই এইসব জ্ঞানী বাহিরের ভেখ বা আচার মানেন না। তাঁহারা

অব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারাঃ॥ জাবালোপনিষৎ পৃ ৬৯

বাউলদের সেরা কথাই মৈত্রেয় উপনিষদে, দেহই তোমার দেবালয়। তাহাতে যে জীব তিনিই তো শিব—

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।

কাজেই বাহ্য ও বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে মানুষের অন্তরের ভাব ও চরিত্রই যে বড় কথা সে কথা বাউলদেরও বহু পূর্বে ইঁহারা জোর করিয়া শুনাইয়া দিলেন।

উপনিষৎ ও তন্ত্রাদির পর বেদবাহ্য ধর্মগুলির মত দেখা যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ মতেও তো মানুষই সার তত্ত্ব, জাতি-পংক্তি প্রভৃতির বিচার মিথ্যা মাত্র। সাধনার মধ্যপন্থাই সার সাধনা। মানবীয় চরিত্রের মহত্ত্বই যথার্থ মহত্ত্ব। মানুষের মত মানুষের সেবা করিতে পারিলে দেবতারাও ধন্য হন। কাজেই জৈন-বৌদ্ধ মতের ও বাউল মতের মিল না দেখাইলেও চলে। পুরাণের অনেক স্থলেই 'বাউলিয়া' তত্ত্ব দেখা যায়। জাতি-পংক্তি-অগ্রাহ্য-করা এইসব কথা কোনো কোনো পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে। যথা ভবিষ্য পুরাণ বলিলেন—সামগ্রী ও অনুষ্ঠানগুণে যখন শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণের সমান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে তাহারা কোনো মতেই কম নয়, তখন ব্রাহ্মণে শূদ্রে ভেদ করা কেন? না আধ্যাত্মিক না বাহ্যনিমিত্তক কোনো মতেই এই ভেদ সিদ্ধ হয় না।

সামগ্র্যানুষ্ঠানগুণৈঃ সমগ্রাঃ
শূদ্রা যতঃ সন্তি সমা দ্বিজানাম্।
তস্মাদ্ বিশেষো দ্বিজশূদ্রনাম্নো
নাধ্যাত্মিকো বাহ্যনিমিত্তকো বা॥ ভবিষ্য-পুরাণ, ব্রহ্মপর্ব ৪১. ২৯

কোনো দিক দিয়াই তো শূদ্রে ব্রাহ্মণে কোনো ভেদ মেলে না। না বাহিরে-ভিতরে, না সুখে-ঐশ্বর্যে, না আজ্ঞায়-ভয়ে, না বীর্যে-আকৃতিতে, না জ্ঞানে-কর্মে, না আয়ুতে-স্বাস্থ্যে, না দৌর্বল্যে-স্থৈর্যে, না চপলতায়-প্রজ্ঞায়, না বৈরাগ্যে-ধর্মাচরণে, না পরাক্রমে-ত্রিবর্গে, না রূপে-নৈপুণ্যে, না ভেষজে-স্ত্রীগর্ভে, না গতিতে-দেহমলসংপ্লবে, না অস্থিরন্ধ্রে না প্রেমে, না প্রমাণে না লোমে। ব্রাহ্মণে শূদ্রে কোথাও কি একটুও ভেদ আছে?—

তস্মান্ ন চ বিভেদোঽস্ত্যস্যি ন বহির্নান্তরাত্মনি।
ন সুখাদৌ চৈশ্বর্যে নাজ্ঞায়াং নাভয়েষ্বপি॥
ন বীর্যে নাকৃতৌ নাক্ষে ন ব্যাপারে ন চায়ুষি।
নাংগেপুষ্টে ন দৌর্বল্যে ন স্থৈর্যে নাতি চাপলে॥
ন প্রজ্ঞায়াং ন বৈরাগ্যে ন বীর্যে ন পরাক্রমে।
ন ত্রিবর্গে ন নৈপুণ্যে ন রূপাদৌ ন ভেষজে॥
ন স্ত্রীগর্ভে ন গমনে ন দেহমলসংপ্লবে।
নাস্থিরন্ধ্রে ন চ প্রেম্ণি ন প্রমাণে ন লোমসু॥ ঐ ৪১. ৩৫-৩৮

দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া অতি যত্ন লইয়া খোঁজ করিলেও শূদ্রে-ব্রাহ্মণে কোনো ধর্মগত কোনো প্রকার ভেদই পাইলেন না—

শূদ্র-ব্রাহ্মণয়োর্ভেদো মৃগ্যমানোঽপি যত্নতঃ।
নেক্ষ্যতে সর্বধর্মেষু সংহতৈস্ত্রিদশৈরপি॥ ঐ ৪১. ৩৯

বজ্রসূচিকোপনিষদের মত ভবিষ্যপুরাণও বলেন,—ব্রাহ্মণেরাই কি চন্দ্রমরীচিবৎ শুভ্র, ক্ষত্রিয়েরাই কি কিংশুকপুষ্পবৎ রক্তবর্ণ? বৈশ্যেরাই কি হরিতালবর্ণ? শূদ্রেরাই কি অঙ্গারসমান কৃষ্ণ?—

ন ব্রাহ্মণাশ্চন্দ্রমরীচিশুভ্রা
ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংশুকপুষ্পবর্ণাঃ।
ন চেহ বৈশ্যা হরিতালতুল্যাঃ
শূদ্রা ন চাঙ্গারসমানবর্ণাঃ॥ ঐ ৪১. ৪১

চলায়-ফেরায় তনুতে-বর্ণে-কেশে সুখে-দুঃখে রক্তে-ত্বকে মাংসে-মেদে অস্থিতে-মজ্জায় সবাই সমান। তবে চারি বর্ণে কোথায় প্রভেদ দেখিব ?—

প্রাদপ্রচারৈস্তনুবর্ণকেশৈঃ
সুখেন দুঃখেন চ শোণিতেন।
ত্বঙ্‌ মাংসমেদোঽস্থিরসৈঃ সমানা
শ্চতুঃ প্রভেদা হি কথং ভবন্তি॥ ঐ ৪১ ৪২

বর্ণে প্রমাণে আকৃতিতে গর্ভবাসে বাক্যে বুদ্ধিতে কর্মে ইন্দ্রিয়ে প্রাণে বলে ত্রিবর্গে রোগে ভেষজে কোথাও জাতিগত কোনো বিশেষই তো দেখি না—

বর্ণপ্রমাণাকৃতিগর্ভবাস·
বাগ্‌বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়জীবিতেষু।
বলত্রিবর্গাময়ভেষজেষু
ন বিদ্যতে জাতিগতো বিশেষঃ॥ ঐ ৪১, ৪৩

সব কথার সার হইল, সবাই এক পিতা পরমেশ্বরের সন্তান, তবে আর জাতিভেদ দাঁড়ায় কিসে ? এক পিতার চারি সন্তানে কি চারি জাতি হইতে পারে ?—

চত্বার একস্য পিতুঃ সুতাশ্চ
তেষাং সুতানাং খলুজাতিরেকা।
এবং প্রজানাম্‌ হি পিতৈক এব
পিত্রৈকাভাবান্‌ ন চ জাতিভেদঃ॥ ঐ ৪১. ৪৫

জৈন বৌদ্ধদের কথা পূর্বেই সামান্য একটু উল্লেখ করিয়াছি। এখন দেখা যাইবে এই দুই ধর্মই দোষে-গুণে ক্রমেই একেবারে বাউলিয়া মরমী বলিয়া চলিতেছিল।

পরবর্তী কালের জৈন গ্রন্থ পাহুড় দোহাই তাহার প্রমাণ। পাহুড় দোহার রচয়িতা মুনি রামসিংহ ১০০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছির মানুষ। এই এক পাহুড় দোহা হইতেই কথাটা অনেক পরিষ্কার করিয়া বুঝানো যাইবে। মূল আর উদ্ধৃত করা গেল না। দোহার সংখ্যা দিয়া মিলাইয়া দেখা যায়—

ভেখ তো বদ্‌লাইলে, সাপও তো খোলস বদলায়, কিন্তু তাতে কি বিষটুকু সাপ কখনো ছাড়ে ? দোহা ১৫

মাথা মুড়াইয়া ধর্মশিক্ষা নিলে ? যখন পরের ভরসা ছাড়িবে তখনই সংসার-ত্যাগ হইতে সার্থক। ঐ ১৫৩

তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুধু দেহদুঃখই সার হইল। ঐ ১৭৮

ওহে যোগী, যাঁর সন্ধানে মরিতেছ ঘুরিয়া, তিনি তো তোমারই মধ্যে। হায় সেই শিবস্বরূপেরই পাইলে না পরিচয় ? ঐ ১৭৯

মন যদি শুদ্ধ না হয় তবে শাস্ত্রপাঠে কি মোক্ষলাভ হইবে ? ঐ ১৪৬

জ্ঞানময় আত্মা ছাড়া আর সব শাস্ত্রই মিছা কল্পনা মাত্র। ঐ ১৭৯

বৃথা মরিতেছ বাহ্য শাস্ত্র পড়িয়া। জীবনের মধ্যে উদয়-অস্তের যে সন্ধান তাহাই যদি না পাইলে তবে সবই বৃথা। ঐ ১৭৩

যদি ভিতরেই তোমার চিত্ত মলিন থাকে বাহিরের তপস্যায় তবে ফল কি? ঐ ৬১

তীর্থাটন ও ধূর্তপনা সবই ভণ্ডামি। গুরুর প্রসাদে আপন দেহের মধ্যেই দেবতার সন্ধান কর। ঐ ৮০

বাহ্য দেবালয় মিথ্যা। সাড়ে তিন হাত এই দেহ-দেবালয়েই সন্ত নিরঞ্জনের বাস। যদি তাঁহাকে চাও, নির্মল হইয়া সেখানেই কর সন্ধান। ঐ ৯০

সন্তদিগের অধিষ্ঠান যে দেহ, হায়, সেই আপন দেহের মধ্যেই তাঁহাকে করিলে না সন্ধান? ঐ ১৮০

শিবস্বরূপ বিরাজমান তোমার দেহ-দেবালয়ে। আর তুমি কিনা খোঁজ কর তাঁহাকে বাহিরে দেবালয়ে! মনে আসে হাসি, হায় হায়, ভিতরের সিদ্ধপুরুষকে তুমি বানাইলে ভিখারি! ঐ ১৮৬

সিদ্ধি চাও তবে বাহ্য চেষ্টা ছাড়, চিত্ত নির্মল কর। ঐ ৮৮

নির্মল চিত্তে দয়ার হয় উদয়। দয়া বিনা ধর্ম মেলেনা। ঐ ১৪৭

আপন আত্মাই তো সর্বত্র। পর বলিয়া তো কেহই নাই। সবাই যখন আত্মীয়, তখন কলহ-বিদ্বেষ হইবে কাহার সঙ্গে? ১৩৯

আগে পিছে সর্বদিকে দেখিয়াছি আমারই অন্তরের আত্মপুরুষকে। আমার সব ভ্রান্তি মিটিয়াছে, আর কিছু শুধাইবার নাই। ঐ ১৭৫

শূন্য কখনো শূন্য নয়। অন্তর দিয়া দেখ সব শূন্যই পরম পূর্ণ। ঐ ২১২

এইখানে অথর্ব বেদের বাণী মনে হয়—

পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা ন সর্বে মনসা বিদুঃ॥

আমার অন্তর-পুরুষই যদি সর্বত্র বিরাজিত তবে ঘৃণ্যই বা বলি কাহাকে? অস্পৃশ্যই বা বলি কাহাকে? তবে কে বা ত্যাজ্য কে বা পূজ্য? ঐ ১৩৯

এই সবই তো বাউলদের ধর্মের একেবারে সব সার কথা। তাহার পর তাহাদের সমরসতত্ত্বও পাহুড় দোহায় আছে। জলের মধ্যে লবণের মতো আপনাকে সর্বব্যাপীর মধ্যে উপলব্ধি করাই সমরস হওয়া। ঐ ১৭৬

সর্বজগতের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও সমরস সিদ্ধ হইবে না। একভাবে ভাবিত হইতে হইবে। ঐ ১৭৩

অন্তরের মধ্যে কোনো দোষ বা সঙ্কীর্ণতা থাকিলে চলিবে না। তাঁহার মতোই গুণ সম্পদের অতীত হইতে হইবে। তবেই হইবে উভয়ের মিলন॥ ঐ ১০০

এই দেহের মধ্যে আত্মময়কে পাওয়াই হইল নির্বাণ। ঐ ১৭৮

ইহা তো বাউলিয়া নির্বাণ। পুরাতন জৈন-বৌদ্ধ নির্বাণ হইতে ইহা ক্রমে ক্রমে এইখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আরও পরবর্তী জৈন সাধক কবি আনন্দঘনও এইসব কথাই নূতন করিয়া বলিয়াছেন। পরবর্তী জৈন সাধক লুঙ্কা শাহের প্রবর্তিত মতে, ঢুংডিয়া স্থানকবাসীদের সাধনায়, তারণগচ্ছ প্রভৃতিদের উপদেশে ক্রমেই এই সব মরমী মতবাদই আরও পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে, ক্রমেই জৈনসাধনার এই ধারা বাউলিয়া ভাবের দিকে চলিয়াছে।

জৈন দোহার পরেই দেখা যাউক পরবর্তী বৌদ্ধ দোহা। বৌদ্ধদের দোহাকোষ তো সহজ দিয়াই আরম্ভ। এই দোহাকোষ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। সহজের পরই সমরস

(১. ২)। তাহার পরই আকাশবৎ শূন্যচিত্তের 'খসমে'র কথা (১. ৫)। গুরুর কৃপাতেই এই শূন্যতত্ত্বের মর্মবোধ ঘটে (১. ৮)। দেখা যাইতেছে সহজ, সমরস, শূন্যতত্ত্বের আনন্দ প্রভৃতি সব বাউলিয়া মতই বৌদ্ধ দোহাতে মেলে।

বাহ্য তীর্থ ও দেবতা ব্যর্থ (২. ১৯. ৩. ২০)। সহজের মধ্যেই পরমানন্দের মর্ম (৩. ২৭)। পরমার্থ হইল স্বসংবেদগম্য (৩. ২৯)। মনকে মারিয়া নির্মূল করিতে হইবে, মনের মিথ্যা কল্পনাই যে আমাদের ঘুরাইয়া মারে (৪. ৩৩)। সহজ ছাড়া নির্বাণ নাই, ইহাই সরহপদ বলেন (১০. ১৩)। কায়াকেই সাধনা করিতে হইবে (১০. ৯)। শুধু ধ্যানের মধ্যে মোক্ষ নাই (১১. ১৪)। যেখানে মনপবনের সঞ্চার নাই রবি শশীর প্রবেশ নাই সেই অন্তরতম লোকেই চিত্তের বিশ্রাম (১২. ২৫)। পরম মহাসুখ আদি-মধ্য-অন্ত প্রভৃতি সীমার অতীত, তাহার মধ্যে আত্মপর ভেদের স্থান নাই (১৩. ২৭)। বদ্ধ মনই চতুর্দিকে মরে ধাইয়া, মুক্ত হইলে মন হয় নিশ্চল (১৫. ৪৩)। এই চঞ্চল মনকে স্থির করাই হইল সাধনা। এইসব বাউলিয়া ম- পুরাপুরি বৌদ্ধ দোহার মধ্যেও মেলে। মনকে লইয়াই মরমীদের যত বিপদ।

.হের উপর বৃথা লোকে কোপ করে, দেহকে বৃথা দুঃখ দেয়। দেহের কি দোষ? মনের দোষে দেহকে বৃথা কেন দণ্ড দেওয়া?

এই দেহের মধ্যেই গঙ্গা যমুনা ও সাগর সংগম। এখানেই প্রয়াগ বারাণসী, এখানেই চন্দ্র দিবাকর। দেহকে উপেক্ষা করা চলিবে না।

> এথু সে সুরসরি জমুনা এথু সে গঙ্গাসাঅরু।
> এথু প্রয়াগ বানারসি এথু সে চংদ দিবাঅরু ॥ ১৫. ৪৭

ঘরে রহিল তত্ত্ব। বাহিরে বৃথা করি অন্বেষণ (১৬. ৭২)। অজরামরের কথাও এইখানে (১৮. ৬৯)। এই দেহের মধ্যেই দেহাতীতের অপূর্ব গুপ্ত লীলা—

> অসরির কোই সরীরহি লুক্কো। ২১. ৮৯

সকল বাউলিয়া তত্ত্বের ইহাই সারতম তত্ত্ব।

শূন্য তরুর কথাও এইসব দোহায় পাই (২৩. ১০৮-১০৯)। সকল ধর্মের সার কথা হইল পর-উপকার ও মৈত্রী (২৩. ১১২)।

কাণ্হপাদের মতে আগম বেদ পুরাণ সবই মিছা (২৪, ২)। নিষ্কলুষ নিস্তরঙ্গ হইল সহজের রূপ, তাহার মধ্যে পাপপুণ্যের প্রবেশ নাই (২৫. ১০)। সেই সহজই হইল পরমতত্ত্ব, বেদশাস্ত্র মূর্খতার বিড়ম্বনামাত্র (২৫. ১২)। সহজে মন নিশ্চল করিয়া সমরস-সিদ্ধি করিলে জরামরণ দূর হয় (২৫, ১৯)।

সরহপদ বলেন, করুণা ও শূন্য এই উভয়কে যুক্ত করিলেই পায় সিদ্ধি (২৯. ৪)। চন্দ্র সূর্য যুক্ত করিলেই পাপপুণ্য ঘুচিয়া যায়। শরীর হয় অজরামর (৩০. ৭)। বৈরাগ্য তাঁহাদের মতে পাপ, সুখই পুণ্য (দোহাকোষ ১২৬)। সর্বচরাচরই সুখময়— সুখং সর্বং চরাচরম্ (ঐ)।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত) দেখি, গঙ্গা যমুনার মধ্যে বহে নাড়ী (২৬. ১৪)। শূন্যের সঙ্গে শূন্য মিলিলেই সহজ ধাম উদিত হয়—

> সুনে সুন মিলিআ জবেঁ
> সফল ধাম উইআ তবেঁ। ৬৭. ৪৪।

এইসব বৌদ্ধপদগুলি অষ্টমশতাব্দী হইতে লেখা। ইহা অপভ্রংশ ভাষায় লেখা।

সহজ সরল শুভ্র নিষ্কলংক প্রেমকেও সাধকেরা শূন্য বলিয়াছেন।

এইসব বৌদ্ধ ও জৈন দোহার আগে হইতেই গোরক্ষনাথের যোগ ও নানা নাথপন্থীর উপদেশ চলিতে আরম্ভ করে। নাথপন্থ বিষয়ে আমার সহযোগী শ্রীমান হাজারীপ্রসাদ ত্রিবেদী বহু কাজ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে দেখা যাইবে, বাউলিয়া মতের প্রায় সবই সেখানে আছে। সাধকদের মধ্যে এখনও প্রচলিত গোরক্ষ-সংহিতায়, শিবসংহিতায়, ঘেরণ্ডসংহিতায়, অষ্টাবক্রসংহিতায়, হটযোগ প্রদীপিকায় আরও নানা গ্রন্থে এইসব তত্ত্ব পাওয়া যায়। গোরক্ষবিজয় গোপীচন্দ্রের ও ময়নামতীর গানে, ভর্থরিদের পদেও সেই সব কথা।

তন্ত্রের কথা বেদের আলোচনার শেষকালেই করা হইয়াছে। দেহতত্ত্বে ও লোকাচার-বেদাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে, তন্ত্রে ও বাউলিয়া মতে মিল থাকিলেও তন্ত্রে বাউলদের আসল কথা অনুরাগ তত্ত্বই নাই। অনুরাগের বলেই ইঁহারা সব বন্ধন অতিক্রম করেন। এই প্রেম-পাখার জোরেই ইঁহারা সব কিছুর উপরে উড়িয়া যাইতে পারেন। তাই তাঁহারা বলেন—

আমরা পাখীর জাত।
আমরা হাঁইট্যা চলার ভাও জানি না,
আমাদের উড়ো চলার ধাত॥

মুসলমানদের আসার পরে ভারতীয় চিন্তার মধ্যে এবং ধর্মসাধনার মধ্যে বড় একটা সংস্পর্শ ঘটিল। পাশাপাশি থাকিলেও হিন্দু-মুসলমান দুই দলেরই পণ্ডিতেরা দেখিলেন চেষ্টা করিয়া কিছুতেই দুই ধারাকে মিলাইতে পারিলেন না। তখন নিরক্ষর সাধকের দলই উভয় সাধনার মান রক্ষা করিলেন।

কবীর যখন হিন্দু-মুসলমান সাধনাকে উদার প্রেম ও ভক্তিভাবের মধ্যে মিলাইতে চাহিলেন তখন পণ্ডিতেরা বলিলেন, "তুই তো নিরক্ষর মূর্খ! পণ্ডিতেরা যাহা পারিলেন না, তাহা তুই কি পারিবি?" কবীর বলিলেন, "আমরা পণ্ডিত নহি বলিয়াই হয়ত পারিব। পণ্ডিতেরা পড়িয়া পড়িয়া পাথর বনিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা লিখিতে লিখিতে ঝামা ইঁট হইয়া গিয়াছেন। তাই দুই দলের ইঁটে পাথরে ঠোকাঠুকি হইলে আগুন জ্বলে। আমরা মূর্খ, আমরা হইলাম সহজ কাদামাটি। তাই হিন্দু কাদা মুসলমান কাদার সঙ্গে সহজে মিলিবে। কিন্তু মোল্লাতে পণ্ডিতে কখনো মিল হইবে না।"

এই কবীরেরও গুরু ছিলেন সাধক রামানন্দ। রামানন্দ জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি আচারপন্থী রামানুজদের দলে ছিলেন। কিন্তু তিনি অন্তরে প্রেমভক্তি পাইয়া আর আচার মানিতে পারিলেন না। তিনি আচারের বেড়া ভাঙিলেন। সম্প্রদায় তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তাঁহার সঙ্গেসঙ্গে কিছু ব্রাহ্মণও বাহির হইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রধান শিষ্যই হইলেন জোলা কবীর, মুচি রবিদাস, নাপিত সেনা, জাঠ ধন্না প্রভৃতি। নারীকেও তিনি দীক্ষা দিলেন, তাঁর শিষ্য পীপা ছিলেন রাজপুত।

রামানন্দের মধ্যেই বাউলিয়া তত্ত্বের সারমর্ম পাই। তিনি দেখাইলেন, বাহ্য আচারই হিন্দু-মুসলমান সাধনার মিলনের বাধা। ভক্তিতে প্রেমে তো সবাই মিলিতে পারে। রামানন্দ দেখাইলেন, ধর্ম বাহিরে নয়, ধর্ম ভিতরে। সারতত্ত্ব এই মানবদেহেরই মধ্যে। কাজেই বাউলিয়া কায়াযোগই রামানন্দ জোর

করিয়া প্রচার করিলেন। গ্রন্থসাহেবে রামানন্দের যে বাণী আছে তাহাতে দেখি— বাহিরে যাও কোথায়? দেহমন্দিরেই তোমার আপন ঘরেই চলিয়াছে অপরূপ লীলা—দেখিয়া ধন্য হও—

কত জাইঐ রে ঘর লাগো রংগু॥ গ্রন্থ সাহেব বসন্ত রাগ

রামানন্দ বলিলেন, ভগবানকে পূজিতে ব্যাকুলভাবে চুয়া-চন্দন লইয়া চলিলাম বাহিরের দেবমন্দিরে। গুরু বলিলেন, ব্রহ্ম যে তোরই মনের মধ্যে। বাহিরে যেখানেই যাইবে, মিলিবে শুধু তীর্থের নামে জল আর মূর্তির নামে পাষাণ—

এক দিবস মন ভঈ উমংগ।
ঘসি চংদন চোআ বহু সুগংধ।
পূজন চালী ব্রহম ঠাঈ।
সো ব্রহমু বতাইও গুর মনহী মাহি॥
জহাঁ জাইঐ তহঁ জল পখানা॥ ঐ

রামানন্দ আরও বলিলেন, বেদে পুরাণে বৃথা তাঁহাকে খুঁজিয়া মরা। অন্তরের মধ্যে না পাইলে তবে না হয় এই ব্যর্থভাবে বাহিরে তাঁহাকে খুঁজিয়া মরার কোনো অর্থ থাকিত। কিন্তু অন্তরে সন্ধান না করিয়াই বাহিরে বৃথা ঘুরিয়া মর কেন?—

বেদ পুরাণ সভ দেখে জোই।
উহাঁ তউ জাইঐ জউ ঈহাঁ ন হোই॥ ঐ

আর্যদের চেয়ে দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রেম ভক্তি ছিল বেশি করিয়া। তাই বলা যায় এতদিন প্রেমভক্তি ছিল ভারতের দক্ষিণ দেশে। উত্তরভারতে ছিল ব্রহ্মজ্ঞান যুক্তিবিচার ও কর্ম। এতদিনে রামানন্দ সেই দক্ষিণের প্রেমভক্তি উত্তর দেশে আনিলেন। সঙ্গেসঙ্গে তিনি উত্তরপূর্ব ভারতের বঙ্গ-মগধের স্বাধীন চিন্তাও নিলেন। ইহাতে এক মহা সাধনার সঙ্গম ঘটিল। এই সঙ্গমের ফল কবীর সর্বত্র ছড়াইলেন—

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীরনে সপ্তদ্বীপ নৌখণ্ড।

এই কাজে সাধক সদনা ও নামদেবের নামও উল্লেখযোগ্য। সদনা জাতিতে কসাই। আর নামদেব জাতিতে দর্জি। কবীর ছিলেন মুসলমান বংশীয় জোলা, এবং রজ্জব ছিলেন মুসলমান তুলাধুনকর। তবে কবীরের সঙ্গে কাহারও তুলনা নাই।

কবীর বলিলেন, মন্দিরে বা মসজিদেই যদি ভগবানকে খোঁজ কর তবে ঝগড়া মিটিবে না। তিনি সবার অন্তরে। সকল মানব-দেহের মধ্যেই ভগবানকে পাইলে সব ঝগড়া যাইবে মিটিয়া; অন্তরে খোঁজ কর।—খোদা যদি মসজিদেই থাকেন তবে বাকি জগৎটা কাহার? তীর্থে মূর্তিতেই রাম থাকিলে কেহই তো তাহাতে তাঁহাকে পাইবে না? পূবে থাকেন হরি, পশ্চিমে থাকেন আল্লা। আরে অন্তরের মধ্যে দেখো খুঁজিয়া, সেখানেই রাম রহিমান—

জৌর খুদাই মসজিদ বসতু হৈ ঔর মুলুক কিসকেরা।
তীরথ মূরত রাম নিবাসী দুহমেঁ কিনহুঁ ন হেরা॥
পূরব দিসা হরীকা বাসা পছিম অলহ মুকামা।
দিলহী খোজি দিলৈ দিল ভিতরি ইহাঁ রাম রহিমানা॥

বাউলিয়া মতের সব কথাই কবীরের মধ্যে পাওয়া যায়। জ্যান্তে-মরা বাউলের এক মহাতত্ত্ব। কবীর বলেন—

জীবত মেঁ মরণা ভলা জো মরি জানৈ কোয়॥ সাখীগ্রন্থ পৃ ৩৩০

মরিতে যদি জান তবে জীবন্তেই মর, ইহাই সার পথ।

সুফীদের তাহাই 'ফনা ফিল্লা'। বাউলদের সার সাধনাই এই। কবীর বলেন,—

মরতে মরতে জগ মুআ ঔসব মুআ ন কোয়। ঐ

মরিতেছে সবাই। মরিতে মরিতে—সবাই মরিবে। তবে যথাকালে আপন সাধনায় মরে কে? জ্যান্ত না মরিলে দেহের মধ্যে ভগবানকে পাইবে না। দেহ-সাগরের অন্ত কোথায়?—

কায়া মাহি সমুদ্র হৈ অংত ন পাবৈ কোয়।

মিরতক হোয় করি জো রহৈ মাণিক লাবৈ সোই॥ ঐ, পৃ ৩৩১

বাউলও বলেন—

আছে তোরই ভিতর অতল সাগর তার পাইলি না মরম।

কায়ার মাঝে যে সমুদ্র, তার অন্ত কে পায়? জীবন্তে যদি মরিতে পার তবেই সে এই সাগরের মানিক পাইবে।

মুক্তার ডুবুরীদের 'মরজীবা' বলে—

জো মরণা সো জগ ডরৈ সো মেরে আনন্দ।

কব মরিহৌঁ কব ভেটিহৌঁ পূরণ পরমানন্দ॥ ঐ, পৃ ৩৩২

'যে মরণকে লোকে ডরায়, তাহাতেই আমার আনন্দ। মৃত্যুতে কবীরের ভয় নাই। তিনি আনন্দেই মরিতে চাহেন। কবীর বলেন, কবে মরিব? কবে পূর্ণানন্দের সাক্ষাৎকার পাইব?'

রাম কহে তো মরি কহো জীবত মিলে ন রাম। পৃ ৩৩৩

যদি ভগবান বলিতে চাও তবে মরিয়া পাইতে হইবে সেই নাম। জীবিত থাকিলে এই তত্ত্ব পাইবে না—

বিন পারন কী রাহ হৈ। ঐ পৃ ৩৭৭

এই সাধনার পথ দুর্গম। বিনা পায়ে সেখানে চলিতে হয়। বাহিরের পায়ে-হাঁটা কোনো পথ এই পথ নহে।

প্রেম ছাড়া এই জীবন্তে মরণ সম্ভব হয় না। প্রেমের জগতে যে দুইকে এক হইতে হয়। কেহ না কেহ না মরিলে (আত্মবিলয় না করিলে) তাহা হয় কেমনে?

জব্ মৈঁ থা তব পির নহী অব পির হৈ মৈঁ নাহিঁ।

প্রেম গলী অতি সাঁকরী তামেঁ দোন সমাহিঁ॥ ঐ, পৃ ১৫৫

যখন প্রিয়তম ছিলেন তখন আমি ছিলাম না। এখন আমি আছি, তিনি নাই। প্রেমের পথ অতি সূক্ষ্ম। দুইয়ের এখানে ঠাঁই নাই।

এইখানে কবীর এক মহাতত্ত্ব বলিয়াছেন। ভারতে এক দল হইলেন অদ্বৈতবাদী, আর-এক দল দ্বৈতবাদী। ইহাদের ঝগড়া হাজার হাজার বছর চলিয়াছে। তাহা কখনও মেটে নাই। কিন্তু বাউলেরা বলেন, দুই-একের দ্বন্দ্ব প্রেম হইলেই তো মেটে। দুই না হইলে প্রেম হয় না, আবার দুই মিলিয়া এক না হইলেও প্রেম হয় না। কাজেই দুই যখন এক হয় তখনই প্রেমের উদয়। বাউলেরা বলেন—

নিত্য-দ্বৈতে নিত্য-ঐক্য প্রেম তার নাম।

কবীরও বলেন দুই-একে তখনই মিলিবে যখন প্রেমের সন্ধান পাইবে। কারণ কবীরের মতে—

প্রেমগলী অতি সাঁকড়ী, তামেঁ দো ন সমাহিঁ॥

এই সংকীর্ণ পথে দুইএর স্থান নাই। কাজেই প্রিয়তমের মধ্যে প্রেমের সাধককে মরিতে হয়। ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন (merged) হওয়াকেই মরা বলে। ইহাই হইল জ্যান্তে-মরা। ইঁহারা মূর্খ হইয়াও পরম সত্যকে ধারণ করিয়াছেন— বৃষ্টির জল নিম্নভূমিতেই দাঁড়ায়। উচ্চ ভূমিতে জল দাঁড়ায় না।

ঊঁচে পানী না টিকে নীচে হী ঠহরায়।

শূন্য তত্ত্ব বাউলদের এক বড় কথা। কবীর তো শূন্যের ঐশ্বর্য দেখিয়া মুগ্ধ। তাঁহার পূর্বেও যোগশাস্ত্রে দেখি, আকাশে থাকিলে কুম্ভের ভিতরে-বাহিরে শূন্য ; অর্ণবে থাকিলে কুম্ভের ভিতরে-বাহিরে পূর্ণ—

অন্তঃ শূন্যো বহিঃ শূন্যঃ শূন্যঃকুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃ পূর্ণো বহিঃ পূর্ণঃ পূর্ণঃ কুম্ভ ইবার্ণবে॥

কবীরও অন্তরিস্থিত সেই শূন্য অর্ণবের সন্ধান জানিতেন। শূন্যের মধ্যেই বিমল আশ্রয়। সেখানেই ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষের সহজ স্থান।

শূন্যকে বীচমেঁ বিমল বৈঠক জহঁা
সহজ অস্থান হৈ গৈবকেরা॥

শূন্যেই অসীম অনন্ত তত্ত্ব। শূন্যের মহত্ত্ব এই যে সহজে সে আপনাকে দিয়া অন্যকে ভরিয়া দেয়। শূন্য আকাশের ঘটের মধ্যেও শূন্য আকাশ, আবার ঘটের বাহিরেও শূন্য আকাশ। সাগরের মধ্যে ডুবিলে ঘটেও সাগর জল, ঘটের বাহিরেও সাগর জল। নিজেকে যদি শূন্যের মধ্যে ডুবাইয়া দাও তবে দেখিবে ভিতরে বাহিরে কোথাও আর অপূর্ণতা নাই। সেই শূন্যময় তখন তাঁহার আপন ঐশ্বর্যে সব দিয়াছেন পূর্ণ করিয়া।

এই শূন্যের মধ্যে ডুবিতে হইলে বাহ্য পূজা-অর্চনা নিষ্ফল, তীর্থ-ব্রত নিষ্ফল। সহজ সাধনায় তাঁহার মধ্যে যাইতে হয় ডুবিয়া। সেই সহজ সাধনার কথা কবীর অপূর্ব ভাষায় বলিয়াছেন। মালায়ও জপি না, করেও জপি না, মুখেও নাম উচ্চারণ করি না—

মালা জপূঁ না কর জপূঁ মুখসে কঁহু ন নাম।

অথচ সহজ জপ নিরন্তর চলিয়াছে। এই সহজ-জপ সহজ-সমাধিই কবীরের প্রার্থনীয়।

সাধো সহজ সমাধি ভলী—
গুরু প্রতাপ জা দিনতৈ উপজী দিন দিন অধিক চলী।
জহঁ জহঁ ডোলোঁ সোই পরিকরমা যো কুছ করোঁ সো সেরা।
জব সোরেঁা তব করোঁ দণ্ডবত পূজোঁ ঔর ন দেরা॥
কহোঁ সো নাম সুনোঁ সো সুমিরণ খাঁর্ পিরোঁ সো পূজা।
গিরহ উজাড় এক সম দেখূঁ, ভার ন রাখূঁ দূজা॥
আঁখ ন মূদোঁ কান ন রূঁধো কায়া কষ্ট নহি ধারোঁ।
খুলে নৈন পহিচানো হঁসি হঁসি সুন্দর রূপ নিহারোঁ॥

হে সাধু সেই সহজ সমাধিই ভালো। গুরু-প্রভাবে যেদিন ইহা পাইলাম সেদিন হইতে দিনে দিনে

রসের প্রেরণা

শ্রীনন্দলাল বসু

চিত্রশিল্প আমার বড় প্রিয় জিনিস ; সেইজন্য শিল্পী মাত্রকেই আমি ভালোবাসি, তাদের ছবি দেখতে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করি ও বড় আনন্দ পাই। আমি ছবির সমালোচক নই, আমিও তাঁদের মতো ছবি আঁকি মনের আনন্দ প্রকাশ করবার জন্য। সুখ ও দুঃখের সাগর মন্থন করে যে আনন্দরূপ অমৃত ওঠে তার অর্ঘ্য নিবেদন করাই শিল্পীদের কাজ।

নবীন শিল্পী-ভাইদের সাহায্য হবে বলে কয়েকটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণার কথা বলব।

সব শিল্প-সৃষ্টিই খেলার ছলে মনের খেয়াল খুসী থেকেই আরম্ভ। কিন্তু, অসংযত, অহংকারী, স্বার্থান্ধ ও সংকীর্ণ মনের আর সমদর্শী, সদানন্দ, রসে ও ছন্দে ভরপুর দরদী শিল্পীর সংযত ও উদার মনের তফাত লক্ষ্য করবার বিষয়। অর্বাচীন নবীন শিল্পী প্রকৃতি থেকে সহজ উত্তরাধিকার-সূত্রে যে নবীন অনুরাগের অধিকারী হন তা খুবই প্রাণবান ও প্রশংসনীয় ; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং পৃথিবীর দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতে ও দুনিয়ার দুনিয়াদারির সংস্রবে এসে, মনের জটিলতা কাঠিন্য ও সন্দিগ্ধতা বেড়েই চলে। সেই মনকে আবার সরল ও নবীন করে তুলতে হবে, সন্দিগ্ধ ও ভীত মনকে নির্ভীক করে তুলতে হবে, কঠিন মনকে সরস ও আনন্দের ছন্দে ছন্দোময় করে তুলতে হবে। এই হল আমাদের সাধনার পথ। দ্রষ্টা দরদী ও রসিক শিল্পীর প্রতি, তাঁদের সৃষ্টির প্রতি, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রাখতে হবে। গুণী ও নামজাদা শিল্পীদের সৃষ্ট শিল্পের সঙ্গে নিজের শিল্পসৃষ্টির তুলনা করে এগোতে হবে। কেবল তাঁদের বাহ্যিক অনুকরণ করা নয়। চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে তাঁদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রেখে, তাঁদের ভাবে ভাবুক, গুণে গুণী ও মহান্ হতে হবে।

শিল্প-সৃষ্টির মূলমন্ত্র ও টেক্‌নিক্-শিক্ষার গুহ্য কথা হল প্রকৃতির রূপ ও গুণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ও অহৈতুক আকর্ষণ ও তার সহিত একাত্মবোধ। এ হলে সৃষ্টি করা ও টেক্‌নিক্ শিক্ষার কাজ অতি সহজ হয়ে যায়। কখন ঠিক শিল্প-সৃষ্টি হয় জানতেও পারা যাবে না। পক্ষান্তরে, কেবল দম্ভ ক'রে, বড় শিল্পী হবার লোভ রেখে, প্রচুর পরিশ্রম করেও সব শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে। শেষে ভগ্নমনোরথ হতে হবে। শিল্পীসমাজে নামও হবে না ; উপরন্তু ঠিক রসের অনুভূতি না পেয়ে অন্তর কঠিন হয়ে যাবে ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। একূল ওকূল দু কূল যাবে। শুধু ফাঁকি দিয়ে, লোকের চোখে ধুলো দিয়ে, নাম কুড়োনোতে কী দীনতা— তা ভেবে দেখবার জিনিস।

স্বাধীনতা ও মৌলিকতা অর্জন করতে হলে অহংকেন্দ্রিক চঞ্চল মনের অনিচ্ছাকৃত দাসত্ব থেকে আমাদের ক্রমশ মুক্তি পেতে হবে। টেক্‌নিকের মাস্টার হতে হবে। তদুপরি আবেগ প্রীতি ও ভাবের দোলা চাই, সেই তো আমাদের সৃষ্টির মূল আধার। ভাবাবেগকে চালনা করার উপযোগী মমত্বশূন্য শক্তি ও টেকনিকের সাহায্যে সৃষ্টি করার নিরহংকার কৌশল, আয়ত্ত করে নিতে হবে। আবেগকে ও টেক্‌নিক্‌কে চালনা করবার কর্তা শিল্পী ; আবেগ বা টেক্‌নিক্ শিল্পীকে চালনা করলে কাজ পণ্ড হবে।

উভা সারং, বৈঠ বিচারং, সংভারং জাগত সূতা।
তিন লোক ততজাল বিডারণ, তহাঁ জহিগা পূতা? দাদু, মায়া অংগ, ৩৬

বাংলায় যোগী-বাউলদের মতে বাণী পাই—

উঠ্যা সারন বৈঠ্যা সারন, সারন জাগত সূতা।
তিন ভুবনে বিছাইন্যা জাল, কই যাবিরে পূতা॥

গোরখপন্থীদের মধ্যেও মায়ার বাণী আছে—

উভা মারূঁ বৈঠা মারূঁ মারূঁ জাগত সূতা।
তীন ভবন ভগ জাল পসারূঁ কহাঁ জায়গা পূতা॥

বাংলায় যোগীদের পদে দেখি—

উঠ্যা মারুম বৈঠ্যা মারুম মারুম জাগা সূতা।
তিন ধামে কাম জাল বিছাইমু— কই যাবিরে পূতা?[1]

গোরখ বাক্যও আছে—

উভা খংড়ূঁ, বৈঠা খংড়ূঁ, খংড়ূ, জাগত সূতা
তীন ভবন তে ভিন হ্বৈ খেলূঁ তৌ গোরখ অবধূতা॥

ইহার সঙ্গে তুলনীয় বাংলার যোগীর পদ—

উঠা খণ্ডুম বৈঠা খণ্ডুম খণ্ডুম জাগত সূতা।
তিন ভুবনে খেলুম আলগ তয় তো অবধূতা॥[2]

কায়াযোগই বাউলদের পরম তত্ত্ব। কবীরের মত দাদূর মধ্যেও কায়াতত্ত্বই সার। দাদূর কায়াবলী হইতে কিছু অংশ দেওয়া যাউক—

কায়া মাঁহে সিরজনহার।
কায়া মাঁহে ওঁ কার॥
কায়া মাঁহে হৈ আকাশ।
কায়া মাঁহে ধরতী পাস॥
কায়া মাঁহে পবন প্রকাশ।
কায়া মাঁহে নীর নিরাস॥
কায়া মাঁহে সসিহর সূর।
কায়া মাঁহে বাজৈ তূর॥
কায়া মাঁহে তীনূঁ দেব।
কায়া মাঁহে অলখ অভের॥
কায়া মাঁহে চারূঁ বেদ।
কায়া মাঁহে পায়া ভেদ॥
কায়া মাঁহে জামৈঁ মরৈঁ।
কায়া মাঁহে চৌরাসী ফিরৈ॥

কায়া মাঁহে লে অবতার।
কায়া মাঁহে বারংবার॥
কায়া মাঁহে খেল পসারা।
কায়া মাঁহে প্রাণ অধারা॥
কায়া মাঁহে সব ব্রহ্মংড।
কায়া মাঁহে হৈ নর খংড॥
কায়া মাঁহে সাগর সাত।
কায়া মাঁহে অবিগত নাথ॥
কায়া মাঁহে নদিয়া নীর।
কায়া মাঁহে গহির গংভীর॥
কায়া মাঁহে গংগ তরংগ।
কায়া মাঁহে জমনা সংগ॥
কায়া মাঁহে পূজা পাতী।
কায়া মাঁহে তীরথ জাতী॥

---

[1] তিন ধামে ভগজাল বিছাইমু— পাঠও আছে।

[2] মৎ প্রণীত দাদূ, পৃ ৩৯

কায়া মাঁহে বস্তু অপার।
কায়া মাঁহে ভরে ভংডার ॥
কায়া মাঁহে নৌনিধি হোই।
কায়া মাঁহে অঠসিধি সোই ॥
কায়া মাঁহে রতন অমোল।
কায়া মাঁহে মোল ন তোল ॥
কায়া মাঁহে বহু বিস্তার।
কায়া মাঁহে অনংত অপার ॥
কায়া মাঁহে খেলৈ প্রাণ।
কায়া মাঁহে পদ নিররাণ ॥
কায়া মাঁহে অনভৈ সার।
কায়া মাঁহে করৈ বিচার ॥
কায়া মাঁহে কলা অনেক।
কায়া মাঁহে করতা এক ॥

কায়া মাঁহে তারণহার।
কায়া মাঁহে উতরে পার ॥
কায়া মাঁহে হৈ দীদার।
কায়া মাঁহে দেখনহার ॥
কায়া মাঁহে দেখ্যা নূর।
কায়া মাঁহে রহ্যা ভরপুর ॥

কায়া মাঁহে জ্যোতি অনংত।
কায়া মাঁহে সদা বসংত ॥
কায়া মাঁহে মংগলচার।
কায়া মাঁহে জয়জয়কার ॥
কায়া মাহি কর্ত্তার হৈ সো নিধি জানৈ নাঁহি।
দাদু গুরুমুখি পাইয়ে সব কছু কায়া মাহি ॥

বাণীগুলি এত সরল যে অনুবাদের প্রয়োজন নাই। তবু দুই-এক জায়গায় অসুবিধা লাগিতে পারে। তাই একটা অনুবাদ দেওয়া গেল—

কায়ার মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা।
কায়ার মধ্যেই ওঁকার ॥
কায়ার মধ্যেই আকাশ।
কায়ার মধ্যেই ধরণী আবাস ॥
কায়ার মধ্যেই পবন প্রকাশ।
কায়ার মধ্যেই নীর নিবাস ॥
কায়ার মধ্যেই চন্দ্র সূর্য।
কায়ার মধ্যেই বাজিতেছে তূর ॥
কায়ার মধ্যেই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
কায়ার মধ্যেই অলখ ইন্দ্রিয়াতীত ॥
কায়ার মধ্যেই চারিবেদ।
কায়ার মধ্যেই পাই সন্ধান ॥
কায়ার মধ্যেই জন্মে মরে।
কায়ার মধ্যেই চৌরাশি যোনি ভ্রমণ করে ॥
কায়ার মধ্যেই লয় অবতার।
কায়ার মধ্যেই বার মাস এই লীলা ॥
কায়ার মধ্যেই চলিয়াছে খেলা।
কায়ার মধ্যেই প্রাণ আধার ॥
কায়ার মধ্যেই সকল ব্রহ্মাণ্ড।
কায়ার মধ্যেই অখণ্ড বসুন্ধরা ॥

কায়ার মধ্যেই সপ্ত সাগর।
কায়ার মধ্যেই সর্বাতীত নাথ ॥
কায়ার মধ্যেই নদীর নীর।
কায়ার মধ্যেই সাগর গভীর-গম্ভীর ॥
কায়ার মধ্যেই গঙ্গা তরঙ্গ।
কায়ার মধ্যেই যমুনা সঙ্গ ॥
কায়ার মধ্যেই পূজা পাতি।
কায়ার মধ্যেই তীর্থ জাতি ॥
কায়ার মধ্যেই অপার বস্তু।
কায়ার মধ্যেই পরিপূর্ণ ভাণ্ডার ॥
কায়ার মধ্যেই নব নিধি বিরাজমান।
কায়ার মধ্যেই অষ্ট সিদ্ধি ॥
কায়ার মধ্যেই অমূল্য রতন।
কায়ার মধ্যেই অমূল্য ও অতুল বস্তু ॥
কায়ার মধ্যেই বৈচিত্র্য বিস্তার।
কায়ার মধ্যেই অনংত অপার ॥
কায়ার মধ্যেই খেলে প্রাণ।
কায়ার মধ্যেই পদ নির্বাণ ॥
কায়ার মধ্যেই অনুভবসার।
কায়ার মধ্যেই করে বিচার ॥

কায়ার মধ্যেই কলা অনেক।
কায়ার মধ্যেই কর্তা এক॥
কায়ার মধ্যেই তারণকর্তা।
কায়ার মধ্যেই পারগামী, যে যায় হইয়া পার॥
কায়ার মধ্যেই সেই লীলা দর্শন।
কায়ার মধ্যেই দেখনেওয়ালা॥

কায়ার মধ্যেই দেখিলাম সেই জ্যোতি।
কায়ার মধ্যেই রহিলাম ভরপুর হইয়া॥
কায়ার মধ্যেই জ্যোতি অনন্ত।
কায়ার মধ্যেই সদা বসন্ত॥
কায়ার মধ্যেই মঙ্গলাচার।
কায়ার মধ্যেই জয়জয়কার॥

কায়ার মাঝেই রহিয়াছেন কর্তা। কেহ চিনিল না সেই রত্নকে। সদ্‌গুরুর কৃপায় সব কিছু পাইয়াছেন দাদূ কায়ারই মধ্যে।

দেহ হইল দেবমন্দির। কাজেই তাহা পবিত্র (divine)। মনের অপরাধে দেহকে বৃথা দুঃখ দেওয়া অনুচিত। দাদূ তাই বলেন—

কসি কসি কায়া তপব্রত করি করি,
ভর্মত ভর্মত হম ভুলে পরে।
কহুঁ সীতল কহুঁ তপতি দহে তন;
কহুঁ কহুঁ যে করবত সীস ধরে॥
কহুঁ বন তীরথ ফিরি ফিরি থাকে
কহুঁ গিরিপর্বত জাই চঢ়ে॥

কহুঁ সিখর চঢ়ি পড়ে ধরণীপর
কহুঁ হতি আপা প্রাণ হরে॥
অংধ ভরে হম নিকটি ন সুঝে
তাথেঁ তুম্হ তজি জাই জরে॥
হা হা হরি অব দীন লীন করি
দাদূ বহু অপরাধ ভরে॥ রাগ গুজরী

'হায় হায়, তপস্যা ও ব্রতাচরণ করিতে কায়াকে ক্রমাগতই করি কর্ষণ (পীড়ন)। ভ্রমিতে ভ্রমিতে পড়িয়াছি বিষম ভুলে। কোথাও মরিয়াছি ঠাণ্ডায়, কোথাও তাপে মরিয়াছি পুড়িয়া। কোথাও কোথাও আমি করাতে আপন দেহ করিয়াছি দ্বিখণ্ড। কোথাও আমি বনে তীর্থে ঘুরিয়া ক্লান্ত, কোথাও গিরিপর্বত চড়িয়া শ্রান্ত। কখনও গিরিশিখর হইতে ঝাঁপ দিয়া করিয়াছি আত্মহত্যা। নিকটে তুমি (আমার অন্তরের মধ্যে) তাহা না দেখিয়া অন্ধ আমি তোমাকে ছাড়িয়া পুড়িয়া মরিয়াছি। দাদূর বহু অপরাধ, আমাকে ক্ষমা করিয়া তোমার মধ্যে দীনলীন কর।'

অপরের কৃত দেহকর্ষণ-পাপ দাদূ আত্মকৃতই মনে করেন। কারণ, সবার সঙ্গে তো তিনিও একাত্ম। তাই সবার পাপে তাঁরও অপরাধ। অন্ধতা তো সর্বত্রই সমান।

এইসব দেহকর্ষণ ছাড়িয়া সহজ সরল কর্মই দাদূর বাঞ্ছিত। এই সহজ পথই বাউলদেরও কাম্য—

আপা মিটৈ হরি ভজৈ তন মন তজৈ বিকার।
নিরবৈরী সব জীবসোঁ দাদূ যহু মত সার॥

অহমিকা মিটাইয়া হরি ভজন, তনুমনের বিকার ত্যাগ, সর্বজীবে মৈত্রী, হে দাদূ, ইহাই সার সত্য, আর যত সব মিথ্যা ছাড়াইয়া একদিন সত্যের জয় হইবেই—

ভাবৈ তহাঁ ছিপাইয়ে সাঁচ ন ছানা হোই।
সেস রসাতলি গগন ধূ প্রগট বাহিরে সোই॥

তাই যেখানেই লুকাও, সত্যকে লুকানো অসম্ভব। রসাতলের শেষনাগ হইতে গগনের ধ্রুবতারা তাহা প্রকাশিত করিয়া দিবে। এই সত্য তো সর্বজনীন, তাই আমার পরিচয়ও সার্বভৌম।

জাতি হমারী জগতগুরু পরমেসর পরিবার।

জগৎগুরু আমার জাতি, পরমেশ্বর আমার পরিবার। ছোট কোনো সংকীর্ণ পরিবার আমার নাই।

পূরণ ব্রহ্ম বিচারিয়ে সকল আত্মা এক।
কায়াকে গুণ দেখিয়ে নানা বরণ অনেক॥

কারণ সেই পূর্ণ ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিচার করিয়া সবাই এক। কায়ার দিক দিয়া দেখিলে নানা বরণ ও অনৈক্যের আর শেষ নাই।

সকল চরাচরের সঙ্গে এক হইয়া বিশ্বের সব সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া যখন সাধনা করিব, তখন আমার সারা জীবনই হইয়া উঠিবে এক অখণ্ড পূজা। তখন সংসার ও ধর্ম এক হইয়া যাইবে। পূজা ও জীবনযাত্রার মধ্যে আর বিচ্ছেদ থাকিবে না। বাউলদের ইহাই কাম্য লক্ষ্য। তাহাই আসলে বাউলধর্ম। দুধ যতক্ষণ ভালো থাকে তখন সবই থাকে মিলিয়া, নষ্ট হইলেই ছানা ও জল আলাদা হইয়া যায়। পূজা ও জীবনযাত্রা আলাদা হইলে বুঝিব সাধনা নষ্ট হইয়াছে।

দাদূও বলেন—

নখসিখ সব সুমিরণ করৈ ঐসা করিয়ে জাপ।
অংতরি বিগসে আত্‌মা তব দাদূ প্রগটে আপ॥ পৃ ৮৭

বিনা আয়াসে সর্বক্ষণ পায়ের নখ হইতে মাথার শিখা পর্যন্ত সব শরীর আমার জপ করিতে পারে এমন জপ কর। হে দাদূ, তবেই অন্তরে আত্মা হইবে বিকসিত, তিনি আপনি হইবেন আমার সর্বজীবনে প্রকটিত—

নর-নারায়ণ সকল শিরোমণি জনম অমোলিক আহি রে।

এই নর-নারায়ণ দেহ, ইহা একদিকে আত্মস্বরূপ আর এক দিকে দেব-স্বরূপ (divine); এই জীবন সকল শিরোমণি, সেই অমর সাধনা না পাইয়া এই অমূল্য জনম কি বৃথাই যাইবে? দাদূ বলেন—

জবথৈঁ হম নির্পখ ভয়ে সবৈ রিসানে লোক।
সতগুরুকে পরসাদ থৈ মেরে হরখ ন শোক॥ পৃ ২৪০

যেদিন হইতে আমি বিশ্বসত্যের পরিচয় পাইয়া সম্প্রদায়-বুদ্ধি ছাড়িলাম, সেদিন হইতে সবাই আমার উপর হইলেন রুষ্ট। কিন্তু সদ্‌গুরুপ্রসাদে আমার তখন না হইল হর্ষ না হইল শোক।

মৈঁ পংথি এক অপারকে মনি ওর ন ভাবৈ। পৃ ৪৪১

আমি এক অপারের মুক্তপথে চলিয়াছি, আমার মনে আর কিছুই লাগে না ভালো।

খংড খংড করি ব্রহ্মকো পখি পখি লীয়া বাঁটি।
দাদূ পূরণ ব্রহ্ম তজি বঁধে ভরমকী গাঁঠি॥ পৃ ১৯২

ব্রহ্মকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে লইয়াছে ভাগ ভাগ করিয়া। হে দাদূ, পূরণ ব্রহ্ম ত্যজিয়া বদ্ধ হইল সবাই ভ্রমের গাঁঠে।

হিংদূ তুরুক ন হোইবা সাহিব সেতী কাম। পৃ ২৩৮

না হইবে হিন্দু না হইবে মুসলমান, স্বামীর সঙ্গেই তোমার কাজ।

সন্তদের সঙ্গে বাউল ভাবের মিলের বিষয়ে লিখিতে গেলে শেষ নাই। শূন্য সম্বন্ধে দাদূরও কিছু বাণী উদ্ধৃত করি, তাহাতেই শূন্যের পূর্ণতা বুঝা যাইবে—

সহজেঁ আপ লখাইয়া শূন্য মংডল মেঁ জাঁই। পরচা, ১০

শূন্যমণ্ডলে গিয়া সহজেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা গেল। তিনি আপনাকে সেখানে সহজে ধরা দিলেন।

এক সবদ জন উধয়ৈ শুনি সহজি জাগৈঁ।

একই শব্দ শুনিয়াই সব বন্ধন হইতেছে মুক্ত, শূন্যে সহজে জাগিয়া উঠিতেছে প্রাণ।

ব্রহ্ম সুঁনি নিজ ধাম। সুমিরণ অংগ, পৃ ৬২৩

ব্রহ্মশূন্যই এই আত্মার সহজ ধাম।

শূন্য মংডল মাঁহি সাঁচা নৈন ভরি সো দেখিয়ে। ঐ পৃ ৬২৪

সত্যস্বরূপ বিরাজিত শূন্যমণ্ডলের মধ্যে, নয়ন ভরিয়া লও দেখিয়া।

শূন্য সরোবর জহঁ, দাদূ হংসা রহে তহঁ, বিলসি বিলসি নিজ সার॥ ঐ পৃ ৬২৫

যেখানে সেই শূন্যের (মানস) সরোবর, দাদূ বলেন, সেখানেই হংসের বাস। বিলসি বিলসি সেখানে রসসম্ভোগ।

ইহার পরে আর কিছু দেখাইবার প্রয়োজন নাই। সত্য ধর্ম চলিবে অনন্তশূন্যে নিরন্তর সহজে। সেই অনন্ত শূন্য মানুষেরই অন্তরে। কাজেই মানুষের চেয়ে মহত্তর আর কিছু নাই। ইহাই বাউল ধর্মের সত্যতম কথা।

স্বরলিপি

নট। চৌতাল

কথা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন জানে মনোমোহন আইল স্বরলিপি : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

II সা । সা সা । রাঃ -মঃ I
ম ন জা নে ০

I মা -া । মা পা । পা পা । মা -গা । রা গা । -া গা I
ম ০ নো মো হ ন আ ০ ই ল ০ ম

I [র]গা -রা । -া সা । -া সা । মমা রা । -া সা । -া সা I
ন ০ ০ জা ০ নে স ০ খি ০ তা ০ ই

I সা সা । -ধ্া সা । -া সা । সা -া । রা গা । -া -পঃ I
কে ম ০ ন ০ ক রে ০ আ জি ০ ০

I মা মা । রা মগা । -মা রা । -া II
আ মা র প্রা০ ০ ণে ০

II পা -া । পা র্সা । -া র্সা । র্সা -া । র্সা -া । র্সা -া I
তা ০ রি সৌ ০ র ভ ০ ব ০ হি ০

I র্সা -া । ধা [ন]ধা । র্সা -া । র্রা -র্সা । র্সা র্সা । -ধা পা I
ব ০ হি ল কি ০ স ০ মী র ০ ণ

I পা -া । পা ধা । -া র্সা । র্সা -ধা । -া ধা । -পা -া I
আ ০ মা রি ০ প রা ০ ০ ন ০ ০

I মা -া । -মা -গা । -া রা । -সা II II
পা ০ ০ ০ ০ নে ০

তেজস্ক্রিয়তা, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

১

স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা

তখন সবে মাত্র এক্স-রশ্মি বেরিয়েছে। দেখা গেছে এই রশ্মি ফটোগ্রাফি কাচকে কালো করে। আর এক্স-রশ্মির সৃষ্টি করতে হয় এই রকম করে। প্রায় বায়ুশূন্য একটি গোলকের মধ্যে একটি শক্তিশালী আবেশকুণ্ডলী থেকে তড়িৎমোক্ষণ পাঠানো হল, ইলেকট্রনরা একটা ধাতব পদার্থে ধাক্কা দিল, এক্স-রশ্মি জন্মাল। অধ্যাপক বেকারেল অন্য উপায়ে এক্স-রশ্মি পাওয়া যায় কি না অনুসন্ধান করতে থাকলেন।

ইউরেনিয়মের অভিনব ধর্ম

বেকারেল দেখলেন যে কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফি কাচের উপর যদি ইউরেনিয়ম নাইট্রেট রাখা যায় তবে ফটোগ্রাফি কাচ আক্রান্ত হয়, এক্স-রশ্মির জন্যে যেমন হয়ে থাকে। বেকারেল ভাবলেন, তবে তো ইউরেনিয়ম নাইট্রেট থেকে এক্স-রশ্মি বেরচ্ছে। বেকারেল অবশ্য পরে বুঝলেন যে ইউরেনিয়ম থেকে যা বেরচ্ছে তা মোটেই এক্স-রশ্মি নয়, এক্স-রশ্মির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, তা এক নতুন রকমের তেজ নতুন রকমের শক্তি, ইউরেনিয়ম থেকে তা আপনা-আপনি বেরচ্ছে, তবে ফটোগ্রাফি কাচের উপর তার ক্রিয়া এক্স-রশ্মির ক্রিয়ারই মতো। বিজ্ঞানের ইতিহাসে বোধ হয় আর কোনো দৃষ্টান্ত নেই যেখানে ভুল যুক্তির উপর নির্ভর করে এমন এক আবিষ্কার হল যা এক নতুন যুগ এনে দিল।

বেকারেল দেখলেন যে, ইউরেনিয়ম থেকে যে রশ্মি বেরচ্ছে তার এক ধর্ম হল ওই রশ্মি কাছের বায়ুকে তড়িৎপরিবাহক করে তোলে। একটা তড়িৎনির্দেশক যন্ত্র তড়িৎযুক্ত করা হল, যন্ত্রে সোনার পাতার দুটি ডগা দূরে চলে গেল, এইবার ওই যন্ত্রের কাছে ইউরেনিয়ম এনে বেকারেল দেখলেন যে, পাতা দুটি ধীরে ধীরে মুড়ে আসছে।

রেডিয়ম আবিষ্কার

কুরীদম্পতি বেকারেলের এই গবেষণায় আকৃষ্ট হলেন, আর ইউরেনিয়ম ছাড়া আর কোনো পদার্থ থেকে ওই রকম তেজ বেরয় কি না সে সম্বন্ধে ম্যাডাম কুরী অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন।

ইউরেনিয়ম পাওয়া যাচ্ছিল পিচব্লেণ্ড নামে এক খনিজ পদার্থ থেকে। ম্যাডাম কুরী লক্ষ্য করলেন যে, পিচব্লেণ্ড থেকে ইউরেনিয়ম বার করে নেবার পর যা বাকি থাকে, আর এতদিন যাকে অকেজো বলে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, ইউরেনিয়মের চেয়ে তার তেজ অনেক বেশি। এই সময় অধ্যাপক কুরী এই কাজে যোগ দিলেন। তাঁরা বললেন যে, পিচব্লেণ্ডে এমন এক অনাবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থ আছে যা ইউরেনিয়মের চেয়েও বেশি তেজস্কর। এই নতুন পদার্থকে পৃথক করতে তাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি

নিয়োজিত করলেন। কিন্তু এর জন্যে বহু পরিমাণ পিচব্লেণ্ড চাই, তা কেনবার পয়সা তাঁদের নেই। অস্ট্রিয়া গভর্মেণ্ট দয়াপরবশ হয়ে বোহিমিয়ার এক খনি থেকে তোলা এক টন পিচব্লেণ্ড কুরীদম্পতিকে পাঠিয়ে দিলেন। এখন তাঁরা এক কঠোর সাধনায় ব্যাপৃত রইলেন, কি করে ওই শক্ত পদার্থ থেকে তাঁদের কল্পিত ওই নতুন পদার্থটিকে বের করা যেতে পারে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে লাগল। প্রথম তাঁরা এক নতুন পদার্থ পেলেন যা ইউরেনিয়মের চেয়ে বেশি তেজস্কর। ম্যাডাম কুরীর জন্মভূমি হল পোলাণ্ড। দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি ওই পদার্থের নাম দিলেন পলোনিয়ম।

কিন্তু পলোনিয়ম বের করে নেবার পরও দেখা গেল যে, আগের তেজ প্রায় সমানই রইল। তাহলে নিশ্চয় পলোনিয়ম ছাড়া অন্য তেজস্কর পদার্থ ওর মধ্যে আছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কয়েক বছর ধরে সমান ভাবে পরীক্ষাগারে কাজ চলতে লাগল, অদম্য উৎসাহে কুরীদম্পতি তাঁদের সাধনায় মগ্ন রইলেন। শেষে 1902 সালে তাঁরা রেডিয়ম বার করলেন, বিশুদ্ধ অবস্থায় নয়, রেডিয়ম ক্লোরাইড রূপে। দেখা গেল, এই বস্তু সমপরিমাণ ইউরেনিয়মের প্রায় লক্ষগুণ বেশি তেজস্কর। যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে রেডিয়ম মিলল তা কি রকম শ্রমসাধ্য আর সময়সাপেক্ষ তা এই কথা থেকে বোঝা যাবে যে কুরীরা বারো বছর পরিশ্রমের পর একটন পিচব্লেণ্ড থেকে এক গ্র্যামের আটভাগের একভাগ মাত্র রেডিয়ম ক্লোরাইড পেলেন, তাও অবিশুদ্ধ অবস্থায়। কিন্তু যা পাওয়া গেল তা যে এক নতুন পদার্থ সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রইল না, বর্ণালিতে এক নতুন রেখা দেখা দিল। পিচব্লেণ্ড থেকে রেডিয়ম পাওয়া গেল এটা ঠিক, কিন্তু পিচব্লেণ্ডে রেডিয়মের পরিমাণ কতটুকু সে সম্বন্ধে জে. জে. টমসন এক হিসেব দিয়েছেন। তিনি দেখালেন যে, খানিকটা সমুদ্রের জলে যতটা সোনা আছে, সমপরিমাণ পিচব্লেণ্ডে রেডিয়মের পরিমাণ তার চেয়েও কম।

1903 সালে ম্যাডাম কুরী এক বক্তৃতায় তাঁদের আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন। পৃথিবীময় একটা সাড়া পড়ে গেল। কয়েক মাস পরে সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে তাঁরা লণ্ডনে নিমন্ত্রিত হলেন, গ্রেটব্রিটেনের সমস্ত বিজ্ঞানী এই রেডিয়ম দেখতে, তার গুণাবলী জানতে সমবেত হলেন। অধ্যাপক কুরী পরীক্ষায় দেখালেন যে, রেডিয়ম থেকে তাপ স্বতই বেরচ্ছে ; দেখালেন যে, কাছে যদি জিঙ্ক সলফাইডের গুঁড়ো ধরা যায় তবে তা সব সময় ঝিকমিক করতে থাকে। এই বছরের শেষে বেকারেলের সঙ্গে কুরীদম্পতিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। এই প্রথম একজন মহিলা নোবেল পুরস্কার পেলেন। ফরাসি দেশ ছুটি নতুন পদের সৃষ্টি করে কুরীদম্পতিকে বসালেন। জীবনে এই প্রথম তাঁরা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে লাগলেন। কিন্তু এ সুখ শান্তি বেশি দিন টিকল না। কুরীদম্পতি যখন তাঁদের খ্যাতির শীর্ষস্থানে তখন একদিন রাস্তায় চলবার সময় অধ্যাপক কুরী একখানা গাড়ি চাপা পড়লেন, মুহূর্ত মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটল। শুধু কুরীর আবাসে নয়, সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে শোকের একটা ঘনছায়া পড়ল।

বিশ্ববিদ্যালয় পিরি কুরীর স্থলে ম্যাডাম কুরীকে অধ্যাপিকা নিযুক্ত করলেন। ম্যাডাম কুরী এখন একলা তাঁর গবেষণায় নিযুক্তা রইলেন। শেষে 1911 সালে তিনি বিশুদ্ধ পলোনিয়ম ও রেডিয়ম বার করলেন। এই কাজের জন্যে আবার তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল, এবার রসায়ন বিভাগ থেকে। এর আগে বা এর পরে কোনো পুরুষ বা নারী দুবার নোবেল পুরস্কার পান নি।

রেডিয়মের প্রকৃতি

নানা পরীক্ষা থেকে জানা গেল যে রেডিয়ম থেকে আপনা-আপনি যে রশ্মি বেরয় তা এক রকমের নয়, তা তিন প্রকার বিভিন্ন রশ্মির মিশ্রণ। দেখা গেল, আল্‌ফা-রশ্মি হল ইলেকট্রন-বর্জিত হিলিয়ম অ্যাটম, পজিটিভ তড়িৎযুক্ত। বিটা-রশ্মি হুবহু একটি ইলেকট্রন, আর গামা-রশ্মি হল ঈথর-তরঙ্গ— তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক্‌স-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়েও ছোট। রশ্মি বলতে যদি ঈথর-তরঙ্গ বোঝায় তবে প্রকৃত পক্ষে এই গামা-রশ্মিকে রশ্মি বলা যায়, আল্‌ফা-রশ্মি বিটা-রশ্মি তো পদার্থ-কণিকা। তবে শেষ অবধি আমরা জেনেছি পদার্থ ই বা কি আর তরঙ্গই বা কি, সবই এক।

আল্‌ফা-রশ্মি বেরচ্ছে সেকেণ্ডে প্রায় দশ হাজার মাইল বেগে ; বিটা-রশ্মির বেগ আরও প্রচণ্ড, সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার মাইল অবধি হয়। কিন্তু পদার্থকে ভেদ করে যাবার শক্তি গামা-রশ্মির সব চেয়ে বেশি। এদের সকলেরই ফটোগ্রাফি কাচের উপর ক্রিয়া আছে, এরা নিকটবর্তী একটা তড়িৎযুক্ত পদার্থকে তড়িৎশূন্য করে ফেলে। একটা জিঙ্ক সলফাইড পর্দার সামনে যদি এক কণা রেডিয়ম ধরা যায় আর পর্দাটা যদি একখানা লেন্স দিয়ে ফোকস করা যায় তবে দেখা যাবে সেখানে যেন অসংখ্য ফুলঝুরি কাটছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই, এই তেজস্ক্রিয় রেডিয়ম থেকে এক গ্যাস বেরয় যা আবার তেজস্ক্রিয়। অ্যাটমের বিনাশ নেই তার কোনো পরিবর্তন নেই, রেডিয়ম-অ্যাটমের বেলায় সে কথা তো আর বলা চলল না, কারণ রেডিয়ম-অ্যাটম আপনা আপনি ভেঙে অন্য এক অ্যাটমে পরিবর্তিত হচ্ছে, তারও আবার অন্য অ্যাটমে পরিবর্তন হল, এই রকম কয়েক ধাপ চলল। শেষ অবধি দাঁড়াল শিশাতে, এখানে তেজস্ক্রিয়তার অবসান।

আগে বলা হয়েছিল যে, রেডিয়ম থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে বিকিরণ বেরচ্ছে, এর আর কমতি নেই। কথাটা কিন্তু একেবারে ঠিক নয়। হিসেবে দেখা গেল প্রায় ১৭০০ বছরে এর শক্তি অর্ধেকে দাঁড়াবে। এখন কথা উঠল, পৃথিবীর সৃষ্টি তো অনেক কোটি বছর আগে হয়েছে, তা হলে এতদিনে তো পৃথিবীর সমস্ত রেডিয়মের শেষ হবার কথা। অবশ্য এ হতে পারে যে রেডিয়ম স্বয়ম্ভু নয়, আর কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে এর উৎপত্তি হচ্ছে আর তার পরিবর্তনের হার আরও মন্থর। সেই রকমই দেখা গেল। দেখা গেল যে যে-খনিজ পদার্থে ইউরেনিয়ম আছে সেইখানেই রেডিয়ম আছে, আর দুইএর অনুপাত একেবারেই ঠিক। আরও দেখা গেল ইউরেনিয়মের দ্রবণ থেকে রেডিয়ম সম্পূর্ণরূপে বের করে নেবার পরও তাতে রেডিয়ম জন্মাচ্ছে। সুতরাং রেডিয়ম হল ইউরেনিয়মের বংশধর, ঠিক ছেলে নয়, কয়েক পুরুষ নীচে। ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম হল দুই মূল তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ, প্রত্যেকেই অনেক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে গিয়ে শিশাতে পৌঁছচ্ছে। এদের মধ্যের কারও আধা-বয়স কয়েক কোটি, আবার কারও জীবন এক সেকেণ্ডেরও কম।

রেডিয়ম থেকে নিয়তই শক্তি বেরচ্ছে। শক্তিধর এই রেডিয়ম কোথা থেকে তার শক্তি পাচ্ছে। বাইরে থেকে নিশ্চয় নয়। কারণ দেখা গেল ওই রেডিয়মকে রোদ্দুরে রাখ বা অন্ধকার ঘরে রাখ, বায়ুশূন্য স্থানে নিয়ে যাও বা তার উপর অত্যধিক চাপ দাও, খুব গরম কর বা অত্যধিক ঠাণ্ডা কর, বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখ বা আর-কিছুর সঙ্গে রাসায়নিক মিলন ঘটাও, একই হারে এর থেকে তেজ বেরচ্ছে। কিন্তু বাইরে থেকে যদি তেজ না পায় তবে কোথা থেকে এর তেজ আসছে ?

এক কণা রেডিয়ম নেওয়া হল। এর মধ্যে তো লক্ষ লক্ষ অ্যাটম রয়েছে। কয়েকটি অ্যাটম ফাটল, ফাটার ফলে খানিকটা তেজ বেরিয়ে পড়ল। ঠিক কোন্ কোন্ অ্যাটম কখন ফাটবে কেউ বলতে পারে না, তবে গড়ে এক রকম হারে ফাটবে। ঠিক যেমন একটা শহরে এক বছর কত লোক মরবে আগের হিসেব থেকে অনেকটা বলা যায়, কিন্তু সে বছর রাম মরবে কি যদু মরবে ঠিক বলা যায় না। ইউরেনিয়মের অ্যাটম রেডিয়মের অ্যাটম নির্দিষ্ট হারে ফাটে, লোহার অ্যাটম সোনার অ্যাটম ফাটে না। যে তেজস্ক্রিয় সে বরাবরই তেজস্ক্রিয়, আর যে নিষ্ক্রিয় সে চিরদিনই নিষ্ক্রিয়। কিন্তু শেষের কথাটা এখন আর বলা চলছে না, কারণ দেখা যাচ্ছে নিষ্ক্রিয়কে বাইরের আঘাতে তেজস্ক্রিয় করা যাচ্ছে, চাবুকের চোটে গাধা ঘোড়া বনে যাচ্ছে, তবে অবশ্য অল্প সময়ের জন্যে। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন পিরি কুরী ও ম্যাডাম কুরী, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি করলেন তাঁদের জামাতা ও কন্যা। 1911 সালে ম্যাডাম কুরী যখন সুইডেনে নোবেল পুরস্কার নিতে যান তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে, সঙ্গে তাঁর কন্যা ইরিন। যে সভায় ওই পুরস্কার দেওয়া হল বালিকা সেই সভায় উপস্থিত ছিল। চব্বিশ বছর পরে ওই বালিকা ওইখানে আবার উপস্থিত হয়ে এবার নিজে পুরস্কার নিল, সঙ্গে তাঁর স্বামীও পুরস্কার পেলেন। স্বামী ও স্ত্রী, তাঁদের কন্যা ও জামাতা চারজনের নোবেল পুরস্কার পাওয়া নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যাপার।

২

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা

পদার্থের উপাদান

আগেই ইলেকট্রন বেরিয়েছিল। এ নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত আর এর ভর একটি হাইড্রোজেন অ্যাটমের ভরের প্রায় 1850 ভাগের এক ভাগ। জানা গেল এই ইলেকট্রন প্রতি অ্যাটমেরই উপাদান, অথচ গোটা অ্যাটমটি তড়িৎশূন্য। এখন এর জুড়িদার পজিটিভ অংশের খোঁজ চলল। প্রচণ্ড বেগের ক্ষুদ্র আল্‌ফা-কণিকা পাঠিয়ে রাদারফোর্ড তার সন্ধান পেলেন, তার নাম দেওয়া হল প্রোটন। এর পজিটিভ তড়িৎ ইলেকট্রনের নেগেটিভ তড়িতের সমান, তবে ইলেকট্রনের তুলনায় এ অনেক বেশি ভারি। এখন মনে করা হল ইলেকট্রন প্রোটন দিয়ে প্রতি অ্যাটম গঠিত।

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এ ধারণার পরিবর্তন করতে হল। বেরল নিউট্রন। এও একটা মূল বস্তু, এর ভর একটা প্রোটন বা একটা হাইড্রোজেন অ্যাটমের প্রায় সমান, তবে এ তড়িৎশূন্য। এই সময় আর-একটা মূল বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল, সে ক্ষীণজীবী, ইলেকট্রনের মতোই তার ভর, ইলেকট্রনের মতোই সে তড়িৎযুক্ত, তবে সে তড়িৎ পজিটিভ। এর নাম দেওয়া হল পজিট্রন। মেসন বলে আর-একটা মূল বস্তু মিলল, আর কল্পনা করা হল যে নিউট্রিনো বলে আরও একটা মূল বস্তু আছে, এ তড়িৎশূন্য, ইলেকট্রনের চেয়েও ছোট, কাজেকাজেই একে কোনো দিন ধরা যাবে না।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি

1934 সালে ফ্রেডরিক কুরী-জোলিও ও ইরিন কুরী-জোলিও পলোনিয়ম থেকে যে আল্‌ফা-রশ্মি বেরয় তা দিয়ে বিভিন্ন অ্যাটমকে আঘাত করতে লাগলেন। এই রশ্মির বিশেষত্ব এই যে এতে বিটা বা গামা রশ্মি মেশান নেই। এই রশ্মি অ্যালুমিনিয়মকে আঘাত করল, তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে অ্যালুমিনিয়ম থেকে পজিট্রন বেরতে থাকল। আরও লক্ষ্য করলেন, আল্‌ফা-রশ্মি বন্ধ করবার পরও কিছু সময় পর্যন্ত পজিট্রন বেরতে লাগল। পজিট্রনের নির্গমন ধীরে ধীরে কমে এল, ক্ষণস্থায়ী স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে রশ্মি বেরবার হার যেভাবে কমে। তবে কি অ্যালুমিনিয়ম তেজস্ক্রিয় হয়ে দাঁড়াল? কিছু সময়ের জন্যে সেই রকম দাঁড়াল বৈকি! পরিবর্তনটা এই রকম হল। 27 অ্যাটম-ভার অ্যালুমিনিয়মের উপর 4 অ্যাটম-ভারের হিলিয়ম ধাক্কা দিল, 30 অ্যাটম-ভারের ফস্‌ফরসের এক জুড়িদার জন্মাল, আর একটা নিউট্রন বেরল। এই ফস্‌ফরস তেজস্ক্রিয় হল, ভাঙল, পজিট্রন বেরল, শেষ অবধি 30 অ্যাটম-ভারের ফস্‌ফরস 30 অ্যাটম-ভারের সিলিকনে পরিবর্তিত হল।

কুরী-জোলিওরা তাঁদের পরীক্ষা আলোচনা করে বললেন যে প্রোটন, নিউট্রন বা ভারি হাইড্রোজেনের কেন্দ্রক ডয়টেরনকে বেগযুক্ত করে তাদের ছট্‌রা হিসেবে ব্যবহার করলে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রস্তুত করা যেতে পারে। বিভিন্ন পরীক্ষাগারে সেইরকম করে বহু তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হতে থাকল। একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। বেগযুক্ত ডয়টেরন বিসমথকে আঘাত করল, রেডিয়ম E পাওয়া গেল। যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রকৃতিতে জন্মাচ্ছিল বিজ্ঞানী এখন তাকে পরীক্ষাগারে তৈরি করল। শক্তিশালী সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে ডয়টেরন প্রভৃতিকে বেগযুক্ত করা হল। সাইক্লোট্রোন থেকে 20 লক্ষ ভোল্টের ডয়টেরন বেরিয়ে এসে সোডিয়মের উপর পড়ে এক বিস্ময়কর কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করল। 23 অ্যাটম-ভার সোডিয়মের উপর 2 অ্যাটম-ভার ডয়টেরন পড়ল, 24 অ্যাটম-ভারের সোডিয়ম হল, আর প্রোটন বেরিয়ে গেল। এই 24 অ্যাটম-ভারের সোডিয়ম থেকে ধীরে ধীরে ইলেক্‌ট্রন আর গামা-রশ্মি বেরতে থাকল, স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিটা-রশ্মি ও গামা-রশ্মি যেমন বেরয়। এই রকম সোডিয়মের নাম দেওয়া হল রেডিও-সোডিয়ম। দেখা গেল, এই রেডিও-সোডিয়ম থেকে ইলেক্‌ট্রন নির্গমনের হার বাড়িয়ে দেওয়া যায়, সাইক্লোট্রোনের শক্তি বাড়াতে পারলেই হল।

এক গ্রাম রেডিয়ম থেকে সেকেণ্ডে 340 লক্ষ ইলেক্‌ট্রন বেরয়। লরেন্স নুনকে তেজস্ক্রিয় করে তার থেকে আরও বেশি হারে ইলেক্‌ট্রন পেতে থাকলেন। বড় রকমের পার্থক্য রইল এই যে, যেখানে রেডিয়মের তেজস্ক্রিয়তা প্রায় দু হাজার বছরে অর্ধেকে দাঁড়াবে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা পনর ঘণ্টায় অর্ধেক হয়ে যাবে।

চিকিৎসায় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ

তেজস্ক্রিয়তা শীগগির শীগগির শেষ হওয়ায় চিকিৎসাক্ষেত্রে কতক কতক রোগে এ বেশি কাজের হল। ক্যানসার প্রভৃতি রোগে রেডিয়ম ধন্বন্তরি, কিন্তু দেহের ভিতরে ক্যানসার হলে রেডিয়ম দেওয়া চলে না। সেখানে রেডিয়ম দেওয়া চলে না বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট তেজের রেডিও-সোডিয়ম দেওয়া যায়।

দেহের ভিতরে গিয়ে ওই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ কিছু সময়ের জন্যে রশ্মি বিকিরণ করবে, তার পর আপনা হতে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। যখন নিষ্ক্রিয় হবে তখন ম্যাগনেসিয়মে পরিণত হবে, আর ম্যাগনেসিয়ম শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর নয়। দেহের মধ্যে যদি রেডিয়ম প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হত তবে রোগ সারত, কিন্তু রোগ সারবার পরও রেডিয়ম রশ্মি বিকিরণ করতে ছাড়ত না, রোগ শেষের সঙ্গে সঙ্গে রোগীও শেষ হত।

আজকাল অনেক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হচ্ছে, আর তাদের মধ্যে কয়েকটি চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ ফল দিচ্ছে। সেদিন খবরের কাগজে একটা সংবাদ বেরিয়েছিল। এক মহিলার মারাত্মক রকমের গলগণ্ড রোগ হয়। ডাক্তারেরা বললেন, এ রোগ সারে না, অন্তত আমাদের দেশে এ সারাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। মৃত্যু অনিবার্য। তখন একজন ডাক্তার শেষ চেষ্টা করলেন, তিনি বিলেত থেকে এরোপ্লেনে টাট্‌কা তৈরি তেজস্ক্রিয় আয়োডিন আনালেন আর রোগীকে ওই তেজস্ক্রিয় আয়োডিন খাওয়াতে থাকলেন। মহিলাটি সেরে উঠলেন। এ রকমের চিকিৎসা এদেশে নতুন হলেও পাশ্চাত্য দেশে খুব চলছে। এ দেশে চালু করতে হলে এখানেই টাট্‌কা তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরি করতে হবে। সে ব্যবস্থা এখানে আজও হয় নি। সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে এই রকম তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরি করতে খরচ পড়ে যেত অনেক, সময় লাগতও ঢের। আজকাল সেখানে অ্যাটমিক পাইলের সাহায্যে অনেক সস্তায় আর অল্প সময়ের মধ্যে এইসব জিনিস তৈরি হচ্ছে।

একই অ্যাটম নিষ্ক্রিয় হোক বা তেজস্ক্রিয় হোক, তার রাসায়নিক ধর্ম এক। কিন্তু সমুদ্রতীরে বালিরাশির মধ্যে এক কণা বালিকে যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না, দেহমধ্যে একটি নিষ্ক্রিয় অ্যাটমও তেমনি আপনাকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই অ্যাটম যখন তেজস্ক্রিয় হয় তখন তার উপর যেন একটা ছাপ পড়ে, এই লেবেলযুক্ত অ্যাটম তার যাওয়ার পথ জানান দিয়ে চলে। রেডিও-সোডিয়মযুক্ত নুন যদি খাওয়া যায় তবে তা দশ মিনিটের মধ্যে আঙুলের ডগায় এসে পৌছবে আর নিকটবর্তী গাইগার কাউণ্টারে ধরা পড়বে।

পা-এ গ্যাংগ্রিন হয়েছে। পা কেটে বাদ দিতে হবে। কিন্তু ঠিক কোন্‌খানটা থেকে বাদ দিতে হবে তা স্থির করা এতদিন কঠিন ছিল, কারণ কতদূর অবধি রক্ত চলাচল করছে তা ধরবার কোনো সঠিক পদ্ধতি জানা ছিল না, আর গ্যাংগ্রিন মূলত রক্ত চলাচলের অভাবেই ঘটে। এখন রোগীকে রেডিও-সোডিয়ম খাইয়ে দেওয়া হল, যতদূর পর্যন্ত রক্ত চলাচল হচ্ছে ঠিক ততদূর পর্যন্ত রক্তস্রোতের সঙ্গে ওই রেডিও-সোডিয়ম পৌছবে, আর পার্শ্ববর্তী গাইগার কাউণ্টার তা জানিয়ে দেবে।

আমাদের দেহের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে কি সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে, কোষগুচ্ছ কত তাড়াতাড়ি ভাঙছে গড়ছে, ভিটামিন এন্‌জাইম প্রভৃতি কি কাজ করছে, এসব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর ধারণা খুবই অস্পষ্ট ছিল। আজ এই রকমের লেবেলযুক্ত অ্যাটম দেহের মধ্যে গিয়ে যা এতদিন শুধু অনুমানের বিষয় ছিল তাকে সঠিক ভাবে জানিয়ে দিল।

আজ এই সব আবিষ্কারে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা, একই সঙ্গে পুষ্ট হয়ে চলেছে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ এই সব কয়টি বিদ্যায় আলোচ্য বিষয়ের মূলে আছে অ্যাটম, আগেকার অ্যাটম ও এখনকার অ্যাটম।

প্রিয়ম্বদা দেবী

১৮৭১—১৯৩৫

প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতাগুলি এমন সহজ স্বচ্ছ, এমন অনাড়ম্বর, বিধবার দেহের মত সেগুলি এমন নিরলংকার যে প্রথম অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে সেগুলিকে অকিঞ্চিৎকর মনে হওয়া বিচিত্র নয়। শরৎকালের প্রভাতে ঘাসের মধ্যে মুক্তা ছড়াইয়া থাকিলে অধিকাংশ লোকেই শিশিরভ্রমে সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র করিবে না বলিয়া আশঙ্কা। প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতাগুলির দিকেও এ পর্যন্ত পাঠক-সাধারণ ফিরিয়া তাকায় নাই, শিশিরসঞ্চয়ী ঘাসের মধ্যে মুক্তার মত এই ক্ষুদ্রকায় নিটোল কাব্যকণাগুলি সম্পূর্ণ অনাদৃত রহিয়া গিয়াছে।

শিল্পগত স্বচ্ছ অনাড়ম্বরতার প্রতিষেধক হইতে পারিত, প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতার সংখ্যা যদি যথেষ্ট হইত। সংখ্যাগত প্রাচুর্য শিল্পগত লঘুতার পরিপূরক। কিন্তু সেদিকেও আশা করিবার বিশেষ-কিছু নাই; পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁহার কবিতাগুলি নিতান্তই মুষ্টিমেয়। পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিবার ইহাও একটা হেতু।

ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতার আলোচনা উপলক্ষ্যে একজন লেখক বলিয়াছেন যে, ভিক্টোরীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গেই আর্নল্ডের স্থান, তবে যে তাহার আসন সংকীর্ণ বলিয়া মনে হয় তার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁহার কবিতার পরিমাণ অপ্রচুর; টেনিসন ব্রাউনিং বা সুইনবার্নের স্তূপীকৃত কীর্তির পাশে আর্নল্ডের কবিকৃতি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর দেখায়। বিশিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন কবিরা নূতন পথ রচনা করিয়া অবতীর্ণ হন; পথটা অপরিচিত বলিয়া কবির বিরুদ্ধে পাঠকের মনে প্রথমে একটা প্রতিকূলতা থাকে, সেই প্রতিকূলতা কাটিয়া রচনার সহিত পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় অনুকূলতা আসে, প্রাচুর্য সেই ঘনিষ্ঠতার অবকাশ দেয়। কিন্তু রচনার পরিমাণ স্বল্প হইলে ঘনিষ্ঠতার অভাবে কবির সম্বন্ধে পাঠকের সুবিচার করিবার সুযোগ ঘটিয়া ওঠে না; অর্থাৎ পাঠকে ধারের সঙ্গে ভার চায়, আর্নল্ডের কবিকৃতিতে ধার যথেষ্ট, কিন্তু ভারের অভাব। টেনিসন ব্রাউনিং প্রভৃতি ধারে-ভারে পাঠকের মনে কাটিয়া বসিয়াছেন, ভারের অভাবে আর্নল্ড পাঠক-হৃদয়ে আপন প্রাপ্য স্থানটি হইতে বঞ্চিত আছেন।

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যেও ভারের অভাব। একে তাঁহার শিল্পের মধ্যে এমন-কিছু আছে পাঠকের পক্ষে যাহার ধারণা করা কঠিন, তার উপরে পরিমাণের লঘুতা, দুয়ে মিলিয়া তাঁহার কবিতার উপেক্ষার আসর বেশ প্রশস্ত করিয়া গড়িয়াছে।

আরও একটি বিষয়। তাঁহার কবিতা কেবল পরিমাণে সামান্য নয়, শিল্পে স্বচ্ছ সহজ নয়, আকৃতিতেও অধিকাংশই অতিশয় ক্ষুদ্র। তাঁহার বেশির ভাগ কবিতাই চোদ্দ বা আঠারো ছত্রের বেশি নয়, পঁচিশ-ত্রিশ ছত্রের কবিতা অল্পই আছে, আট-দশ-চার ছত্রের কবিতার সংখ্যাও প্রচুর। আকারের এই ক্ষুদ্রতাও তাঁহার কবিতার স্বমর্যাদাপ্রাপ্তির পক্ষে একটি অন্তরায় হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আকৃতির দৈর্ঘ্য একরকমের ভার, উহাতে পাঠকের বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। পাঠকে মনে করে, এত দীর্ঘ যখন নিশ্চয় কিছু

বস্তু আছে। নিছক আকৃতির দাবিতেই বৃত্রসংহার-কাব্য আজ পর্যন্ত পাঠকসমাজে টিকিয়া আছে। আকারে ছোট হইলে সংখ্যা দ্বারা পুরাইয়া লইতে হয়; বৈষ্ণবপদগুলিও ছোট, কিন্তু সংখ্যার বাহুল্যে ছোটকে আর ছোট মনে হয় না। শিল্পগত স্বচ্ছতা, সংখ্যার অল্পতা এবং আকৃতির হ্রস্বতা তিনই প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যের স্বমর্যাদাপ্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায়। সাধারণ পাঠকসমাজে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত, বিশেষজ্ঞ পাঠকেও তাঁহাকে বিশেষভাবে জানেন এমন মনে হয় না, তাঁহার কবিতার রসজ্ঞ পাঠকের সংখ্যা তাঁহার কবিতার চেয়েও অপ্রচুর। মানুষের বিচারে যেমনি হোক, বিধাতা এক দিকে কৃপণতা করিয়া আর-এক দিকে পুরাইয়া দেন। প্রিয়ম্বদা দেবী এমন-এক অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন-এক স্থান হইতে তাঁহার কাব্যের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন যে, আর কোনো বাঙালি লেখকের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজের একখানি কাব্যগ্রন্থে নিজের কবিতাভ্রমে প্রিয়ম্বদা দেবীর পাঁচটি কবিতাকে স্থান দিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, অন্তত উক্ত কবিতা-কয়টি রবীন্দ্রনাথের রস-বিচারের মাপকাঠিতে পাশ-মার্কা পাওয়া। এই সান্ত্বনায় সাধারণ পাঠকের জয়ধ্বনির অভাব পূরণ করিয়া দেয়। প্রিয়ম্বদা দেবীর ক্ষোভের কারণ থাকা উচিত নয়।

পূর্বোক্ত ইতিহাসটুকু সবিস্তারে বর্ণনা করা যাইতে পারে—

"কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার ক'রে নিলেম। প'ড়ে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হল। মনে হল ভালোই লিখেছি।· ·পড়ে দেখলাম—

> তোমারে ভুলিতে মোর হল না যে মতি
> এ জগতে কারো তাহে নাই কোনো ক্ষতি।
> আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ ঋণী,
> দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভ'রে উঠেছে। পেটুক-চিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্যে একে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত, এমন কি, একে বড় আকারে লেখাই এর চেয়ে হত সহজ। কিন্তু লোভে পডে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুব্ধ কবিবুদ্ধির প্রশংসাই করলেম।

"তার পর আর-একটা কবিতা—

> ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে
> ভিজে ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে
> কিছুই নাহি যে হায় এ বুকের কাছে
> যা-কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে।

আবার বললেম শাবাশ। হৃদয়ের ভিতরকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে, এ কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেছে? ওর উপরে আর-একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীণদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোট কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করে দিলাম এজন্য নিজেকে মনে মনে বলতে হল ধন্য।

"তার পর আর-একটি কবিতা—

আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।
কেন এতটুকু নাম সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমায় তুমি? পূর্ণ নাম ধরে
আজি ডাকিবার দিন, এ হেন সময়
শরম সোহাগ হাসি কৌতুকের নয়।
আঁধার অম্বর পৃথ্বী, পথ চিহ্নহীন,
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন।

'মানসী' লেখবার যুগে, সে আজকের কথা নয়, এই ভাবেরই দু একটি কবিতা লিখেছিলেম বলে মনে পড়ে। কিন্তু কোন্ অনিমাসিদ্ধি দ্বারা ভাবটি তবু আকারেই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

"আর-একটি ছোট কবিতা—

প্রভু তুমি দিয়েছ যে-ভার
যদি তাহা মাথা হতে
এই জীবনের পথে
নামাইয়া রাখি বার বার—
জেনো তা বিদ্রোহ নয়,
ক্ষীণ শ্রান্ত এ হৃদয়,
বলহীন পরান আমার।

লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ বলেই এর ভিতরকার বেদনা যেন বৃষ্টিক্লান্ত জুঁইফুলটির মত ফুটে উঠেছে।

"আমি বিশেষ তৃপ্তি এবং গর্বের সঙ্গেই এই কবিতা-কয়টি অ্যালুমিনিয়মের পাতের উপরে স্বহস্তে নকল করে নিলেম। যথাসময়ে আমার অন্যান্য কবিতিকার সঙ্গে এ-কয়টিও আমার 'লেখন' নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।"

ইহার পরে পাঠক-সাধারণ যদি জয়ধ্বনি না জানায় তবে কি বিশেষ ক্ষতি আছে? এমন অভাবিত প্রশংসা কয় জন কবির ভাগ্যে জুটিয়াছে?

আগেই বলিয়াছি যে প্রিয়ম্বদা দেবীর অধিকাংশ কবিতা আকারে ক্ষুদ্র। শুধু তাই নয়, কবিতাগুলির মধ্যে এমন-একটি সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা আছে যাহা লিরিক কবিতার চেয়ে এপিগ্রাম জাতীয় কবিতার স্বভাবসংগত। লিরিক কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের জন্য একটুখানি বিস্তারের আবশ্যক, এপিগ্রামে ঠিক তাহার বিপরীত। এপিগ্রামের সংহত, সংযত কঠিনতা সাধারণের পক্ষে উপলব্ধি সহজ নয়। 'পেটুক চিত্ত পাঠকের পেট' তাহাতে ভরে না, আর এপিগ্রামের নিরাভরণ সৌন্দর্য অনেক সময়েই প্রাকৃত জনের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অক্ষম। এও একটা কারণ যেজন্য প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্য অনাদৃত রহিয়া গিয়াছে। এপিগ্রাম-ধর্মী কয়েকটি কবিতা এখানে উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

তোমারে ফিরায়ে যদি দেন আরবার
দেবতারে দিতে পারি সর্বস্ব আমার,

তুমি যে সর্বস্ব মোর তাই বড় ভয়
শপথ রাখিতে শক্তি হয় কি না হয়।

আর-একটি—

দুর্বল, বুঝেছি তোর হৃদয়ের কথা,
দুর্লভ হারায়ে গেছে তাই শুধু ব্যথা ?
আর কেহ পাছে তারে খুঁজে ফিরে পায়
তাই তোর এত ভয়, এত হায় হায় !

আরও একটি—

উভয়ে সমান মম সুখ-দুঃখ আর
তুমি মোর দুঃখ, তুমি সুখ সে আমার,
তুমি চির-বরণীয়, তাই এ অন্তরে
সুখ-দুঃখে বরিয়াছি তুল্য সমাদরে।

আবার একটি—

সুখ শুধু এতটুকু অংশ জীবনের,
প্রিয়জন সর্বস্ব তাহার ,
সুখ গেলে এ জীবনে তবু দিন কাটে
প্রিয় গেলে প্রাণে বাঁচা ভার।

এমন আরও অনেক উদ্ধার করা যাইতে পারে।

লিরিকের উদ্ভব হৃদয়ে, সুখ-দুঃখের বেদনায়; এপিগ্রামের উদ্ভব মস্তিষ্কে, ভালো-মন্দের বিচারে; হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা ছাড়া পাইয়া লিরিকে বিস্তারিত হইয়া যায়; ভালো-মন্দের বিচার সংহত হইয়া এপিগ্রামে দানা বাঁধিয়া ওঠে : লিরিক নীহারিকা, এপিগ্রাম নক্ষত্র। একই কারণ সাগর হইতে দুয়ের সৃষ্টি হইলেও কার্যত দুই ভিন্ন। দুয়ের কার্য ও ধর্ম স্বতন্ত্র। প্রিয়ম্বদা দেবীর অনেক কবিতার একটি ত্রুটি এই যে, লিরিক-ভাব এপিগ্রাম আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদনাকে শিল্পের শাণযন্ত্রে চড়াইয়া কাটিয়া-কুটিয়া ছাঁটিয়া-ছুটিয়া একেবারে তাহার সূক্ষ্মতম রূপে লইয়া গিয়া তবে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। লিরিক-বেদনার পক্ষে এটি ত্রুটি বলিয়া মনে করি; বেদনার সঙ্গে বেদনার ভার অত্যাবশ্যক, সেই অত্যাবশ্যকটুকুও সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই, তাহাতে ক্ষতিই হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই একটি মাত্র ত্রুটিই তাঁহার কাব্যে আমার চোখে পড়িয়াছে, বাকি সবই প্রশংসার।

২

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যের মতই তাঁহার জীবন ঘটনাবিরল, বাহুল্যবর্জিত এবং একটি চরম বেদনার মধ্যে সংহত। ক্ষেত্রান্তর হইতে তাঁহার জীবন-কথা উদ্ধার করিয়া দিলাম—

"ইনি প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র সন্তান। ১৮৭১ সালে পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯২ সালে প্রিয়ম্বদা বেথুন কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই

বৎসরেই মধ্যপ্রদেশের ব্যবহারাজীব তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার বৈধব্য (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) ঘটে।

"শৈশবাবধি বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার অনুরাগ ছিল। ১২৯২ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বামা-বোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফুল' নামে একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভই তাঁহার মুদ্রিত প্রথম রচনা। পর বৎসর 'ভারতী ও বালকে' (কার্তিক ১২৯৩) তাঁহার একটি 'গান' 'বালিকার রচনা' হিসাবে মুদ্রিত হয়। ১৩০৫ সাল হইতে ভারতীতে তাঁহার গদ্য পদ্য বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সুকবি হিসাবে প্রিয়ম্বদা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী—

১　রেণু (কাব্য) : ১.৯.১৯০০। পৃ ৬৯
২　তারা (শোক কবিতা) : ১৮.১১.১৯০৭। পৃ ৩৪
৩　পত্রলেখা (কাব্য) : ১০.১.১৯১১। পৃ ১৫৮
৪　অংশু (কাব্য) : শ্রাবণ ১৩৩৪ (১৯২৭) পৃ ১২৫
৫　চম্পা ও পাটল (কাব্য) : ইং ১৯৩৯। পৃ ৩৮

"ইহা ছাড়া তিনি তিনখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'অনাথ' (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫), 'কথা ও উপকথা' ও 'পঞ্চুলাল' (১৯২৩) রচনা করিয়াছিলেন। ১৩৪১ সালের ফাল্গুন মাসে প্রিয়ম্বদা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে, (দ্র' ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪১)।" †

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় রেণু, পত্রলেখা, অংশু এবং চম্পা ও পাটল কাব্য চতুষ্টয়।

৩

রবীন্দ্রনাথ চম্পা ও পাটল কাব্যের ছোট একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—

"প্রিয়ম্বদার কবিতার প্রধান বিশেষত্ব রচনার সহজ ধারায়, অলংকারশাস্ত্রে যাকে বলে প্রসাদগুণ। স্বচ্ছ তার ভাষা, সরল তার ভাবের সংবেদন। সে যেন ফুলের মতো, বাইরে থেকে যার পাপড়িতে রং ফলানো হয় নি, আপন রং সে নিজের অগোচরেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর, সেই ফুলটি যূথী মালতী জাতের, পেলব তার চিক্কণতা, সে চোখ ভোলায় না প্রগল্‌ভ প্রসাধনে, মনের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য সুগন্ধের প্রেরণায়। ·বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ম্বদার স্পর্শসচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অবারণীয় অশ্রুধারার মতো।· ·"

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ যূথী মালতী ফুলের মত বলিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে এত ফুলের ছড়াছড়ি আর কারো কাব্যে এমন সর্বব্যাপী নয়। তবে সে ফুল কেবল যূথী মালতী জাতের নয়, তার মধ্যে চম্পা পাটল গোলাপ কৃষ্ণচূড়া বলরামচূড়া কামিনী প্রভৃতি নানা জাতের নানা রঙের তীব্র সৌগন্ধের ও উগ্রবর্ণের ফুলেরও অভাব নাই। উপমা ও উপাদানকে অনুসরণ করিয়া কবির অবচেতন মনোলোকে প্রবেশ করিবার সাহিত্যিক রীতি আছে বটে, তেমন করিতে

† বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭

তুমি যে সর্বস্ব মোর তাই বড় ভয়
শপথ রাখিতে শক্তি হয় কি না হয়।

আর-একটি—

দুর্বল, বুঝেছি তোর হৃদয়ের কথা,
দুর্লভ হারায়ে গেছে তাই শুধু ব্যথা ?
আর কেহ পাছে তারে খুঁজে ফিরে পায়
তাই তোর এত ভয়, এত হায় হায় !

আরও একটি—

উভয়ে সমান মম সুখ-দুঃখ আর
তুমি মোর দুঃখ, তুমি সুখ সে আমার,
তুমি চির-বরণীয়, তাই এ অন্তরে
সুখ-দুঃখে বরিয়াছি তুল্য সমাদরে।

আবার একটি—

সুখ শুধু এতটুকু অংশ জীবনের,
প্রিয়জন সর্বস্ব তাহার ,
সুখ গেলে এ জীবনে তবু দিন কাটে
প্রিয় গেলে প্রাণে বাঁচা ভার।

এমন আরও অনেক উদ্ধার করা যাইতে পারে।

লিরিকের উদ্ভব হৃদয়ে, সুখ-দুঃখের বেদনায়, এপিগ্রামের উদ্ভব মস্তিষ্কে, ভালো-মন্দের বিচারে; হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা ছাড়া পাইয়া লিরিকে বিস্তারিত হইয়া যায়, ভালো-মন্দের বিচার সংহত হইয়া এপিগ্রামে দানা বাঁধিয়া ওঠে: লিরিক নীহারিকা, এপিগ্রাম নক্ষত্র। একই কারণ সাগর হইতে দুয়ের সৃষ্টি হইলেও কার্যত দুই ভিন্ন। দুয়ের কার্য ও ধর্ম স্বতন্ত্র। প্রিয়ম্বদা দেবীর অনেক কবিতার একটি ত্রুটি এই যে, লিরিক-ভাব এপিগ্রাম আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদনাকে শিল্পের শাণযন্ত্রে চড়াইয়া কাটিয়া-কুটিয়া ছাঁটিয়া-ছুটিয়া একেবারে তাহার সূক্ষ্মতম রূপে লইয়া গিয়া তবে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। লিরিক-বেদনার পক্ষে এটি ত্রুটি বলিয়া মনে করি; বেদনার সঙ্গে বেদনার ভার অত্যাবশ্যক, সেই অত্যাবশ্যকটুকুও সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই, তাহাতে ক্ষতিই হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই একটি মাত্র ত্রুটিই তাঁহার কাব্যে আমার চোখে পড়িয়াছে, বাকি সবই প্রশংসার।

২

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যের মতই তাঁহার জীবন ঘটনাবিরল, বাহুল্যবর্জিত এবং একটি চরম বেদনার মধ্যে সংহত। ক্ষেত্রান্তর হইতে তাঁহার জীবন-কথা উদ্ধার করিয়া দিলাম—

"ইনি প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র সন্তান। ১৮৭১ সালে পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯২ সালে প্রিয়ম্বদা বেথুন কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই

বৎসরেই মধ্যপ্রদেশের ব্যবহারাজীব তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার বৈধব্য (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) ঘটে।

"শৈশবাবধি বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার অনুরাগ ছিল। ১২৯২ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বামা-বোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফুল' নামে একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভই তাঁহার মুদ্রিত প্রথম রচনা। পর বৎসর 'ভারতী ও বালকে' (কার্তিক ১২৯৩) তাঁহার একটি 'গান' 'বালিকার রচনা' হিসাবে মুদ্রিত হয়। ১৩০৫ সাল হইতে ভারতীতে তাঁহার গদ্য পদ্য বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সুকবি হিসাবে প্রিয়ম্বদা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী—

১ রেণু (কাব্য) : ১.৯.১৯০০। পৃ ৬৯

২ তারা (শোক কবিতা) : ১৮.১১.১৯০৭। পৃ ৩৪

৩ পত্রলেখা (কাব্য) : ১০.১.১৯১১। পৃ ১৫৮

৪ অংশু (কাব্য) : শ্রাবণ ১৩৩৪ (১৯২৭) পৃ ১২৫

৫ চম্পা ও পাটল (কাব্য) : ইং ১৯৩৯। পৃ ৩৮

"ইহা ছাড়া তিনি তিনখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'অনাথ' (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫), 'কথা ও উপকথা' ও 'পঞ্চুলাল' (১৯২৩) রচনা করিয়াছিলেন। ১৩৪১ সালের ফাল্গুন মাসে প্রিয়ম্বদা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে, (দ্র° ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪১)।" †

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় রেণু, পত্রলেখা, অংশু এবং চম্পা ও পাটল কাব্য চতুষ্টয়।

৩

রবীন্দ্রনাথ চম্পা ও পাটল কাব্যের ছোট একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—

"প্রিয়ম্বদার কবিতার প্রধান বিশেষত্ব রচনার সহজ ধারায়, অলংকারশাস্ত্রে যাকে বলে প্রসাদগুণ। স্বচ্ছ তার ভাষা, সরল তার ভাবের সংবেদন। সে যেন ফুলের মতো, বাইরে থেকে যার পাপড়িতে রং ফলানো হয় নি, আপন রং যে নিজের অগোচরেই সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর, সেই ফুলটি যূথী মালতী জাতের, পেলব তার চিক্কণতা, সে চোখ ভোলায় না প্রগল্‌ভ প্রসাধনে, মনের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য সুগন্ধের প্রেরণায়। ·বিশ্বপ্রকৃতির সংস্রবে প্রিয়ম্বদার স্পর্শসচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ-বেদনা কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অবারণীয় অশ্রুধারার মতো।· ·"

প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ যূথী মালতী ফুলের মত বলিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে এত ফুলের ছড়াছড়ি আর কারো কাব্যে এমন সর্বব্যাপী নয়। তবে সে ফুল কেবল যূথী মালতী জাতের নয়, তার মধ্যে চম্পা পাটল গোলাপ কৃষ্ণচূড়া বলরামচূড়া কামিনী প্রভৃতি নানা জাতের নানা রঙের তীব্র সৌগন্ধের ও উগ্রবর্ণের ফুলেরও অভাব নাই। উপমা ও উপাদানকে অনুসরণ করিয়া কবির অবচেতন মনোলোকে প্রবেশ করিবার সাহিত্যিক রীতি আছে বটে, তেমন করিতে

† বাংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দান : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭

পারিলে এই পুষ্পোল্লেখবাহুল্য হইতে কোনো গুপ্ত সত্য উদ্ধার করা হয় তো একেবারে অসম্ভব হইত না। কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে ফুলের মত এমন সুকুমার, এমন স্পর্শকাতর অথচ এমন সুন্দর আর-কিছু আছে কি না সন্দেহ। একমাত্র ভালোবাসার সঙ্গেই ফুলের তুলনা চলে। 'দীপশিখা সম কাঁপে ভীত ভালোবাসা' এ কথা ফুল সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ফুলের ও প্রেমের এই সাধর্ম্য লক্ষ্য করিয়াই কবি যেন পুষ্পবৃষ্টিতে নিজের কাব্য ছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার চোখে ফুল-প্রেম; তাঁহার ফুলের কাব্য নামান্তরে প্রেমের কাব্য। জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা হইতে কবি বুঝিয়াছেন যে, প্রেম ফুলের মতই সুন্দর অথচ ক্ষণপ্রাণ; আরও বুঝিয়াছেন যে, ফুল ঝরিয়া গেলেও তাহার গন্ধ বাতাসে থাকিয়া যায়, প্রেমাস্পদ গত হইলেও প্রেমের উত্তর-রাগ 'প্রিয়জনের মনের কোণে শরৎ সন্ধ্যামেঘে' লাগিয়া থাকে। সেই পুষ্পসৌরভের, প্রেমের স্মৃতির, প্রেমের বেদনার কাব্যই যে তিনি লিখিতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের ফুল চিন্ময়, তাহা প্রেমের প্রতীক।

৪

দুঃখ-বেদনা-বিচ্ছেদ সকলের পক্ষেই অসহ, কিন্তু যারা কল্পনাপ্রবণ, অনুভূতি যাহাদের তীক্ষ্ণ, তাহাদের পক্ষে না জানি আরও কত অসহ। কিন্তু তাহাদের ক্ষতি নিছক ক্ষতি নয়, তাহাদের হিসাবের খাতার বামে ক্ষতিপূরণস্বরূপ জমার অঙ্ক একটা দেখা যায়। দুঃখের অনুভূতিকে তাহারা শিল্পে মূর্তি দিয়া থাকে, তখন সেই মূর্তি সকলের অনুভবযোগ্য দর্শনযোগ্য হইয়া ওঠে। সাধারণ লোকে অন্ধভাবে দুঃখের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; শিল্পীর কলমে দুঃখের স্বরূপ ফুটিয়া উঠিলে তবেই তাহারা দুঃখকে দেখিতে পায়, শিল্পীর দুঃখের অভিজ্ঞতায় নিজের দুঃখের দোসরকে দেখে। সুখ সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। প্রিয়ম্বদা দেবী নিজের দুঃখের অভিজ্ঞতার বিন্যাসে সাধারণের দুঃখের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন।

রেণু তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম বলিয়াই হোক, আর শোকের কারণ অতিশয় নিকটবর্তী বলিয়াই হোক, সবগুলি কবিতা সুষম শিল্পমূর্তি লাভ করে নাই। তবে যেসব উপাদানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা গঠিত, রেণু-কাব্যেই সেগুলি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি ও প্রেমের যুগল তন্তুতে তাঁহার শ্রেষ্ঠকবিতাগুলি রচিত, রেণু তাহার ব্যতিক্রম নয়। রেণুর বর্ষা বিরহিণী; শরৎ প্রভৃতি স্নেহময়ী মাতা। আবার দেখি হেমন্তের হিমানী, সেও বিরহিণী। কবির বিদ্ধ হৃদয় শরাহত কুরঙ্গের মত ছুটিয়া গিয়া যে সরোবরতীরে উপনীত হইয়াছে তাহা প্রকৃতির অতল স্নেহ ও শান্তি।

পত্রলেখা-কাব্য পূর্ণ পরিণত, হয়তো এখানিই তাঁহার শ্রেষ্ঠকাব্য কিংবা বলা উচিত যে তাঁহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা পত্রলেখার অন্তর্ভূত, কেননা, তাঁহার এক কাব্য হইতে অন্য কাব্যের প্রকৃতিগত কোনো স্বাতন্ত্র্য নাই, সবই যেন এক সুদীর্ঘ বিচ্ছেদবেদনার ক্রৌঞ্চীগীতি।

পত্রলেখায় আসিয়া শোক শ্লোক হইয়া উঠিয়াছে। সার্থক শিল্পসৃষ্টির পক্ষে বাস্তব ঘটনা হইতে যে দূরত্বের আবশ্যক, যে বিবিক্ত ভাব অনিবার্য, পত্রলেখা-কাব্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। প্রকৃতি ও মানুষের যে যুগল তন্তুর বিষয় আগে উল্লেখ করিয়াছি, এখানে সেই বুনানি আরও নিপুণ, দুইকে এক বলিয়া মনে হয়।

আর-এক দিকে দেখি রেণু কাব্যের অপেক্ষাকৃত লিরিক বিস্তৃতি ঘনতর পিনদ্ধ হইয়া সংহত এপিগ্রামের সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে, নীহারিকা নক্ষত্রে পরিণত। কাব্যের এই ক্রমবর্ধমান সংহতি সম্বন্ধে লেখিকা সচেতন, তাই কৈফিয়তস্বরূপ যেন বলিয়াছেন—

আমার অনন্ত ব্যথা ছাড়া পেতে চায়
অর্থহীন অর্থভরা অজস্র ভাষায়।
তবুও যখনি কিছু বলিবারে যাই
অশ্রুজলে কোনো কথা খুঁজিয়া না পাই।

আবার—

এক বিন্দু অশ্রু যদি ফেলি কভু আমি
অমনি বন্যার মত আসে দ্রুত নামি
অনন্ত শোকের মোর অবাধ প্লাবন
ভাঙিয়া ধৈর্যের বাঁধ ভাসাইয়া মন।
তাই আছি স্তব্ধ জড় পাষাণের মত
প্রবল উৎসের মুখ রুধিয়া নিয়ত।

তাঁহার মৌন ঋণাত্মক নয়, তাঁহার বাক্যহীনতা বেদনার গভীরতা-সূচী; মহাকাশের স্তব্ধতা যেমন শূন্য নয়, নির্জনতা যেমন রিক্ত নয়, এ-ও তেমনি। পত্রলেখা-কাব্যে দেখিতে পাই যে, মৃত্যুর পরে দয়িতের সহিত পুনরায় মিলন হইবে এইরূপ একটা আশা দেখা দিতেছে এবং সেই আশার সূত্রেই ভগবানের প্রতিও বিশ্বাস জাগিতেছে, কবির কাছে এখানে প্রেম ভগবৎবিশ্বাসের পূর্বসূত্র।

অংশু কাব্যখানি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হইলেও 'কবিতাগুলি প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বের রচনা'। পত্রলেখা ১৯১১ সালে প্রকাশিত হইলেও কবিতাগুলি যে আরও আগে রচিত অনুমান করা অনুচিত হইবে না। পত্রলেখার কবিতাগুলির সঙ্গে অংশু-কাব্যের শিল্পগত প্রভেদ না দেখিতে পাইলেও পরিপ্রেক্ষিত-গত পার্থক্য বেশ চোখে পড়ে। শোকের কারণ বেশ দূরে গিয়া পড়িয়াছে, আগেকার সে ক্ষতিবোধ নাই, তবে ক্ষতচিহ্ন আছে, সেই ক্ষতচিহ্ন মনে একপ্রকার বেদনার স্মৃতিময় ব্যাকুলতা জাগাইয়া তোলে। বোধ করি এইজন্যই অংশুর অনেকগুলি কবিতা নৈর্ব্যক্তিক ও তত্ত্ব-আভাসিত। ব্যক্তিগত ব্যথা হইতে কবির মন তত্ত্বে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, ব্যথাশ্রয়ী মন এখানে তত্ত্বাশ্রয়ী। কিন্তু তত্ত্ববিন্যাস বা তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা প্রিয়ম্বদা দেবীর প্রতিভার স্বরূপ নয়, তাই অচিরে নূতন আশ্রয় সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছে। আগেকার কাব্য প্রকৃতি ও মানুষের টানা-পোড়েনে বোনা, অংশুর অনেক কবিতার একটি সূত্র প্রেম, আর-একটি সূত্র পৌরাণিক দেবদেবী এবং পৌরাণিক নরনারী। একদা ব্যথার সান্ত্বনার জন্য যেমন প্রকৃতির কাছে কবি গিয়াছিলেন, এখানে তেমনি গিয়াছেন পৌরাণিক যুগের মহত্ত্বে ও ত্যাগোজ্জ্বল চারিত্র্যে; উদ্দেশ্য অভিন্ন, লক্ষ্য ভিন্ন, এই মাত্র। এই শ্রেণীর কতকগুলি কবিতা পড়িয়া মনে হয় কবি যেন কতক পরিমাণে নিজের বেদনা ও বিচ্ছেদের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। অপরের ব্যথার অপূরণীয় তীব্রতা নিজের ব্যথাকে কতক পরিমাণে সুসহ করিয়া তুলিয়াছে।

চম্পা ও পাটল প্রিয়ম্বদা দেবীর শেষ কাব্য, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। এ বইখানা তাঁহার কবি-

জীবনের উপসংহার। জীবনান্তের ব্যথা যেন সমে আসিয়া আবার উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, দিনান্তের সন্ধ্যাকাশে যেন সূর্যোদয়েরই সমারোহ, তবু ঠিক এক নয়, ভালো করিয়া নিরিখ করিলেই ক্লান্তির আভাস ধরা পড়ে প্রভাতের সে নবোদ্যম কই? ভৈরবী আর পূরবী দুইই ব্যাকুল করা রাগিণী, কিন্তু সে ব্যাকুলতার জাত যে ভিন্ন।

ব্যথার উপসংহারে ব্যথার ভূমিকার উপাদানগুলি আবার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, পৌরাণিক তত্ত্বর পরিবর্তে প্রকৃতির প্রতি গভীর আস্থা ও অনুরাগের তত্ত্ব ফিরিয়া দেখা দিয়াছে; ফুলের বাগানে ফুলই ফোটে।

আরও একটি বিষয় কবির অবসন্ন জীবনান্ত স্মরণ করাইয়া দেয়। চারি দিকের নরনারীর জীবনলীলার প্রতি এমন একটি বিরিক্ত আগ্রহ পরিস্ফুট যাহা কেবল বিদায়-চেতন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

৫

প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতা সংখ্যায় অল্প, আকারে ক্ষুদ্র, অলংকারে দীন, ভাষায় স্বচ্ছ এবং ভাবে ও রূপে বিচিত্র নয়। এগুলি এমন মৃদু, এমন বাক্‌কুণ্ঠ, এমন অর্ধোক্ত— মনে হয় এ যেন কবির স্বগতোক্তি; বিজন মধ্যাহ্নে পল্লবে নিলীন ঘুঘুর স্থগিত বিলাপের যে ক্লান্ত ব্যাকুলতা, তাই যেন এ কবিতাগুলির মর্মে মর্মে জড়িত। এমন রচনার সমাদর হওয়াই কঠিন, বাংলা কাব্যসৃষ্টির বর্তমান অবস্থায় তো একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তবু ব্যথা যদি গভীর হয়, অভিজ্ঞতা যদি সত্য হয়, আর সেসব যদি শিল্পসম্মত রূপ লাভ করিয়া থাকে, তবে সে রসসৃষ্টির মার নাই। আধুনিক পাঠক যদি উপেক্ষা করিতে পারে, তবে এ কাব্যও অপেক্ষা করিতে পারিবে। আধুনিক আর সবই করিতে পারে, কেবল অপেক্ষা করিতে অক্ষম; আজকার দিনের সঙ্গেই যার গাঁটছড়া বাঁধা, আজকার দিনের সঙ্গেই যে তার সহমরণ অবশ্যম্ভাবী। শিল্পে ও সাহিত্যে নূতন চাকরের মতই নূতন বিষয়কে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়, প্রিয়ম্বদা দেবীর কাব্য মানুষের ব্যথার মতই পুরাতন, সেইজন্যই চিরন্তন।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি দ্বারা সূচনা করিয়াছিলাম আবার তাঁহার উক্তিতেই শেষ করি, "বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার কবিতা স্বকীয় আসন রক্ষা করতে পারবে, কেননা সে অকৃত্রিম"।

স্বীকৃতি: এই সংখ্যায় মুদ্রিত বসন্তবাহার চিত্রের ব্লক অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়োর সৌজন্যে ও বাউল চিত্রের ব্লক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

গ্রন্থপরিচয়

ভারতকথা। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী। মূল্য আট টাকা।
ভারতসন্ধানে। জওহরলাল নেহরু। সিগনেট প্রেস। মূল্য সাড়ে আট টাকা।

'আমার কুটিরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে— ভগবদ্‌গীতা।' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কথা ব'লে তাঁর 'গীতাপাঠ' গ্রন্থে আলোচনা আরম্ভ করেছেন। উপমাটি খুবই অর্থব্যঞ্জক। গীতা নামে বিস্ময়কর এক তত্ত্বকথা যুগ যুগ ধ'রে অনির্বাণ দীপশিখার মতই আলোক বিস্তার ক'রে ভারতের মনীষা ও জিজ্ঞাসা উদ্ভাসিত করেছে। এই উপমাকে আর-একটু প্রসারিত ক'রে নিয়ে বলা যায়, গীতা নামে বিনা তৈলে দীপ্যমান এই অক্ষয় প্রদীপটি বিনা শিলায় রচিত এক বিরাট মন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে, সে মন্দিরের নাম মহাভারত।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত, ব্যাসদেব বিরচিত, ভারতের 'পঞ্চম বেদ' নামে পরিচিত এই মহাভারত-সংহিতা বস্তুত বিনা শিলায় নির্মিত এক অক্ষয়িষ্ণু মন্দির, যার অভ্যন্তর হতে সহস্র সহস্র শ্লোকে উদ্‌গীত কাব্য কাহিনী তত্ত্ব ও ইতিবৃত্তের সুস্বর ভারতের চিত্ত যুগ যুগ ধরে মন্দ্রিত করে রেখেছে। সুদূরাতীত যে ভারতের কথা মহাভারত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সে ভারতের বিরাট ইতিহাসের বাস্তব নিদর্শন আজও কোনো পুরাতাত্ত্বিক সন্ধানী কোনো প্রান্তরে, ভূপঞ্জরে বা উপত্যকায় আবিষ্কার করতে পারেন নি। সে ইন্দ্রপ্রস্থের কোনো প্রাসাদনিকেতনের একটি ইষ্টকখণ্ড, সে কুরুক্ষেত্রের কোনো মহারথীর রথচক্রের একটি ভগ্নাংশ, সে রাজসূয় যজ্ঞস্থলীর কোনো একটি ধূপাধারের এক টুকরা চিহ্নও আজ পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ঐতিহাসিক খুঁজে বের করতে পারেন নি। সেই মহাভারতীয় ভারতের বিভিন্ন স্থানের নাম ও পরিচয় নিয়ে বহু স্থান আজও রয়েছে, কিন্তু শুধু নামটুকুই মাত্র, মহাভারতীয় যুগের কোনো বাস্তব নিদর্শন ও সাক্ষ্য কোথাও নেই।

ধাতু শিলা রত্ন ও কাষ্ঠে নির্মিত সেই মহাভারতীয় সভ্যতার ঐশ্বর্য হারিয়ে গেছে চিরকালের মত। এমন করে হারিয়েছে যে, সে ইতিহাসকে আজ একটা কল্পলোকের আখ্যায়িকা বলেই মনে করতে হয়। কিন্তু সে ইতিহাসের সকল রূপ এক মহাকাব্যের কায়া ধারণ করে আজও যেন সত্য ও প্রত্যক্ষ হয়ে রয়েছে। মহাভারত নামে এই বিস্ময়কর গ্রন্থের দিকে তাকিয়ে শুধু এই কথাই মনে হবে, সে ভারত হারিয়ে গিয়েও হারিয়ে যায় নি। ইন্দ্রপ্রস্থ আর হস্তিনাপুরের প্রাসাদ ধূলি হয়ে গেছে, কিন্তু তার রূপ উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে মহাভারতের শ্লোকে-শ্লোকে, সর্গে-সর্গে এবং অধ্যায়ে-অধ্যায়ে। কালের বিনাশলীলায় যে ঐতিহাসিক রূপের বস্তুময় সাক্ষ্য সকলই লুপ্ত হয়ে গেছে, তারই ভাবময় রূপটুকু অবিনশ্বর হয়ে আছে ঋষি দ্বৈপায়নের কাব্যিক সৃষ্টির মধ্যে।

পুরাণকার ভারতভূমির ভৌগোলিক পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
> বর্ষং তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥

—সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমাদ্রির দক্ষিণে যে বর্ষ অবস্থিত তারই নাম ভারত, এবং তারই সন্তানগণ ভারতী নামে পরিচিত। আসমুদ্রহিমাচল এই ভূখণ্ড যে 'ভারতবর্ষ' নামে ঐতিহাসিক পরিচয় লাভ করেছে, সেটা রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ফল নয়। অতীতের ভারত কোনো নরপাল ও রাজ্যেশ্বরের প্রতাপে বা প্রভাবে কখনো একটি অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে পরিণাম লাভ করে নি। তবুও, নিতান্ত বিস্ময়কর হলেও সত্য এই যে, ভারত নামে একটা অখণ্ড দেশত্ববোধ সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-নর্মদা-গোদাবরী-কাবেরীর সলিলবিধৌত বিভিন্ন উপত্যকাভূমির প্রতি জনপদবাসীর চিত্তে একটা সংস্কার-রূপে গড়ে উঠেছে। সংস্কার হিসাবে, বা ভাব হিসাবে, কিংবা আইডিয়া হিসাবেই হোক, ভারত নামে দেশত্ববোধ যুগ যুগ ধরে সত্য হয়ে আছে এক বহুরাষ্ট্রিক ও বহুভাষিক ভূখণ্ডের অধিবাসীর মনে। আর্যচিন্তার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি বেদ ভারতীয় মনীষাকে সহস্র গৌরব দান করেছে সত্য, কিন্তু ভারতের মানুষকে দেশাত্মবোধ তথা দেশৈক্যবোধ দান করেছে পুরাণ, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দান হল পুরাণ-মহাভারতের। ভারত নামে দেশত্বের বোধ এবং ভারতীয়তা নামে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অভিরুচি যে মূল আইডিয়া থেকে উৎসারিত হয়েছে, সেই আইডিয়ার ধারক বাহক এবং রক্ষক মহাভারত নামে পরিচিত গ্রন্থটি। এই দিক দিয়ে মহাভারতের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো মহাগ্রন্থের তুলনা হয় না। কোনো মহাকাব্য একটা দেশ ও জাতি সৃষ্টি করেছে, তার একমাত্র উদাহরণ হল মহাভারত। বিজ্ঞানীরা বলেন, বাষ্পীয় নীহারিকাপুঞ্জ মহাজাগতিক শক্তির লীলায় কঠিন কায়া লাভ করে গ্রহে পরিণত হয়েছে। তেমনি, যে ভারত পৌরাণিক কবির ভাবলোকে একটা কল্পনা বা আইডিয়া রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল, তাই ঐতিহাসিক ঘটনা সৃষ্টি করে দেশরূপে পরিণাম লাভ করেছে।

মহাভারত বস্তুত ভারত-অভ্যুদয়ের ইতিবৃত্ত। কুরুক্ষেত্র শুধু রণক্ষেত্রই নয়, বিরাট এক ঘটনা-বিপ্লবের যজ্ঞক্ষেত্র। কোথায় পূর্বপ্রান্তের মণিপুর আর পশ্চিমের দ্বারকা, উত্তরের গান্ধার আর দক্ষিণের মদ্র— তবু এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বহুজাতি এবং বহুরাজ্য প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সমন্বয়ের এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে একীভূত হয়ে উঠছে, মহাভারত সেই ঐক্যবিধায়ক ঘটনার কাহিনী। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্রের নাম ভরত এবং এই নৃপতি ভরতের শাসিত দেশেরই নাম ভারত, পৌরাণিকী উপাখ্যানে এই কথা বলা হয়েছে। কিম্বদন্তীর সেই ক্ষুদ্র ভারত আসমুদ্র-হিমাচল ভারত নামে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় লাভ করেছে মহাভারত-রচয়িতার বর্ণিত জাতীয় সমন্বয়ের কাহিনীতে। এক কথায় বলা যায়, ঐতিহাসিক সন্দর্ভ হিসাবে মহাভারত হল ভারতের প্রথম জাতীয় সংগঠনের ইতিবৃত্ত।

কিন্তু মহাভারত কি নিছক অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কাহিনীবহুল এক মহাকাব্য? যদি তাই হত, তবে মহাভারত গ্রন্থ শুধু ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটা সমাদরের সামগ্রীরূপে পরিগণিত হত। কিন্তু মহাভারত অতীতের একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের বা জাতিগত সমন্বয় ও সংহতির কাহিনী মাত্র নয়। মহাভারত বহু কাহিনীর, বহু বিভিন্ন বিষয়ের ও তত্ত্বের বর্ণনায় পরিপূর্ণ এক মহাগ্রন্থ। কখনো মনে হয়, মহাভারত ভারতের কথাসাহিত্যের এক সংকলন গ্রন্থ। এক যুগের বা দুই যুগের কথাসাহিত্য নয়। অতীতের বহু সহস্র বৎসর ধরে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সমাজ ও গোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষানুক্রমিকভাবে যেসকল রূপকথা ও উপকথা মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছিল, জাতি-স্মৃতির

(race memory) বাহক সেইসব কাহিনীও মহাভারতে স্থান লাভ করেছে। তার মধ্যে অজস্র অলৌকিকতা, অতিরঞ্জন, অশ্লীলতা এবং উদ্ভটরসের আতিশয্যও আছে। সংকলয়িতা সকল কাহিনীকে আর্যরুচিসম্মত একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন। অনেক কাহিনী আছে, যা মূলত আর্যসংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের কাহিনী ছিল না। কিন্তু সংকলয়িতা সেইসব কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের নাম-ধাম-পরিচয়কেও আর্যোচিত সংস্কার অনুযায়ী পরিবর্তন ক'রে বস্তুত ভারত কথাসাহিত্যের এক এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। এমন বিরাট সংকলন এক শতাব্দী ধরে বা কত শতাব্দী ধরে, এক জন সংকলয়িতার চেষ্টায় বা বহু সংকলয়িতার চেষ্টায় হয়েছে, তা পণ্ডিতের বিচার্য বিষয়। এর মধ্যে বিস্ময়কর শুধু সেই সংকলয়িতার প্রতিভা, যিনি সর্বভারতের বিভিন্ন সমাজের মধ্যে ঐতিহ্যপরম্পরায় প্রাপ্ত শত শত অলিখিত কাহিনীকে আর্যভাষা সংস্কৃতের উপযোগী রূপ ও অলংকার দিয়ে বস্তুত নূতন রূপ এবং ক্লাসিক বা সনাতন রূপ দান করলেন। সুতরাং মহাভারত গ্রন্থকে বিরাট জাতীয় সংগঠন ও ঐক্যসাধনের একটি পরিকল্পিত উদ্যোগের মত ব্যাপার বলে মনে হয়। সাহিত্যের ভিত্তিতে একটি প্ল্যানিং বা দেশের সকল বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও সমাজের সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা।

ভক্তের কাছে মহাভারত হল— 'ঈশ্বরের দ্বাপরীয় লীলার কাহিনী'। মহাভারতে বর্ণিত মূলকাহিনী অর্থাৎ কুরুপাণ্ডব-দ্বন্দ্বের কাহিনীতে এমন কোনো কোনো ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যার তাৎপর্য সাধারণত দুর্বোধ্য বলেই মনে হবে। পাণ্ডবদের অনেক কাজই ধর্মসংগত হয়েছে বলে মনে করবার হেতু পাওয়া যায় না এবং কৌরবদের অনেক কাজে মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ছোট-খাট এই ধরনের ঘটনা বাদ দিলে মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে পাণ্ডবেরা সত্যনিষ্ঠ এবং কৌরবেরা দম্ভের প্রতীক। মানুষের ইতিহাসে সত্য ক্ষমা ধৈর্য অহিংসা ও বিনয় বনাম রূঢ়তা দম্ভ মিথ্যা ও অক্ষমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত কোন্ পক্ষের জয় হয়, কুরুপাণ্ডব-সংঘর্ষে তারই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই সংঘর্ষে কৃষ্ণরূপে ঐশী শক্তিই ধর্মপুত্রের সহায় হয়েছেন। মিথ্যার বিনাশ ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেই কৃষ্ণ-ভগবান তাঁর দ্বাপরীয় লীলা প্রকট করেছেন। সত্যের জয়, মহাভারতের মূল কাহিনীতে প্রতিপন্ন এই তত্ত্ব যে নিগূঢ় আবেদন সৃষ্টি করেছে, তার প্রভাব আজ পর্যন্ত প্রতি সাধারণ ভারতীয়ের মনে প্রায় স্বভাবজ বিশ্বাস ও সংস্কার হয়ে উঠেছে। ভারতীয় চরিত্রের মূল প্যাটার্ন এই বিশ্বাসবাদের দ্বারাই গঠিত হয়েছে— যতোধর্ম স্ততো জয়। 'কাল্‌চার' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য দার্শনিকেরা যা বলে থাকেন সেটা হল, মনের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী অর্থাৎ ভাবনার বিশেষ প্রকৃতি (attitude of mind)। ভারতীয় ভাবনার বিশেষ প্রকৃতি ও প্রবণতা হল ঐশী শক্তির ওপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা। মিথ্যার পরাজয় হয়, সত্যের প্রতিষ্ঠা হবেই, দুর্বলকে ও পীড়িতকে পরিত্রাণের ভার ঈশ্বরই গ্রহণ করে থাকেন। এই বিশ্বাসবাদের দ্বারা মনের যে প্রবণতা ও প্রকৃতি ভারতের মানুষ লাভ করেছে তাই তার কাল্‌চারের বৈশিষ্ট্য। এই কাল্‌চার মহাভারতেরই দান।

লক্ষ্য করবার বিষয়, বেদব্যাসের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারত নামে মহাকাব্যগ্রন্থ বা পুরাণের সাহিত্যগত উৎকর্ষের ওপরেই মহাভারতের ক্লাসিক গুণ, শক্তি বা ঐশ্বর্য নির্ভর করে নেই। সংস্কৃত নামে রসালংকার সমৃদ্ধ যে ভাষায় মহাভারত রচিত হয়েছে, সে ভাষা ভারতীয় জনসাধারণের মুখের

ভাষা নয় এবং অধিকাংশই সে ভাষা জানে না ও বোঝে না। ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলের স্থানীয় মাতৃভাষায় মহাভারতের সকল উপাখ্যানই যে-ধরনের গদ্যে বা পদ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে, তার সাহিত্যগত উৎকর্ষ সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল মহাভারতের চেয়ে বেশি নয়। তবুও মহাভারতের কাহিনী ভারতের নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে প্রায় প্রাণের জিনিসের মত সহজগ্রাহ্য ও উপভোগ্য হয়ে আছে। এর থেকে এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, রসালংকারের জন্য নয়, বস্তুত কাহিনীর গুণেই মহাভারত সনাতন শক্তি লাভ করেছে। সত্যনিষ্ঠার যুধিষ্ঠির, পৌরুষের অর্জুন, উদারতার ভীষ্ম, দানের কর্ণ, দম্ভের দুর্যোধন, হিংসার শকুনি, বাৎসল্যের গান্ধারী, বিনয়ের বিদুর— মহাভারতের প্রত্যেক চরিত্রই এক-একটি মানবীয় মহত্ত্ব কিংবা হীনতার প্রতীক। আজও তো মানুষের সংসারে এই ধরনের ভাল-মন্দ চরিত্রের অভাব নেই; ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বেরও শেষ নেই। আজও সাধারণ মানুষের মধ্যেই কারও আচরণে যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কারও মনোভাবে দুর্যোধনের দম্ভ, কারও আচরণে বিদুরোচিত বিনয়। মহাভারতীয় নরনারীর জীবনে যে সুখদুঃখ, হাসি-অশ্রু এবং আশা-হতাশার দ্বন্দ্ব ও সমস্যা ছিল, তেমনি আজও আছে। তাই প্রাচীন মহাভারত আজও নতুন। মহাভারতের অজস্র কাহিনীর নায়ক-নায়িকার জীবনে যে আবেগ দ্বন্দ্ব ও মুক্তির প্রয়াস কীর্তিত হয়েছে, তার মধ্যে আজিকার মানুষ নিজেরই জীবনের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পায়। শুভশক্তি এবং অশুভশক্তির চিরদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই মানুষের ইতিহাস পথ করে নিয়ে চলেছে। এই দ্বন্দ্ববাদ আধুনিক বস্তুবাদী ঐতিহাসিকেরাও উপলব্ধি করে থাকেন। দৈবী ও আসুরী শক্তির সেই দ্বন্দ্বই শ্রেষ্ঠ পুরাণ মহাভারতে অজস্র কাহিনীর দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। মানুষের ইতিহাসে শুভ বনাম অশুভের সংঘর্ষ থামে নি, থামতে পারে না। এই দ্বন্দ্ব ইতিহাসের চিরন্তন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ব্যক্তির জীবন, সমাজের জীবন এবং জাতির জীবনও এক চিরন্তন কুরুক্ষেত্র— শুভে ও অশুভে নিয়ত সংঘাত চলেছে। এই সংঘাতে ব্যক্তিকে সমাজকে ও জাতিকে শুভশক্তিতে আশ্রিত হয়ে থাকতে হলে যে অটল বিশ্বাসবাদ এবং বলিষ্ঠ কর্মযোগের প্রেরণা প্রয়োজন, মহাভারত তারই আধার। তাই মহাভারত সাধারণ মানুষের জীবনেও সকল দ্বন্দ্বে ও সংকটে পথদ্রষ্টার মর্যাদা লাভ করেছে। মহাভারতের বাণী তাই সাধারণের মর্মলোকে চিরকালের সাথিত্ব ও সারথ্য লাভ করেছে। এই দিক দিয়ে বিচার ক'রে মহাভারতের কথাকে 'অমৃত সমান' বললে কোনো আলংকারিক অতিশয়োক্তি করা হয় না।

মহাভারতের মূলকাহিনী ছাড়া আরও শত শত উপাখ্যানে এই গ্রন্থ আকীর্ণ, তার মূল্য সহস্র বৎসরের প্রাচীনতার প্রকোপেও একটুকুও হ্রাস পায় নি। কারণ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কগত যেসব সমস্যা মহাভারতীয় উপাখ্যানগুলির মূল বিষয়, সেসব সমস্যা বিংশ শতাব্দীর নরনারীর জীবন থেকেও অন্তর্হিত হয় নি। নরনারীর প্রণয় ও অনুরাগ, দাম্পত্যের বন্ধন, অপত্য, বাৎসল্য, সখ্য, স্বার্থ ও বৃহত্তর পরার্থের দ্বন্দ্ব, সমাজকল্যাণের জন্য আত্মবলিদানের আবেগ, গুরুভক্তি, পিতৃভক্তি, সামাজিক সংহতি ও সৌষ্ঠব যেসব সংস্কারের ওপর মূলত নির্ভর করে, তার এক-একটি আদর্শোচিত ব্যাখ্যা এইসব উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকার জীবনের সমস্যার ভিতর দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। নহুষ যযাতি নল দময়ন্তী দুষ্মন্ত শকুন্তলা চ্যবন ভৃগু পুলোমা অগস্ত্য লোপামুদ্রা দেবযানী— শত শত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের যেসব কাহিনী মহাভারতে বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে এই বিংশ শতাব্দীর যে-কোনো মানুষ তাঁর নিজের

জীবনেরই সমস্যার রূপ দেখতে পাবেন। এই কারণেই শতেক যুগের কবিদল মহাভারত থেকেই তাঁদের রচনার আখ্যানবস্তু আহরণ করেছেন।

অতি পুরাতন হলেও মহাভারতের মত ক্লাসিক সাহিত্য আধুনিকের মনের পক্ষে কোনো বাধা নয়। মহাভারত 'পশ্চাদ্‌ধর্মী' নয়, কোনো দেশের ক্লাসিকই তা নয়। বরং ইতিহাসের ঘটনা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, চিন্তা ও শিল্পের সৃষ্টিতে রেনেসাঁস বা নবযুগের সঞ্চার আসে ক্লাসিক সাহিত্যের অনুশীলন থেকে। গ্রীক ও ল্যাটিন ক্লাসিক সাহিত্যের চর্চা য়ুরোপীয় রেনেসাঁসকে প্রাণবান করেছিল, পণ্ডিতেরা এই কথা বলে থাকেন। য়ুরোপের কথা ছেড়ে দিয়ে, আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের নবযুগের স্রষ্টাদের রচনার প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, ভারতীয় ক্লাসিক সাহিত্যের সমাদর তাঁদের রচিত কাব্য কথাসাহিত্য ও রম্যকলায় কি পরিমাণ রুচি ও শক্তি দান করেছে। বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্য-স্রষ্টা থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক সার্থক স্রষ্টা ভারতীয় ক্লাসিক সাহিত্যে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ আবার নতুন ক'রে ভারতীয় ক্লাসিক সাহিত্য অনুশীলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাতদন্ত কমিশন ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি যেসব প্রস্তাব করেছেন, তার মধ্যে ভারতের 'মহাভারতে'র কথাও বলা হয়েছে।[১]

অমৃত সমান যার কথা, সেই মহাভারত প্রত্নতত্ত্বের নির্জীব নিদর্শন নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরে মূল প্রসারিত করেছে মহাভারত। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাতদন্ত কমিশনের আর-একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারা যায়: মহাভারতের মত চিরায়ত সাহিত্যের অনুশীলনে 'অতীতে ও বর্তমানের মধ্যে আত্মীয়তার যোগ স্থাপিত হয়'।[২] অতীতের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করা পিছিয়ে পড়ার ব্যাপার নয়, ইতিহাসের চিরপ্রবহমান রূপের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা লাভ করা। মহাভারতীয় অতীত আজও সজীব হয়ে আছে ভারতীয় মানুষের সংস্কার ও সংস্কৃতিতে। আধুনিক ভারতীয়ের এই সৌভাগ্য যে, তার অতীত তার কাছে পিরামিড মাত্র নয়। ভগিনী নিবেদিতা সাধারণ ভারতীয় কৃষকের চোখে-মুখে একটি বিশেষ প্রকৃতির ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন: কত সহস্র বৎসরের চরিত্র মুদ্রিত হয়ে রয়েছে ঐ মুখের রূপে ও গঠনে। সাধারণ ভারতীয়ের মনটিও সহস্র বৎসরের ভাবনার ধাতু দিয়ে গড়া। নিজেকে বহুযুগের আগ্রহ বেদনা ও মমতার সৃষ্টি ব'লে যে উপলব্ধি করতে পারে, সেই তার সত্যিকারের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় লাভ করেছে বলা যায়। এই আত্মপরিচয়ের উপলব্ধি যার হয়েছে তারই চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব প্রকৃত বনিয়াদ পায়। সাহিত্যের দিক দিয়ে পুরাণ-মহাভারত ভারতবাসীর জন্য এই বনিয়াদ তৈরি করে রেখেছে।

মহাভারতকে ক্লাসিক সাহিত্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ক্লাসিক সাহিত্যের তুলনায় মহাভারত কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। এই মহাভারতই বস্তুত ভারতের সাধারণ লোকসাহিত্যে পরিণত হয়েছে। ভারতের কোটি কোটি নিরক্ষরের মনও মহাভারতীয় কাহিনীর রসে লালিত। ভারতীয়

---

১ 'The epics Ramayana and Mahabharata are rooted in India's culture but are not in any way fettered by it. They deal with problems of ethics and politics and are at the same time great literature. • • • They are not works of past, but through the translations in the several Indian languages are alive and active in the life of India.'

২ 'Comradeship is established between the past and the present.'

চিত্রকারের কাছে মহাভারত হল রূপের আকাশপট, ভাস্করের কাছে মূর্তির ভাণ্ডার। গ্রাম-ভারতের কথক ভাট চারণ ও অভিনেতা, সকল শ্রেণীর শিল্পী মহাভারতীয় কাহিনীকে তার নাটকে সংগীতে ও ছড়ায় প্রাণবান করে রেখেছে। মহাভারতের কাহিনী ও কাহিনীর নায়ক-নায়িকার চরিত্র ও রূপ ভারতীয় ভাস্কর স্থপতি চিত্রকর নট নর্তক ও গীতকারের কাছে তার শিল্পসৃষ্টির শতেক উপাদান, ভাব, রস, ভঙ্গী, কারুমিতি ও অলংকারের যোগান দিয়েছে। মহাভারত গ্রন্থ প্রতিশব্দ উপমা ও পরিভাষার অভিধান। মহাভারতের শত শত উপাখ্যানে নানা ঘটনায় ও প্রসঙ্গে যেসব দেবতাবন্দনা আছে, সেই বন্দনাগুলি কাব্যিকতায়, কল্পনাগুণে ও ভাষাগত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ একটি বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য, যার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ভারতের জ্যোতির্বিৎ মহাভারতীয় নায়ক-নায়িকার নাম দিয়েই তাঁর আবিষ্কৃত ও পরিচিত গ্রহ-নক্ষত্র-উপগ্রহের নামকরণ করেছেন। আকাশলোকের ঐ কালপুরুষ অরুন্ধতী রোহিণী চন্দ্র বুধ ও কৃত্তিকা, কতগুলি জ্যোতিষ্কের নাম মাত্র নয়—ওরা সকলেই এক-একটি কাহিনীর, এক-একটি প্রীতি ভক্তি ও রোমান্সের নায়ক-নায়িকা। গঙ্গা নর্মদা যমুনা ও কৃষ্ণবেণা—কতগুলি নদীর নাম মাত্র নয়, ওরাও কাহিনী। ভারতের বট অশোক শাল্মলী করবী অশোক ও কর্ণিকার উদ্ভিদ্ মাত্র নয়, তারাও সবাই এক-একটি কাহিনীর নায়ক এবং নায়িকা। নৈসর্গিক রহস্য ঐ মেরুজ্যোতির অভ্যন্তরে কাহিনী আছে, সামুদ্র বাড়ববহ্নির অন্তরালে কাহিনী আছে, সপ্তাশ্বযোজিত রথে আসীন সূর্যের উদয়াচল থেকে শুরু করে অস্তাচল পর্যন্ত অভিযানের সঙ্গেসঙ্গে কাহিনী আছে। মহাভারতীয় কাহিনীর নায়ক-নায়িকার নামই হল ভারতের শত শত গিরি পর্বত নদ নদী ও হ্রদের নাম। ভারতীয় শিশুর নাম-পরিচয় মহাভারতীয় চরিত্রগুলির নামেই নিষ্পন্ন হয়।

মহাভারত নামে একটি কাব্যকাহিনী ভারতের মানুষ থেকে আরম্ভ করে তার জল স্থল ও আকাশকেও পরিব্যপ্ত করে রেখেছে। এ এক বিস্ময়ের ব্যাপার। ভারতে রাজা ছিলেন, রাজদণ্ড ছিল, শাসন ও শাস্তির সংহিতাও ছিল। কিন্তু জনসাধারণের মনের রাজ্যে সম্রাট্ হয়ে ছিল মহাভারত নামে সাহিত্য। সভ্যতার ইতিহাসে একমাত্র ভারতবর্ষেই দেখা গিয়েছে যে, জাতি এক মহাকাব্যের প্রভাবে শাসিত ও লালিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ'। ভারতের ঐতিহাসিক রূপ তিনি সমগ্র অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মানুষের সংসারকে সুন্দর করার জন্য জ্ঞান ও রূপসৃষ্টির যে যুগযুগান্তব্যাপী ইতিহাসের ধারা ভারতভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে, সেই ইতিহাসের স্পর্শপূত ভারতের মৃত্তিকা সন্ন্যাসী ভারতীয়ের কাছেও স্বর্গ বলে বোধ হয়েছে। ভারতের ইতিহাস বা মহাভারতীয় রূপের পরিচয় যিনি পেয়েছেন, তিনিই প্রকৃত দেশপ্রেমী হতে পেরেছেন। দেশের ক্লাসিক সাহিত্য অনুশীলনের একটা প্রত্যক্ষ সুফল এই যে, দেশপ্রেমের পূর্ণবিকাশ সম্ভবপর হয়। তা না হলে হয় না। এমন নিগূঢ় ভাবে ভারততত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মনীষী শংকরাচার্যও বলতে পেরেছিলেন —'স্বর্গ চাই না, বরং সুরধুনী গঙ্গার জলে মীন মকর ও কমঠ হয়ে থাকতে চাই'।

ভারতের ইতিহাসই একটি তত্ত্ব। সামাজিক লৌকিক রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যসন্ধানের তত্ত্ব। এই ভারততত্ত্ব অনুশীলনের একটা নতুন প্রয়াস সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। ভারতীয় ক্লাসিক বা চিরায়ত সাহিত্যের প্রতি নতুন করে অনুরাগের উন্মেষ স্বাধীন ভারতের জনসাধারণের মনে কিছু কিছু লক্ষ্য করা

যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে এই প্রসঙ্গে দুটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে: শ্রীরাজাগোপালাচারী রচিত 'ভারতকথা' এবং পণ্ডিত জওহরলাল রচিত 'ভারতসন্ধানে'।

শ্রীরাজাগোপালাচারীর ভারতকথা হল বেদব্যাসকৃত মহাভারতের কাহিনীগুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও রূপ নতুন করে উপলব্ধির প্রয়াস। এই তত্ত্ব কখনো পুরনো হয় না, এই রূপও জীর্ণ হবার নয়। কবিকল্পিত সেই পৌরাণিক জগতের দধীচি আজ আর নেই, বৃত্রাসুরও নেই। কিন্তু জাগতিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় দধীচির আত্মদানের তত্ত্বকে আজও নিষ্প্রেয়োজন ও অকারণ বলে মনে হয় না। এবং সেই আত্মদানের রূপ আজও একটুকুও মূল্যহীন হয়েছে বলা যায় না। হোক সে কল্পনার দধীচি, কিন্তু সে যে আজকের পৃথিবীর দৈনন্দিন ইতিহাসের ওপরেও তার মহৎ প্রভাব সঞ্চার ক'রে চলেছে। তাই তো অতীতের, অথবা পৌরাণিকের, কিংবা কাল্পনিকের সৃষ্টি দধীচি চিরঞ্জীব হয়ে আছেন। ভারতকথার লেখক মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি উপাখ্যান এবং মূলকাহিনীরও এক-একটা বিশেষ ঘটনাসম্বলিত আখ্যান বিশেষ ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার এই বিশেষ ভঙ্গীটিই ভারতকথার প্রধান নূতনত্ব। লেখক কাহিনীগুলিকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যার প্রয়াস করেন নি। গুছিয়ে বললে কাহিনীর গঠন যে সৌষ্ঠব লাভ করে, ভারতকথায় বর্ণিত মহাভারতীয় গল্পগুলি সেই সৌষ্ঠব লাভ করেছে। সেই কারণেই গল্পের তাৎপর্যও স্পষ্টতর ভাবে পরিস্ফুট হতে পেরেছে। ভারতকথার লেখকের অভিনব সাফল্য এই যে, তাঁর বর্ণিত বিভিন্ন মহাভারতীয় আখ্যায়িকার অন্তর্নিহিত নৈতিক তত্ত্বগুলি খুবই প্রাঞ্জল প্রকাশ লাভ করেছে। কাহিনীর রস এবং কাহিনীর শিক্ষা, উভয়েরই সমান সংগতি থাকায় পাঠকের মনে যে অখণ্ড আবেদন সৃষ্টি করে, তাই হল ক্লাসিক সাহিত্যের বিশেষ প্রসাদ। শ্রীরাজাগোপালাচারী মহাভারতীয় কথাসাহিত্যের সেই ক্লাসিক গঠন ও রূপ অটুট রেখেই তার মধ্যে নতুন সারল্য ও প্রাঞ্জলতা সঞ্চার করতে পেরেছেন।

পণ্ডিত নেহরু তাঁর 'ভারতসন্ধানে' গ্রন্থে ভারততত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতম শিক্ষায় রুচিতে ও বিজ্ঞানে দীক্ষিত একটি মনের কাছে ভারতের ভিতর ও বাহিরের রূপ যেভাবে ধরা দিয়েছে তারই ব্যাখ্যা ও বর্ণনা। নেহরুর ভারত হল নবভারত, কিন্তু সে ভারত তার বিরাট ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অতি দূরাতীত ভারতের সমাজ ও সভ্যতার যেটুকু বিবরণ এবং নিদর্শন পাওয়া যায়, সিন্ধুনদের উপত্যকায় যে উপনিবেশের ভগ্নাবশেষ আজও মূক সাক্ষীর মত পড়ে রয়েছে, রহস্যাচ্ছন্ন সেই অধ্যায় থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতে আলোড়িত বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যকাল পর্যন্ত ভারত-সংসারের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ের পথে সন্ধানী পরিব্রাজকের মন নিয়ে লেখক তাঁর স্বদেশভূমি ভারতের রূপ ও আত্মার সন্ধান করেছেন; এক অসাধারণ অনুভূতিপ্রবণ অথচ যুক্তিনির্ভর শিল্পীমনের সন্ধিৎসা। অতীত ও আধুনিক ভারতের সব-কিছুকেই নেহরু নিঃসংশয়ে এবং নির্বিচারে সত্য বলে গ্রহণ করেন নি। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন, সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং প্রতিবাদও করেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভারত-জীবনের সেই ঐতিহাসিক মহাভারতীয় স্বরূপের আসল পরিচয়টুকুর সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেছেন, বিস্মিত মুগ্ধ ও শ্রদ্ধান্বিত হয়েছেন। পণ্ডিত নেহরু সাধক-সুলভ কোনো অতিনিগূঢ় মননশীলতা ও উপলব্ধির দাবি করেন না। তিনি আধুনিক ঐতিহাসিকের বিচার ও শিল্পীসুলভ আগ্রহ নিয়েই ভারতকে উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন। তবু 'ভারতসন্ধানে'র

পাঠকের পক্ষে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, নেহরুর শিল্পীমনের উপলব্ধিতে ভারতের যে ঐতিহাসিক রূপ ধরা দিয়েছে, সেটা সাধকের উপলব্ধিগত ভারতের আত্মিক স্বরূপ থেকে বেশি ভিন্ন জিনিস নয়। লেখক ভারতের ইতিহাসকে বিশ্ব-ইতিহাসেরই প্রকাশ রূপে উপলব্ধি করেছেন। প্রাচীন ভারতের ঋষি-কবিও তাঁর দেশভূমিকে ধরিত্রীরূপেই উপাসনা করেছিলেন। পণ্ডিত নেহরুও ভারতের বহুযুগব্যাপী ইতিহাসের মধ্যে মানবীয় আকাঙ্ক্ষার সেই পরিণামপ্রবণ গতি ও অভিব্যক্তির ধারাটি সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। নেহরু আজ পৃথিবীতে তাঁর আন্তর্জাতিকতার জন্য বিখ্যাত। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক ধারণায় তাঁর মন পরিপুষ্ট। তিনি নূতনের প্রতি আগ্রহশীল। অতীতের তুলনায় ভবিষ্যতের জন্যই তাঁর মমতা বেশি, বিশ্বাস বেশি। সেই নেহরুই বলেন, 'ভারত আমার শোণিতে রয়েছে'। মহামানবের পুণ্যতীর্থ ভারতের কবিও উপলব্ধি তাঁর স্বদেশের এই মহাভারতীয় রূপ করেছেন— 'আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর'। এই সুর যার অন্তর স্পর্শ করেছে তার ভারত-প্রেম বস্তুত বিশ্বমানবের প্রেমে পরিণতি লাভ করেছে। ভারতের ইতিহাস তার কাছে একটি তত্ত্ব এবং ভারত তার কাছে একটি দেশ বা স্বদেশ মাত্র নয়, ভাবত হয়ে ওঠে একটি 'আইডিয়া'।

জর্মান দার্শনিক হেগেল তাঁর 'আইডিয়া' নিয়ে সন্ধান আরম্ভ করেছিলেন। পণ্ডিত নেহরুও তাঁর 'আইডিয়া' নিয়ে সন্ধান আরম্ভ করেছেন: ভাব হতে রূপে পৌঁছবার সন্ধান। কিন্তু দুই চিন্তাশীলের সন্ধানের সাধনা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে শেষ হল, তাই লক্ষ্য করবার বিষয়। হেগেল তাঁর আইডিয়ার সার্থক ও বাস্তব রূপ দেখতে পেলেন জর্মান 'রাষ্ট্রে'র মধ্যে, পণ্ডিত নেহরু পেয়েছেন তাঁর মাতৃভূমি 'ভারতে'র মধ্যে। দুই সিদ্ধান্তে কত পার্থক্য।

সুবোধ ঘোষ

বাংলায় সংগীতের ইতিহাস। শ্রীমণিলাল সেন। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি-১৩ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বাঙালির অনেক গুণ ও যোগ্যতা থাকলেও সে আত্মভোলা। নিজস্ব সংস্কার ও প্রতিভার বৈশিষ্ট্য থাকলেও তার ধ্যান অস্থির একাগ্রতার অভাবে। কাব্য চিত্রবিদ্যা সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে পরের অনুকরণ ছেড়ে দিয়ে আত্মস্ফূর্তির দিন আগত। লেখক মণিলাল সেনের মতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বাঙালির প্রতিষ্ঠা দেখা দিয়েছে। গীত-বাদ্য-নৃত্যের অভিব্যক্তি প্রসঙ্গ করে তিনি ধারাবাহিক প্রমাণসমেত বাঙালির আত্মবিকাশের দিঙ্‌নির্ণয় করেছেন। মাত্র একশ সাতাশ পৃষ্ঠায় তিনি বাঙালির সংগীতপ্রতিভা সম্বন্ধে বিচিত্র সামাজিক ও ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করে শুধু বাঙালির নয় সমগ্র ভারতবাসীরও ধন্যবাদ অর্জন করলেন। কারণ এখনও ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস লেখা হয় নি। বহু দেশ ও জাতির পরিশ্রয় আচার-ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হলেও তার অন্তর্নিহিত প্রতিভা সংগীতের সুমহান ঐক্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে জৈন বৌদ্ধ ও বর্ণাশ্রমী মতবাদের অলোপনীয় ভেদবৈষম্যের মধ্যেও গান্ধর্ব্বের বন্ধন অক্ষয় ও অচ্ছেদ্য আছে। ভারতী বিচিত্রশব্দসম্পদশালিনী মহাজ্যোতির্ময়ীরূপে অনাদিকাল,

থেকে প্রতিভাত। ভারতীয় জাতির মধ্যে বাঙালি যদি তার নিজস্ব ধ্যান ও মানসপুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদবিক্ষেপ দিয়ে ভারতীর অর্চনা-পরিক্রমা করে গর্ব অনুভব করে তাতে ভারতীর গৌরব ও সমৃদ্ধি খর্ব করা হয় না। ভারতীর মহিমা ও বাঙালির গর্বকে বিচ্ছিন্ন করে দেখায় কিছুমাত্র সার্থকতা নেই। বরং সন্তান যখন মায়ের গৌরবের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে, মাত্র তখনই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। মণিলাল সেন এই পুস্তকের মধ্যে বাংলাদেশ ও বাঙালির ধ্যান-ধারণার পরিচয় দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের ঐক্যসূত্রের সন্ধানগুলিও আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। ধীর পাঠক-মাত্রই স্বীকার করবেন, সে চেষ্টা সফল হয়েছে।

গ্রন্থের ভাষা সহজ ও সরল এবং রচনায় নিপুণতার পরিচয় আছে। গ্রন্থকার বহুস্থলে অন্য গবেষকদের মত সমাদর করে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু মনে হয়, এ বিষয়ে বাহুল্যের কারণে তাঁর নিজের মত স্থানে স্থানে কিছু অপরিস্ফুট থেকে গিয়েছে। বক্তব্যের ভঙ্গিতে বুঝা যায়, বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের প্রতি তাঁর যেরূপ আগ্রহ দেখা যায় তাতে আশা করা যায় কোনও পরবর্তী সংস্করণে বিশদতর আলোচনা করে লেখক এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবেন।

কয়েকটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

উত্তরভারতের ধ্রুবপদ গীতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে তিনি অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। এসকলের মধ্যে একটি অনুল্লেখ আমাদের চোখে পড়ে, যথা— বৈজুবাওরা ও তাঁর শিষ্য গোপাল নায়কের কাহিনী। এই দুই ধ্রুবপদ শিল্পীর কথা খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর ইতিহাসে স্থান পায় নি। কিন্তু পরম্পরা-গত কিম্বদন্তীর মধ্যে এঁদের যেরূপ মর্যাদা করা হয়েছে তা থেকে মনে হয় সাধক বৈজুবাওরা ও পরবর্তী কালের হরিদাসস্বামীজি এবং নায়ক গোপাল ও পরবর্তীকালের মিয়া তানসেন, এই দুটি যুগলের মধ্যে কে বড় কে ছোট বাছাই করা শক্ত। গীতশিল্পী হয়েও সাধক বা স্বামীজির মযাদা আর কেউ পায় নি; নায়ক অথবা মিয়া উপাধিও আর কেউ পায় নি। এ পর্যন্ত সময়ে বৈজু, গোপাল, হরিদাসস্বামী ও তানসেনের রচিত গীতি ধ্রুবপদপদ্ধতিতেই গাওয়া হয়। পঞ্জাবে এখনও পর্যন্ত বৈজুবাওরা প্রবর্তিত গুরুশিষ্যপরম্পরা ও গীতসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দাবি করার যোগ্য ধ্রুবপদ গায়ক আছেন। মথুরানিবাসী বিখ্যাত ধ্রুবপদ শিল্পী চন্দনচোবেজি ঠিক একই রকমে হরিদাসস্বামীজি (বা হরিদাস ডাগুর যা থেকে 'ডাগুরবান্' রীতি নামকরণ হয়েছে) প্রবর্তিত বিশিষ্ট গুরুপরম্পরা ও সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও মর্যাদা দাবী করতেন। মন্দিরে বা নিভৃত আশ্রমে বিগ্রহের অর্থাৎ ঠাকুরের সম্মুখে ধ্রুবপদ ভজন প্রভৃতি গান করার প্রথা ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে। তার মধ্যে রাগ-রাগিণী, রস-ভাব ও বিশিষ্ট তাল দিয়ে রচিত নিবদ্ধ গীতই ধ্রুবপদ। তালের বৈশিষ্ট্য এই যে, চার তালের কমে ধ্রুবপদ হয় না; ধামার, সুরফাক্তা, ঝাঁপতালকে কখনও ধ্রুবপদ বলা হয় না। ধ্রুবপদের আসরে এদের মর্যাদা করা হয়েছে মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজের সংগতের কারণে। এসকল অত্যন্ত স্থূল কথা চোবেজি বিশ্বনাথজি গোঁসাইজির মুখ থেকেই শুনেছি। তাঁরাও এসকল কথা সংগীতের শ্রুতি বা কিম্বদন্তীরূপেই পালন-পোষণ করে এসেছেন। কিন্তু কিম্বদন্তী হলেই যে তা যুক্তিহীন হবে এমন মনে করা যায় না। বিশেষ এই যে, কিম্বদন্তী-নিরপেক্ষ ইতিহাস আলোচনা করে সংগীতের ইতিহাস চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম হবে।

তার কারণ জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তীর মধ্যে একটি শুভ সম্বন্ধ আছে; কিন্তু এদের সঙ্গে তথ্য-

কথিত নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রচেষ্টার সে রকম শুভ সম্বন্ধ নেই। কিম্বদন্তীর একটি নিজস্ব বিশিষ্ট ঐতিহ্য আছে, শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তাই এই ঐতিহ্যের মূল। জনশ্রুতি 'শোনা-কথা' মাত্র। ইতিহাসরচয়িতা টাকায় এক আনা (খুব বেশি করে ধরে) প্রত্যক্ষদর্শী; এবং তিনি পনের আনা শোনা কথার উপর যথামতি অনুমান প্রয়োগ করে ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ মূলে জনশ্রুতি, লোকমুখেই হোক বা লিখিতই হোক, না থাকলে ইতিহাসরচনাই সম্ভব হয় না। শোনা কথার মধ্যে যা কিছু সারবান্, যা কিছু শিষ্ট বা বিশ্বস্তজনের অনুমোদিত, যা কিছু জ্ঞানী শিক্ষিত ব্যক্তি গতানুগতিকভাবে স্বীকার করে অনুবাদ করেন, তাকেই কিম্বদন্তী বলে। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে সশ্রদ্ধ জ্ঞান বা বার্তা আহরণ করে সেই ব্যক্তিই কিম্বদন্তী আশ্রয় করে। এককথায়, মাত্র বিশেষজ্ঞের মুখের কিম্বদন্তীই নির্ভরযোগ্য ও সার্থক; 'শিষ্টাঃ কিংবদন্তী'। অন্য দিকে তথাকথিত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সর্বদাই শঙ্কাকুল; অধিকন্তু তার নিরপেক্ষতাই 'bonafides' নষ্ট করে দেয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আইন-ই-অকবরী গ্রন্থের প্রণেতা আবুলফজল-ই-অল্লামীর সাংগীতিক গবেষণা[১]। সংগীতের বিষয় উত্থাপন করেই তিনি অধ্যায়বিভাগ করেছেন; অধ্যায়বিভাগটি অর্থাৎ নামকরণ হয়েছে 'সংগীত-রত্নাকর' নামে খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত সংগীত গ্রন্থের পরপর অধ্যায়বিভাগ অনুযায়ী। রত্নাকর ছাড়া অন্য কোনও সংগীতগ্রন্থে এরূপ অধ্যায়বিভাগ নেই, অথচ ঐতিহাসিক মহোদয় শার্ঙ্গদেবের নামও করেন নি। তার কারণ এই, তিনি সংগীত-রত্নাকর বা অন্য গ্রন্থ পড়েন নি; রাজসভা বা মন্ত্রিসভার কোনও পণ্ডিতের কথা শুনে সেই শোনা কথার ভিত্তির উপর গবেষণা করে গিয়েছেন। অধ্যায়সজ্জার সঙ্গেসঙ্গে তিনি যে প্রকরণ প্রসঙ্গ করেছেন তা থেকে প্রমাণ হয়, তাঁর সংবাদদাতা নিজেই 'সংগীতদর্পণ' 'সংগীত-রত্নাকর' এবং সম্ভবতঃ ছিটেফোঁটা জনশ্রুতি— এই তিনটে মিশিয়ে ঐতিহাসিকের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। একারণে আমি ঐ রাজকীয় ঐতিহাসিকের চেষ্টাকে গবেষণা বলেছি। আইন-ই-অকবরীর যেসকল পাঠক ভরতের নাট্যশাস্ত্র, মতঙ্গের বৃহদ্দেশী, সংগীত-মকরন্দ, সংগীত-রত্নাকর ও সংগীতদর্পণ গ্রন্থগুলি পড়েননি তাঁরা সরল মনে জনাব আবুলফজল-ই-অল্লামীর বক্তব্য ও বর্ণনাকে ভারতীয় সংগীতের নিরপেক্ষ ইতিহাসের অংশবিশেষ বলে মনে করতে পারেন্। বস্তুত এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নেই।

তারপর আবুলফজল-ই-অল্লামী যে ভাবে দেশী সংগীত প্রসঙ্গে ধ্রুবপদ গীত ও তার রূপ বর্ণনা করেছেন, তাতে করে কোনও সংগীতজ্ঞ পাঠক মনে করতে পারেন, ঐতিহাসিকপ্রবর সংগীতে কৃতকর্মা বা জ্ঞানী ছিলেন অথবা তিনি অন্য কোনও বিশেষজ্ঞের বা সহৃদয় ব্যক্তির নিকট সংগীতের তথ্য আহরণ করেছিলেন। বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে পাখোয়াজের কথা থাকলেও মৃদঙ্গের নাম পর্যন্ত নেই; অথচ তার আগে সংগীতের প্রবন্ধাধ্যায়ে সংগীত-রত্নাকরে উল্লিখিত মেদিনী আনন্দিনী দীপণী ভাবণী তারাবলী নামে প্রবন্ধের পূর্বতন জাতিভেদ উল্লেখ করে, এবং নীতি সেনা কবিতা বা চম্পূর উল্লেখ না করে তথ্যাহরণে উদ্ভটতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 'নটুয়া'দের হাতে পাখোয়াজ দিয়েছেন, অথচ তাদের

১ আইন-ই-অকবরী; অনুবাদক কর্ণেল এইচ. এস. জ্যারেট, এসিয়াটিক সোসাইটি বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত; ১৮৯৪ সাল, কলিকাতা।

দিয়ে ধ্রুবপদ গান করান নি। দরবারে পাখোয়াজ ব্যবহৃত হত কি না, এবং তাতে 'আটা' চড়ানো হত কি না এবং পাখোয়াজেই বা কিরূপ তাল বাজান হত, সেসম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। 'হুড়কিয়া ও ঢাড়ী' নামে পথচলতি পেশাদারদের উপর তিনি 'কড়খা' (কিরকে?) নামক প্রচারগীত এবং ধ্রুবপদ গীতের ভার দিয়েছেন, কিন্তু সংগতের জন্য তাদের হাতে পাখোয়াজ দেন নি, দিয়েছেন তাৎকালিক ঢাড়া নামে বাদ্য, যার বর্ণনা নেই! ঢাড়ী স্ত্রীলোকদের দিয়েও ধ্রুবপদ গান করিয়েছেন। এবং সংগতের জন্য দিয়েছেন 'ডফ্' ও 'ডুহুল' (ঢোল?)। তিনি মাত্র 'যন্ত্র' এই আখ্যা দিয়ে এমন একটি বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা করেছেন যা শাস্ত্রে জনশ্রুতিতে ও কিম্বদন্তীতে অনাদিকাল থেকে 'বীণা' নামে খ্যাত হয়ে এসেছে; অথচ 'বীণা' নামোল্লেখ করে যে বাদ্যযন্ত্র বর্ণনা করেছেন তাতে দিয়েছেন মাত্র তিনটি তার; এবং 'কিন্নর' শুধু এই নামটি দিয়ে যে বাদ্যযন্ত্রবর্ণনা করেছেন, তাতে দিয়েছেন মাত্র দুটি তার। বিশ্বাস করে নিতেই হবে তাঁর সামনে কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র ছিল এবং অন্য কোনও ব্যক্তি তাঁকে ঐসকল নাম শিখিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গেসঙ্গে অনুমান করতে হবে উক্ত রাজপুরুষ ঐতিহাসিক মহোদয় শাস্ত্র কিম্বদন্তী বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেন নি। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস লিখতে বসে কিম্বদন্তীকে অবহেলা করে রাজকীয় ঐতিহাসিক কতখানি আবিষ্কারশক্তি প্রয়োগ করতে পারে, আবুলফজল-ই-অল্লামীর লিখিত সংগীত বিষয়ক প্রস্তাবগুলি পাঠ করলেই তা বুঝা যায়।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক যখন বলেন (পৃ ৪৫, শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অনুবাদ) পেশাদার নট-নটীরা পথে পথে ঘুরে যে গান করত সেই শ্রেণীর বা সেই ঢংএর গানকেই বক্সু প্রভৃতি গায়কবিশেষ ঘষেমেজে সাজিয়ে রাজাবাদশাহের দরবারে ধ্রুবপদ গীতরূপে প্রচার করেছিল, তখন আমি বুঝি আবুলফজল-ই-অল্লামী সংগীতবিষয়ে যথার্থই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক, কারণ তাঁর সময়ের বহু পূর্ব থেকে ভারতে যে রাগালাপ ও রাগবদ্ধগীতের সাধনা হয়ে এসেছে, নাট্যশাস্ত্র প্রমুখ সংগীতগ্রন্থগুলির মধ্যে নাট্য ও গান্ধর্ব্য বিষয়ে যে ধারাবাহিক শ্রৌতবার্তা প্রচারিত হয়েছে, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে ভারতীয় সংগীতের যে সমৃদ্ধি সূচিত হয়েছে, সাধক বৈজু বাওরা, হরিদাস স্বামী, গোপলনায়ক যে ধরনের গীতি রচনা ও গান করে কিম্বদন্তীতে অমর হয়ে আছেন, এবং মীরাবাই ও অন্য বহু ভক্তিমান গীতরসিক ব্যক্তিরা মন্দিরে নিভৃত আশ্রমে দেবাদিদেব শম্ভু শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে শান্ত বীর ও শৃঙ্গার রসের পদ রচনা ও গান করে ভারতীয় রাগশিল্পকে প্রকারান্তরে রক্ষণ-পোষণ করে এসেছেন, এসবই জনাব আবুলফজলের নিকট নিরর্থক ও অমূলক কিম্বদন্তী মাত্র, অতএব অগ্রাহ্য। তবুও তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, সন্দেহ নেই। কারণ পথে ঘাটে নট-নটী বা মুসলমান ঢাড়ীদের পরিচয় নিয়েছিলেন, তাদের গানও শুনেছিলেন, এবং তাদের মেয়েরা বাদশাহ ও মন্ত্রীদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ঢোলক বাজিয়ে গান করে এবং রাণীমহোদয়া থেকে আরম্ভ করে অন্তঃপুরের চাকরানী পর্যন্ত স্ত্রীগোষ্ঠীর চিত্তবিনোদন করে এসকল সাংগীতিক সংস্কৃতির সংবাদ রাখতেন নিশ্চয়ই। এ রকম প্রত্যক্ষ তাৎকালিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পরে তিনি একটি সুতীক্ষ্ণ অনুমান-বাণ দিয়ে বাদশাহের দরবারের তানসেন বাজবাহাদুর প্রমুখ গীতশিল্পীদের প্রচেষ্টা ও নট-নটী ঢাড়ীদের গীতপ্রচেষ্টাকে বিদ্ধ করে দিলেন। কেন দিলেন? সম্ভবত ঐ দুরকমের গীতের মধ্যে তিনি কিছু সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছিলেন। সাদৃশ্য আবিষ্কার করা একেবারেই আশ্চর্য নয়। মনীষী জন্‌সন্ নাকি গীতবাদ্য ও কোলাহল-কলরবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম

সাদৃশ্য আবিষ্কার করে বলেছিলেন 'music is the least disagreeable noise'! অতঃপর আবুলফজল সাহেব অনুমান করলেন, যেমন ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ হয়, সেরকম নট-নটী-ঢাড়ীদের গীত সংস্কৃত হয়ে ধ্রুবপদে পরিণত হয়েছে। এককথায় নট-নট-ঢাড়ীদের গীত ও দরবারী গীত একই জাতি, কেবল মাজাঘষার অভাবে নটদের গান কিছু মোটা, দেশোয়ালী ও অসংস্কৃত; এবং মাজাঘষার কারণেই দরবারী গীত চিকন, শহুরে ও পরিপাটি। কোন্ অদ্ভুত সংস্কার দিয়ে গীতকে মাজাঘষা করলে দরবারের যোগ্য হয় ও তানসেনের মুখে উঠে, সেই সংস্কার প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে অথবা অকস্মাৎ তানসেন-বাহাদুরের মস্তিষ্কে আবির্ভূত হয়েছিল, এবং নট-নটীদের মধ্যেই বা ঐ সংস্কারটি দেখা দেয় নি কেন— এসকল বিষয় অনুসন্ধান করা নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিকের কর্তব্য নয়; অতএব এদিকে তাঁর দৃষ্টি যায় নি। অথবা দৃষ্টিপাত করলেই সেই পুরানো অমূলক কিম্বদন্তীর নরক উদ্ঘাটিত হতে পারে এই ভয়ে আত্মরক্ষার কল্পে তাঁর দৃষ্টি সংযত করে থাকবেন। তিনি নট-নটীদের সংগীত ও দরবারী মার্জিত সংগীত সম্বন্ধে একান্তই সমদর্শী ছিলেন, কারণ তানসেনের গীত বা রচিত একটি পদের একটি চরণও উদ্ধৃত করার যোগ্য মনে করেন নি। একেই বলে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা।

জনাব আবুলফজল-ই-অল্লামীর পর অনেকদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও (অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত) দিল্লী আগ্রা লাহোরের প্রান্তবর্তী বস্তির মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের 'ঢাড়ী' ও 'মেড়াসি' সারেঙ্গী ও ঢোলকের সংগতে দেশোয়ালী গান গেয়ে, পথে ঘুরে অথবা বিয়েবাড়িতে খুচরা জলসার বায়না নিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। যাঁরা 'folk-song' তালাশ করেন তাদের জন্য একটি সংবাদ দিলাম। বারাণসীতে এখনও কথ্থক নট-নটীরা হিন্দুগৃহস্থের ভিতর ও বাইরে বাড়ীর উঠানে সেই প্রাচীন সারেঙ্গী ও ঢোলক কোমরে নিয়ে দাঁড়িয়ে, বসে, নেচে, গান গেয়ে আসর জমায়। পাকাপাকি ও সাক্ষাৎভাবে গত চল্লিশ বছর থেকে এদের মুখে 'পুরবী' 'শাওন' 'ঘাটো' 'ধূন্' 'গজল' প্রভৃতি দেশোয়ালি গীত শুনে এসেছি এবং আনন্দও পেয়েছি। অন্যদিকে, এবং মাত্র দুচারটি দৃষ্টান্ত সাপেক্ষ, বিশ্বনাথজি, চন্দনচোবে, গোঁসাইজি, মহিমবাবু, ভূতনাথবাবু, এণ্টালির হরিবাবু, প্রভৃতি বিশিষ্ট গীত-শিল্পীদের মুখে—বৈজুবাওরা রচিত 'প্রথম মণিওঁকার, দেবনমণি মহাদেব, জ্ঞাননমণি গোরখ, নদীনমণি গঙ্গা' (জয়জয়ন্তী চৌতাল), ও 'যাকে বৈজয়ন্তীমালা তাকে মৃগছালা, যাকে মুরলী অধর ডমরু তাকে কররে' (কৌশিকীকানাড়া চৌতাল), অথবা হরিদাসস্বামীজি রচিত 'চন্দন খোর অঙ্গ চড়ায়ে আবীর লিয়ে এঁডো এঁডো ডোলত পনঘট হোঁ আপন মন ভায়ে' (হরদাসীসারঙ্গ-চৌতাল) অথবা—তানসেন রচিত 'শ্যামসো ঘনশ্যাম উমড ঘুমড আয়ো, মন্দ মন্দ মুরলীতান গগন ঘোর ঘহরাই' (শ্রীরাধিকার বিরহোন্মাদবিষয়ক পদ—গৌড়মল্লার-চৌতাল) ও 'রুম ঝুমভর আয়েরি নয়ন তিহারে' (শ্রীরাধিকার বিরহ দর্শনে সখির উক্তি—বেহাগ-চৌতাল) অথবা—শ্রীআনন্দ কিশোর রচিত 'মোকো তো তিহারো ভরোসো মেরো শ্রবণসুনো সুযশ তেরো মনমে বসসুখ হোত মিটতদ্বন্দ্ব' (খাম্বাজ-চৌতাল) প্রভৃতি ধ্রুপদ গীতরূপ শুনেও শ্রবণ ও মন সার্থক করেছি। দেশোয়ালীগান ও এসকল গান শুনে মনে হয়েছে—তেলাপোকার নিজস্ব সৌন্দর্য আছে; পাখিরও নিজস্ব সৌন্দর্য আছে; এবং তেলাপোকা ও পাখির পাখাও আছে। কিন্তু তেলাপোকা পাখি হতে দেখিনি, শুনিওনি। জনাব আবুলফজল-ই-অল্লামীর মতে যদি তাঁর সময়ে অকস্মাৎ ঐরকমের অতিচার (mutation) হয়ে থাকে তাহ'লে খুবই আশ্চর্য বলতে হবে। আমি নিজে

বীরবলের 'কিস্‌সা' অথবা 'রাজারাম-তানসেন-রায়প্রবীণ-শ্বেতহস্তী' বিষয়ে কিম্বদন্তী বিশ্বাস করতে প্রস্তুত আছি কিন্তু ঐরকম অত্যুদ্ভট প্রগতি স্বীকার করতে অক্ষম।

প্রসঙ্গত বলা যায়, বৈজুবাওরা ও গোপাল নায়ক সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী শুনেছি। সেগুলি জনশ্রুতি নয়; ধ্রুবপদগীতের বিশেষজ্ঞেরাই গুরুশিষ্য পরম্পরায় সেগুলি বহন করে এনেছেন। বৈজুবাওরার সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ধ্রুবপদ গায়কের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি পাঞ্জাবী হিন্দু। বৈজুবাওরার কোনও কোনও পদে 'কহে বৈজুবাওরে শুনহো তানসেন' ইত্যাদি রকমের ভণিতা পাওয়া যায়। এ থেকে সন্দেহ হয়, বৈজুবাওরা ও তানসেন হয়ত সমসাময়িক। কিন্তু উক্ত বৃদ্ধ গায়কটি ঐ রকমের ভণিতায় ঘোর আপত্তি করেন এবং বলেন তাঁদের সম্প্রদায়ে ঐ রকমের পদ গাওয়া হয়না; কারণ ওগুলি জাল বা নকল। এই সম্প্রদায়মতে বৈজুবাওরার প্রসিদ্ধ শিষ্য গোপাললাল উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ; প্রতিষ্ঠার উচ্চ শিখরে উঠে তিনি গুরু বৈজুকে অস্বীকার করেছিলেন বলে তাঁর প্রতিভা ও যশ ক্ষীণ হয়েছিল। গোপাল লাল ধ্রুবপদ রচনা করেছিলেন এবং ধ্রুবপদ গান করতেন।

বৈজুবাওরা, হরিদাসস্বামী, গোপাল—এই তিনজন এখনও কিম্বদন্তীর প্রবাহে ভাসমান আছেন। রাজকীয় ঐতিহাসিকেরা এখনও এঁদের আবিষ্কারের যোগ্য মনে করেনা। কিন্তু কিম্বদন্তীর স্রোত ও গতি অনিবার্য এবং ইতিহাসের অগ্রগামী হয়ে চলে। সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থের টীকাকার শ্রীকল্লিনাথ ঐ গ্রন্থের প্রবন্ধ-অধ্যায়ের টীকার অবসরে জনৈক গোপাল নায়কের উল্লেখ করেছেন। রত্নাকরের প্রকাশক শ্রীমঙ্গেশ তিলঙ্গের সুচিন্তিত মতানুসারে কল্লিনাথ খৃঃ চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই টীকা রচনা করেছিলেন। সোমনাথ কৃত রাগবিবোধ গ্রন্থ খৃষ্টীয় ১৬০৯ সালে রচিত হয়। সোমনাথ কল্লিনাথের উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, গোপাল নায়ক যে একজন বিখ্যাত গীতবিশারদ ছিলেন তা'তে সন্দেহ নেই। শ্রীরাধামোহন সেন স্বরচিত 'সঙ্গীততরঙ্গ' নামে বাংলাভাষার গ্রন্থে (সন ১২২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত) আলাউদ্দিন বাদশা, আমির খসরু ও নায়ক গোপাল সম্বন্ধে কৌতুকপ্রদ কিম্বদন্তী বর্ণনা করেছেন। তা থেকে মনে হয় আমীর খসরু প্রণীত 'তোফাৎ-উল-হিন্দ' নামক কোনো গ্রন্থই ঐ উল্লেখের উৎস। অর্থাৎ সেন মহাশয়ের মতে স্বয়ং আমির খসরুই 'তোফাৎ-উল-হিন্দের' প্রণেতা। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন লিখিত সাম্প্রতিক প্রবন্ধের মতানুসারে মির্জা খাঁ ইবন ফকরুদ্দিন মহম্মদ নামে সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিই তোফাৎ-উল-হিন্দের প্রণেতা। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় এই গ্রন্থ দেখেছেন। অতএব রাধামোহন সেন বোধ হয় ভুল করে থাকবেন। শুনেছি, মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এই গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এখন, এই গোপাল নায়ক, অর্থাৎ ধ্রুপদ শিল্পী প্রসিদ্ধ গোপাল, উত্তর ভারতীয় অথবা দক্ষিণ ভারতীয় ব্যক্তি, অথবা ঐ একই নামে দুজন লোক আবির্ভূত হয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ উঠে। কারণ শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় 'ভারতীয় সঙ্গীতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা' নামে প্রবন্ধে গোপালকে দক্ষিণভারতীয় ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এবং 'বাঙালীর গান' রচয়িতা শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ও গোপালনায়ককে দক্ষিণদেশীয় বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনও প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় নি। রাধামোহন সেন মহাশয় ও কল্লিনাথ গোপালের জন্ম-জাতির উল্লেখ করেননি। অন্যদিকে বৈজুবাওরা সম্প্রদায়ের কিম্বদন্তী অনুসারে ধ্রুবপদসাধক গোপাল উত্তরভারতীয় ব্যক্তি। সাধারণ গায়ক-বৃন্দের জনশ্রুতিতেও গোপাল উত্তরভারতীয় ব্যক্তি। এমনকি আমি শুনেছি গোপাল গৌড়দেশীয় লোক

ছিলেন। আন্দাজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশটি ধ্রুবপদ গোপালের ভণিতায় গাওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি উত্তরভারতে প্রচলিত হিন্দিভাষায় রচিত। গীতির মধ্যে ভৈঁরো কৌশিক হিণ্ডোল দীপক মল্লার ও রেসালা এই ছয়টি রাগ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়; এবং প্রত্যেকের ছয়টি করে ভার্যা এরূপ সামান্য মন্তব্যও পাওয়া যায়। শিব দুর্গা গোপীনাথ মধুসূদন ভবানী প্রভৃতি দেবতাবাচক শব্দ এবং ধারু-ধ্রুবপদ, ছন্দ-প্রবন্ধ-চতুরঙ্গ-ত্রিবট-তেলানা-ঝুমরা প্রভৃতি গীতরূপবাচক শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোনও শব্দ পাওয়া যায় না যা একমাত্র দক্ষিণভারতে বিশিষ্ট বাচকরূপে প্রচলিত। কয়েকটি গীতির মধ্যে বৈজুবাওরা নামের উল্লেখ দিয়ে গুরু-বন্দনা সূচক ভণিতাও শুনেছি। এরূপ ক্ষেত্রে কিম্বদন্তী স্বীকার করে ধ্রুবপদসাধক গোপাল উত্তর ভারতীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং হরিদাসস্বামীও তানসেনের পূর্ববর্তী ছিলেন এরূপ অনুমান সংগত মনে করি। এতে করে দক্ষিণ ভারতীয় কোনও গোপালকে অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু এই দক্ষিণ ভারতীয় জনৈক গোপালই একমাত্র গোপাল ও ধ্রুবপদসাধক, এরূপ মনে করায় সংগত আপত্তি আছে।

এই প্রসঙ্গে বাংলাভাষায় লিখিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থের কথা এসে পড়ে। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীরাধামোহন সেন বিরচিত 'সঙ্গীততরঙ্গ' নামে আদ্যোপান্ত পদ্যগ্রন্থই সর্বপ্রথম; যদিও অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট শুনেছি এ থেকেও প্রাচীনতর গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উক্ত সঙ্গীত-তরঙ্গ এবং সুষঙ্গাধিপতি ৺ মহারাজ রাজসিংহ বিরচিত ও তস্য প্রপৌত্র রাজা শ্রীকমলকৃষ্ণ সিংহ কর্তৃক সন ১২৯৭ সালে প্রকাশিত 'রাগমালা' নামে পুস্তিকা— দুইখানি পদ্যগ্রন্থ। গ্রন্থকার মণিলাল সেন বাংলা ভাষায় রচিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থের একটি তালিকা সন্নিবেশিত করে দিলে ভাল হ'ত।

বাংলা ভাষার গ্রন্থ ও রাগ-রাগিণী নামের প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার লক্ষ্য হয়েছে। পূর্বকাল থেকে গীতিরচনার শিরোদেশে রাগ-রাগিণী নাম নির্দেশ করার প্রথা চলে এসেছে এ বিষয়ে লেখক মণিলাল সেন প্রাচীন তথ্য উদ্ধার করেছেন। বাংলাদেশে খৃস্টীয় উনিশ শতকের গীত-রচনার শিরোদেশে প্রায়ই 'সিন্ধু-ভৈরবী' 'বেহাগ-খাম্বাজ' 'মুলতানি-ধানশী' প্রভৃতি যুগল নামের আবির্ভাব দেখা যায়। বাংলার বাইরে অন্যত্র এরূপ দেখা যায় না। বাঙ্গালী গীতি-কার, গীত-শিল্পী ও সমজদারের কানে যে গীতরূপটি বেহাগ ও খাম্বাজের মিশ্র, অথবা পিলু ও বরবার মিশ্র বলে লাগে বাংলার বাইরে সেইরূপগুলি এখনও 'খাম্বাজ' 'বা' পিলু নামে চালু আছে দেখা যায়। বাংলার এরূপ অনুভব-সূক্ষ্মতার কারণ সম্ভবত এই যে বাঙালি, বিশেষ করে শিক্ষিত শৌখীন শ্রেণীর বাঙালি, যেরূপ আগ্রহ করে ধ্রুবপদ ও রাগবন্ধ গীতের চর্চা করেছে সেরূপে ভারতে আর কোথাও হয়নি। সেই বাঙালি যখন শোরী হমেদম মস্তবুল-বুলের টপ্পা চর্চা ক'রে টপখেয়াল ও খেয়ালের দিকে মন দেয় তখন তার কাণে কিছু কিছু পূর্বানুভূত রাগরূপ এবং টপ্পা প্রভৃতির মিশ্র রাগরূপ পৃথক বলে দেখা দেয়। বলা উচিত মনে করি, আজকের দিনের যেসকল বাঙালি রাগশিল্পী ও শ্রোতা ইতিপূর্বের বিশুদ্ধ জয়জয়ন্তী বা কেদারার ধ্রুবপদগত বিশিষ্ট অভিব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত নয়— তাঁদেরই সামনে আধুনিক খেয়ালশিল্পীরা জয়-জয়ন্তীর নামে দেশ-গারা-কাফির খিচুড়ী অথবা খাম্বাজের নামে— খাম্বাজ-তিলঙ্গ-বেহাগ-মাণ্ডএর অথবা কেদারার নামে— কেদারা-মল্লার-শ্যামের মিশ্র বস্তু পরিবেশন করে পদক সংগ্রহ করে দেশে ফিরে যাবেন, তাতে আশ্চর্য কি।

লেখক মণিলাল সেন লোচন পণ্ডিত প্রণীত রাগতরঙ্গিনী গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন, ভারতের মধ্যে বাংলাদেশই সর্বপ্রথম সংগীত শাস্ত্র প্রচার করেছে এবং লোচন পণ্ডিত নামধেয় গৌড়দেশবাসী ব্যক্তি ভারতে সংগীতশাস্ত্রের সর্বপ্রথম আচায। মন্তব্যটি বিচারসহ হলে বড়ই গৌরবের কথা হত। সংগীত বলতে যদি গীত-বাদ্য নৃত্যের উৎকর্ষ বুঝায়, শাস্ত্র বলতে যদি ঋষি-কল্প, বিশেষজ্ঞদের সমাদৃত শাসন-সংস্কারমূলক গ্রন্থ বুঝায়, এবং আচায বলতে সম্প্রদায়প্রবর্তক, অথবা সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব ও প্রয়োগের ব্যাপারে তাৎকালিক সব চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিকে বুঝায়—তা'হলে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র প্রাচীনতম সংগীতশাস্ত্র, কারণ এর মধ্যে গীতবাদ্য নৃত্যের উৎকর্ষ প্রচারিত হয়েছে, এবং এই নাট্যশাস্ত্রকে উত্তরকালীন সমস্ত সংগীতগ্রন্থ প্রণেতা শাস্ত্র বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতের পরবর্তী সমস্ত সংগীত ব্যাখ্যাতা মহামুনি ভরতকে আচার্য বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু কেউ তাঁকে সংগীতশাস্ত্রের আচার্য বলেননি, কারণ শাস্ত্রের আচার্য হয় না, শাস্ত্রের সংগ্রহকর্তা হয়, প্রণেতা হয়, প্রবক্তা হয়, উপদেষ্টা হয়; এবং সম্প্রদায়েরই আচার্য হয়। সম্প্রদায় নেই আচার্য আছেন এরূপ হয় না। কোনও একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করে আচার্য নাম লাভ হয় না। এমন কি, শার্ঙ্গদেব নিজরচিত সংগীত রত্নাকর গ্রন্থকে শাস্ত্র মনে করেন নি; এবং পরবর্তী কোনও টীকাকার শার্ঙ্গদেবকে আচার্য বলেন নি; যদিও ভারতীয় নাট্য শাস্ত্রের পরে এত বিশদ ও সুন্দর গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। এই গ্রন্থে সবশুদ্ধ ৪৬৮৪ শ্লোক আছে। গীতবাদ্য নৃত্য বিষয়ে প্রকরণ পরিপাটীর তুলনা হয় না। তবুও শার্ঙ্গদেব কোনও বিশিষ্ট প্রাচীন সম্প্রদায়কে অনুবর্তন করেন নি এবং নিজেও কোনও সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন নি। এ কারণে তাঁকে আচার্য মনে করা যায় না। তবে তাঁর প্রণীত গ্রন্থকে সংগীত অর্থাৎ গীতবাদ্য নৃত্যের শাস্ত্র বলতে কিছুমাত্র অসংগতি হয় না।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র একটি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বা শিল্পবিজ্ঞান শাস্ত্র। মহামুনি ভরতই এর প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে ভরতের শতপুত্রের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলি ভরতের ঔরসপুত্র নয় এবং এককালীন শিষ্যশাবকও নয়; কারণ নাট্যশাস্ত্রের প্রকরণারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত কোনও অধ্যায়ে বা উপদেশ প্রসঙ্গে, কোনও তত্ত্ব বা প্রয়োগপ্রসঙ্গে বা অন্য কোনও প্রয়োজনে এদের নাম ব্যবহৃত হয় নি। বস্তুত এগুলি ভারতীয় নাট্যসম্প্রদায়ের পরম্পরাপ্রসূত আচার্যদের নাম। প্রাচীন আস্তিক্যবাদী সম্প্রদায়ে এককালে একজনের বেশী দুজন আচার্যের স্বীকার নেই। এবং পূর্বপূর্ব আচার্যদের নাম স্মরণ করা প্রত্যেক উত্তরকালীন আচার্যের অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য হত। মহামুনি ভরতাচার্যের পর উত্তরোত্তর একশত আচার্য আবির্ভূত হয়েছিল। সম্ভবত সকলের শেষ আচার্যই নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় ও সংক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক ইতিহাস সঙ্কলনের কর্তা। পরে ঐ সম্প্রদায় ব্যবহারিক ভাবে লুপ্ত হয়ে গেলে আচার্য লোপ হয়েছিল। কিন্তু শাস্ত্র নষ্ট হয়নি; অর্থাৎ গীতবাদ্য নৃত্যনাট্য প্রভৃতির তত্ত্ব ও প্রয়োগগুলি বিচ্ছিন্ন ও ইতস্তত প্রকীর্ণ হলেও—তাদের ঐকান্তিক লোপ হয়নি। বহুদিন পরে অনুমান হয়—অশ্বঘোষপ্রণীত 'বুদ্ধচরিত' নামক কাব্যের কিছু পূর্বে এবং নিশ্চিত ভাবে রামায়ণ মহাকাব্যের সঙ্কলনের পূর্বে নাট্যশাস্ত্রের আধুনিক আকারে সঙ্কলন হয়েছিল। এ বিষয়ে বহুমুখী প্রমাণ থাকলেও বাহুল্য হবে বলে এখানে তার আলোচনা করব না। তবে এইমাত্র বলা যায়—ভারতীয় সম্প্রদায়ের লোপসাধন হয়ে গিয়ে কাশ্যপ, দুর্গাশক্তি, দত্তিল প্রভৃতি শাস্ত্রব্যাখ্যাতারা আবির্ভূত হয়েছিলেন;

এবং এঁদেরও কিছু পরে মতঙ্গ 'বৃহদ্দেশী' নামে অভিনব প্রস্তাবনা করেন। যেরকমেই হোক, খৃষ্টপূর্বেই ভারতীয় সম্প্রদায় ও আচার্যদের লোপ হয়ে গিয়েছিল। এরূপ স্থলে বল্লাল সেনের সময়কার 'রাগতরঙ্গিণী' ভারতে সর্বপ্রথম সংগীতশাস্ত্র, এবং তার প্রণেতা লোচন পণ্ডিত ভারতে সংগীত শাস্ত্রের সর্বপ্রথম আচার্য মনে করতে পারিনে। লোচন পণ্ডিত কোনও সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেছিলেন কিনা, অন্য কোনও পরবর্তী সংগীত বিশারদ বা গ্রন্থকার তাঁকে আচার্য বলে স্বীকার করেছিলেন কিনা, এসকল বিষয়ে মণিলাল সেন বা ক্ষিতিমোহন সেন কিছু বলেন নি।

বিশেষ এই যে, আমার কছে লোচনপণ্ডিত প্রণীত 'রাগতরঙ্গিণী' আছে। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের বক্তব্য পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। তবে কি গৌড় দেশে দুজন সংগীতজ্ঞ লোচন পণ্ডিত দুখানি রাগতরঙ্গিণী লিখে গিয়েছেন ? আমার কাছে যে 'রাগতরঙ্গিণী' আছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, যথা—গ্রন্থখানি দরভাঙ্গা রাজপ্রেস থেকে প্রকাশিত তাঃ সম্বৎ ১৬৬১ দশহরা। পণ্ডিত বলদেব মিশ্র এর সম্পাদন করেছেন। গ্রন্থারম্ভে "ওঁ নমস্তস্যৈ। অথ রাগতরঙ্গিণী॥" এবং শেষে "ইতি শ্রীলোচনশর্মা বিরচিতায়াং রাগতরঙ্গিন্যাং রাগসংস্থানাদিকথন্নাম পঞ্চমস্তরঙ্গঃ॥ সমাপ্তঃ॥" লিখিত আছে। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় যে পুষ্পশ্লোকের বিচার করেছেন এই গ্রন্থে সেরূপ কিছু নেই। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক বলদেব মিশ্র মুখবন্ধে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির আবিষ্কারের কথা বলে, পাণ্ডুলিপির রূপ বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন—গ্রন্থকার লোচন শর্মা খৃষ্টীয় পনের শতাব্দীর চতুর্থভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যাপতি রচিত কয়েকটি পদ আছে। তাদের মধ্যে একটিতে গিয়াসুদ্দিন সুলতানের প্রশস্তি আছে যথা—চিরঞ্জিবেঁ জীবথু গ্যাসদিন সুরতান। তাছাড়া শিব সিংহ ও লছিমা দেবীর প্রশস্তি সূচক ভণিতাও আছে। লোচন পণ্ডিতের স্বরচিত পদও আছে, এবং তার মধ্যে রাজা মহিমানাথের প্রশস্তি আছে। গ্রন্থে রাগরাগিণীর ধ্যান আছে, কিছু সংস্কৃতে কিছু তাৎকালিক মৈথিলী ভাষায়। মণিলাল সেনকে অনুরোধ করি এই লোচনকৃত রাগতরঙ্গিণীর আলোচন করেন। এর মধ্যে বাদ্য বা নৃত্যের তত্ত্ব ও তথ্য নেই। পুস্তকের রাগতরঙ্গিণী নাম সার্থক কারণ আগাগোড়াই রাগবিষয়ে তথ্য আছে। গ্রন্থকার লোচন কোনও সম্প্রদায় প্রবর্তন করেননি, অথবা কোনও সম্প্রদায়বিশেষের বার্তা বহন করেননি। গতানুগতিক ভাবে আবহমান সাংগীতিক কিছু কিছু তত্ত্ব শ্লোকে লিখে গিয়েছেন। 'হনুমন্ত' মতের রাগরাগিণীর নাম-ধ্যান বর্ণনা করেছেন, কিন্তু হনুমন্ত কে বা কখন আবির্ভূত হয়েছিলেন কিছু বলেননি। রাগশ্রেণীকরণ বিষয়ে বারোটি সংস্থান মাত্র বর্ণনা করেছেন ; জনক-জন্য মেল চিন্তা করেন নি। এ থেকেও প্রমাণ হয় যে জনক-জন্য মেলের প্রথম উদ্ভাবক রামামাত্য (খৃস্টীয় ১৫৫০) থেকে লোচন পূর্ববর্তী। আমি যতদূর খবর রাখি, রামামাত্যই কোনও মুসলমান সংগীতজ্ঞের এবং সুলতানের অনুপ্রেরণায় প্রথমে 'ঠাট' পদ্ধতি (অথবা সংস্কৃতে 'জনক-জন্য মেল') উদ্ভাবন করেছিলেন ; এই 'ঠাট' (সেতারে পর্দা সাজানর কায়দা বিশেষ) পদ্ধতি ভারতীয় প্রাচীন রাগশ্রেণীকরণের পক্ষে একেবারেই বিজাতীয়। যাই হক গ্রন্থখানি (১৩৬ পৃষ্ঠার) শাস্ত্র নামের যোগ্য নয়। তবে সংস্কৃত শ্লোকে কিছু তথ্য লিখতে পারলেই যদি শাস্ত্র রচনা হয়, এবং কোনও রকমে তাতে গান-বাজনা সংক্রান্ত কথা থাকলেই যদি সংগীত প্রস্তাবনার মর্যাদা দেওয়া হয়—তাহ'লে অবশ্যই এই গ্রন্থ 'সংগীতশাস্ত্র' মনে করতে হবে।

মণিলাল সেন ধ্রুবপদ রচনা ও গায়ক সম্বন্ধে অনেক কিছু সুন্দর কথা বলেছেন। কিন্তু বেতিয়ার রাজা শ্রীআনন্দকিশোর এবং বাংলার স্বনামধন্য শ্রীযদুভট্টের প্রসঙ্গ করেননি। বৈজু-হরিদাসস্বামী প্রভৃতির পরে যথার্থ ধ্রুবপদ গানের পদ রচয়িতাদের মধ্যে আমি এই দুজনকে শ্রেষ্ঠ মনে করি, যদিও এঁরা আধুনিক যুগের ব্যক্তি। মণিলাল সেনকে আমি কিছুমাত্র দোষ দিইনে, কারণ আধুনিক ভারতের রাগশিল্পী রাগের ধ্রুবপদবন্ধনের মাহাত্ম্যই ভুলে যাওয়ার চেষ্টায় আছে এবং বাঙ্গালী ধ্রুবপদশিল্পী নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার করেই কুলিয়ে উঠতে পারছেনা, পরের কথা পরে। বিশ্বনাথরাও কিছুকাল বেতিয়ায় ছিলেন ; ওস্তাদ মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবও বেতিয়ায় ছিলেন। বিশ্বনাথজির মুখে আনন্দকিশোর রচিত সুন্দর সুন্দর ধ্রুবপদ শুনেছি এবং এর বার্তা বাংলায় প্রচারিত হয়েছে (১৯১২ থেকে ১৯১৫ সাল)। মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের শিষ্যদের কর্ণে আনন্দকিশোরের বার্তা পৌঁছায়নি একথা আমি ভাল করেই জানি। আবার বিশ্বনাথজি অ-বাঙ্গালি হয়েও যদুভট্টের রচিত গীতের ভূয়সী প্রশংসা করতেন এবং যদুভট্টের পদও গান করতেন। যদুভট্টের ত্রিপুরায় থাকা কালের অনেক ও বিশ্বাসযোগ্য কীর্তিকলাপ বিশ্বনাথজি ও রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ গীতশিল্পী নগেন্দ্র ভট্টাচার্যের মুখে শুনেছি। কিম্বদন্তী বাদ দিয়ে মাত্র প্রত্যক্ষ শ্রবণের অভিজ্ঞতা অনুভবের মাপকাটিতে বিচার করে আনন্দকিশোর ও যদুভট্টের রচিত গীত রূপ গুলিকে কোনও অংশে বৈজুবাওরা প্রভৃতি সাধকদের রচিত গীতরূপ থেকে নিকৃষ্ট মনে করতে পারেনি। এবং এখনও পারিনে, কারণ কিছুদিন হল আমাকে মোটামুটি দেড় হাজার ধ্রুবপদ গীতরূপ—গীতিমাত্র নয়—পরীক্ষা করতে হয়েছিল। আনন্দকিশোর ও যদুভট্টের বিশেষ প্রচার হয়নি ; সম্ভবত একারণে যে তাঁরা পূর্বের চর্বিত চর্বণ না করে নিজ রচিত পদ গান করতেন।

মণিলাল সেন 'মার্গ'সঙ্গীত প্রসঙ্গে সারবান কথা দিয়ে কীর্তন গীতকে 'মার্গ'-পর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 'মার্গ' ও 'দেশী' শব্দদুটির বহুল ও অযুক্তিযুক্ত ব্যবহার দেখে মনে হয়—ঐ দুটি শব্দ বর্জন করাই ভাল। কেন মনে হয় নিবেদন করি।

গীত বাদ্য নৃত্য সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত প্রাচীনতম বলে স্বীকৃত—ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে গান্ধর্ব্য বা সঙ্গীতকে উপলক্ষ করে মার্গ-দেশী-ভেদ প্রস্তাব করা হয় নি। মুদ্রিত বা প্রকাশিত সঙ্গীতগ্রন্থাবলীর মধ্যে মতঙ্গ প্রণীত 'বৃহদ্দেশী' নামক গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ঐ শব্দদুটি ও শ্রেণী-করণ পাওয়া যায়। বেদানুবর্তী সঙ্গীতের বার্তায় অথবা 'শিক্ষা' জাতীয় গ্রন্থেও মার্গ-দেশী প্রস্তাবনা নেই। 'বৃহদ্দেশী' নাম থেকেই বুঝতে হবে গ্রন্থের মধ্যে 'দেশী' তত্ত্ব ও তথ্য আলোচিত হয়েছে। 'দেশী' বিষয়ক তথ্যের মধ্যে ও প্রথমে যাজ্ঞিক বা বৈদিক চৌরাশী মূর্চ্ছনা তান ঘটিত ব্যাপার, পরে ভারতীয় গান্ধর্ব্যের আঠারটি জাতি প্রকরণ, এবং শেষে লোকে প্রচলিত কতকগুলি রাগরূপই মতঙ্গমুনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

তত্ত্ব প্রসঙ্গে আরম্ভেই মতঙ্গ 'মার্গ' ও 'দেশীর' ভেদ বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। 'মার্গ' প্রস্তাবনার নির্গলিত অর্থ এই, গীতশিল্পী সাধকের আত্মগত এমন একটি ধ্বনি আছে যা কণ্ঠে বা যন্ত্রের সাহায্যে বাইরে অভিব্যক্ত হতে চায় না, এবং মাত্র আত্মস্থ ব্রহ্মসত্তাকেই 'মৃগয়া' বা অনুসন্ধান করে। 'নাদ' নামক স্বরের সূক্ষ্ম উপকরণ দিয়েই এই মৃগয়ার পথ আবিষ্কার করা যায়। নাদকে অনুভব করার সামর্থ্য বা যোগ্যতা না হলে—'মার্গ'সঙ্গীতের পন্থা লভ্যই হয় না। এক কথায়—গীত বাদ্য নৃত্য উপভোগ বা সাধনা করার অবসরে—আত্মার মধ্যে বুদ্ধি মন প্রভৃতির introversion বা বিবর্তন না হলে মার্গসঙ্গীতের স্বরূপ

উপলব্ধ হওয়া অসম্ভব। ফলে—আত্মমুখী মার্গসাধনা কখনও অন্য শ্রোতা বা প্রেক্ষকের উপভোগ্য হ'তে পারে না। নিজছাড়া—মার্গসঙ্গীতের শ্রোতাও নেই, প্রেক্ষকও নেই।

অন্যপক্ষে, সেই একই আত্মগত ধ্বনি বা 'নাদ' যখন প্রাকৃত, বহির্মুখী পরিণাম ও অভিব্যক্তি লাভ করে, দেশ-কাল-পাত্রভেদে নানারূপ প্রত্যক্ষ, উপভোগ্য, গীত-বাদ্য-নৃত্যে বিকসিত হয়, তখন সেই পরিণামাভিব্যক্তরূপকে 'দেশী' বলে। এক কথায়, অভিব্যক্ত সংগীতপ্রচেষ্টা মাত্রই 'দেশী'। বলাই বাহুল্য—অভিব্যক্ত সংগীত প্রচেষ্টার সঙ্গেই সামাজিক মানুষের নানাবিধ কামনা, প্রবৃত্তি ও স্বার্থ জড়িত থাকে। অতএব 'বৃহদ্দেশী' নামে প্রস্তাবনার সার্থকতা।

মতঙ্গের বহুকাল পরে, (খৃস্টীয় ১২৪৭ সালে) শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকর নামে অপূর্ব সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মার্গ-দেশী ভেদ স্বীকার করেও—মতঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে নিজস্ব প্রস্তাব সমুপস্থাপিত করেছেন। তাঁর সুস্পষ্ট মতটি যথা—

পুরুষার্থের সম্যক্ অভ্যুদয়কে মৃগয়া করে এমন সংগীত অর্থাৎ গীতবাদ্যনৃত্যই 'মার্গ'। পুরুষার্থের, অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের, সাধনার চরম বা শেষ ফলই সেই সেই সাধনার 'অভ্যুদয়'। যথা—ধর্মানুগত হয়ে, পুরুষার্থের উত্তম সাধনা করে যে কর্ম আত্মায় সঞ্চিত হয়—তার অভ্যুদয় বা ফল স্বরূপে 'স্বর্গভোগ' লভ্য হয়। শার্ঙ্গদেবের স্পষ্টোক্তি থেকে বুঝা যায়—সংগীতের অভিব্যক্তি—অনভিব্যক্তিত্ব দিয়ে দেশী-মার্গ ভেদ সিদ্ধ নয়। যথা, তাঁর কথায়—

> গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।
> মার্গো দেশীতি তদ্দ্বেধা তত্র মার্গঃ স উচ্যতে॥
> যো মার্গিতো বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ।
> দেবস্য পুরতঃ শম্ভোর্নিয়তাভ্যুদয়প্রদঃ॥

অর্থাৎ—গীত বাদ্য নৃত্য এই তিনকে একত্রে সংগীত বলা হয়; সেই সংগীত মার্গ ও দেশীভেদে দ্বিবিধ। তাদের মধ্যে মার্গ সংগীত বলা হচ্ছে যথা—যে সংগীত নিয়ত অভ্যুদয়প্রদ এবং সেই হেতু ব্রহ্মা প্রভৃতি ব্যক্তিরা যাকে মৃগয়া করেছিলেন[২] ও ভরত প্রভৃতি ব্যক্তিরা যাকে দেবাদিদেব শম্ভুর সম্মুখে প্রয়োগ করেছিলেন তাকেই মার্গ সংগীত বলে। এক কথায় অভ্যুদয়প্রাপ্তিই যার চরম ও লক্ষ্য সেই সংগীতই 'মার্গ'। সংগীত অন্তর্মুখী কিম্বা বহির্মুখী এরূপ তর্কের অবসরই নেই। এর পরেই শার্ঙ্গদেব দেশীর সংজ্ঞা দিয়েছেন, যথা—

> দেশে দেশে জনানাং যদ্রুচ্যা হৃদয়রঞ্জকম্।
> গানং চ বাদনং নৃত্যং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ যে গান, বাদন ও নৃত্য দেশে দেশে মাত্র রুচি-সাপেক্ষ হয়ে লোকের চিত্ত বিনোদন করে তাকে দেশী অভিহিত করা হয়। প্রকারান্তরে—কোনও অভ্যুদয়কামনা করে দেশী সংগীত প্রবর্তন করে না; রুচি অনুযায়ী হয়ে চিত্তবিনোদন মাত্র কামনা করেই দেশী সংগীত ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রবর্তিত হয়।

---

২ চতুর্বেদের মধ্যে অন্বেষণ করেছিলেন ইতি টীকাকারের অভিপ্রায়

মতঙ্গ যাকে 'মার্গ' বলে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন—শার্ঙ্গদেব তাকে অনাহত নাদের পর্যায়ভুক্ত করে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন যথা—

তত্রস্যাৎ সগুণধ্যানাদ্ ভুক্তি র্মুক্তিস্তু নির্গুণাৎ ॥
ধ্যানমেকাগ্রচিত্তৈকসাধ্যং ন সুকরং নৃণাম্ ॥
তস্মাদত্র সুখোপায়ং শ্রীমন্নাদমনাহতম্ ॥
গুরুপদিষ্টমার্গেণ মুনয়ঃ সমুপাসতে ॥
সোহপি রক্তিবিহীনত্বান্ন মনোরঞ্জকোনৃণাম্ ॥

অর্থাৎ তত্র (অনাহত ও আহতের প্রসঙ্গে)—নাদের সগুণধ্যান দিয়ে ভোগমাত্র লাভ হয়; কিন্তু নির্গুণ-ধ্যান দিয়েই মুক্তি লাভ হয়। ধ্যান ব্যাপারটিই একাগ্রচিত্তসাধ্য; সে হেতু সাধারণ মানুষের সুকর নয়। সে কারণে—মুনিরা অর্থাৎ নিভৃতাশ্রমবাসিরা গুরুপদিষ্ট পন্থা অবলম্বন করে, সেই সুখের উপায়স্বরূপ শ্রীমান্ অনাহত নাদ (বা ব্রহ্মের) উপাসনা করেন। তাহলেও সেই মার্গ অনুরাগবিহীন বলেই সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করে না।[৩]

শার্ঙ্গদেবের পর থেকে আজ পর্যন্ত সংগীত বিষয়ক গ্রন্থে যা কিছু মার্গ দেশী প্রস্তাব দেখা যায়—তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় না বক্তা উক্ত দুই মতের কোনটি গ্রহণ করেছেন, নাকি নিজ মত প্রকাশ করেছেন। যদিই বা নিজমত প্রকাশ হল, সেই মতকে কোনও রকম যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা দেখা যায় না। কিন্তু শব্দ দুটি আঁকড়ে ধরে থাকবার বিলক্ষণ চেষ্টা আছে। সম্প্রতি 'মার্গ' ও ইংরাজি ক্লাসিকাল শব্দ একার্থে ব্যবহার হচ্ছে। এতে কোনও ক্ষতি বা লাভ নেই। কারণ শব্দটিও তার প্রারম্ভিক অর্থ ও ইঙ্গিত থেকে অনেকখানি বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। নানা বিড়ম্বনা ভোগ করার পর সম্প্রতি ইউরোপ ক্লাসিকাল তথা রোমান্টিক 'অথবা' সেক্রেড Sacred তথা প্রোফেন Profane নাম-শ্রেণীকরণের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতিস্থ হওয়ার চেষ্টায় আছে।

মণিলাল সেন স্বরান্তর সাধন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন—তাতে একমত হতে পারলাম না।[৪] কারণ ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে স্বরান্তর সাধন, অথবা যোগ্যতর শব্দ 'নামান্তরস্বরতা' উপদিষ্ট হয়েছে প্রয়োজনের বশে। প্রয়োজন যথা—গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠপ্রযত্নের সামর্থ্যভেদে এবং বাদিত্রকরণ অর্থাৎ অর্কেষ্ট্রাইজেশনের বিশিষ্ট উদ্দেশ্যভেদে স্বরপ্রয়োগে নামান্তরবিধান অবশ্য কর্তব্য। বিশেষ এই যে স্বর কখনও অন্তরিত হয় না। কিন্তু তার নাম ও সম্বন্ধই অন্তরিত বা পরিবর্তিত হয়; একারণে নামান্তরস্বরতাই যথার্থ বৈজ্ঞানিক শব্দ; 'স্বরান্তর' শব্দ দিয়ে ওরূপ অর্থ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ—scale change এর প্রতিশব্দ 'নামান্তর সাধন' স্বরান্তর সাধন নয়। আমাদের দেশে ঐ অর্থে ঐ শব্দটি কে চালু করেছেন আমার জানা নেই। কিন্তু কাজ ভাল হয় নি।

বাংলার বাইরে কীর্তন গানের অনাদর প্রসঙ্গে লেখক বলতে চেয়েছেন—কীর্তন গানের

৩ অথবা সেই অনাহত নাদ অনুরাগ বিহীন বলেই সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করে না। এই অর্থ সমীচীন বলে বোধ হয় না; কারণ—অনাহত নাদকে সুখ বা নিত্যসুখের উপায় স্বরূপ বলা হয়েছে। অনুরাগ বর্জিত সুখ বা নিত্য সুখ প্রাপ্তি অসম্ভব।

প্রাদেশিকতাই অনাদরের হেতু। কথাটি বুঝা গেল না। বাংলার বাইরে কেউ যদি বাংলা ভাষা না বুঝে, ইংলণ্ডের বাইরে কেউ যদি ইংরাজি ভাষা না বুঝে অথবা বাঙ্গালী যদি হরিদাস স্বামীজির পদ না বুঝে তবে কি সে সব ভাষা বা পদের প্রাদেশিকতা-দোষ? লেখক জানেন, বাঙালি হিন্দি ভাষার ধ্রুবপদ, পাঞ্জাবি ভাষার টপ্পা প্রভৃতি চর্চা করেছে। যথার্থ কথা এই কীর্তনগীতির মধ্যে সূক্ষ্ম রসভাবের যে দ্যোতনা আছে তাকে বাংলার বাইরে প্রাদেশিক মনোভাবগ্রস্ত ও স্বল্পানুভবী শ্রোতা বুঝতেই পারে না। বস্তুত প্রাদেশিক কে বা কারা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। কীর্তনগান বা গীতকে তর্কের খাতিরে প্রাদেশিক মনে করলে পৃথিবীতে এমন একটি ভাষা বা গীত পাওয়া যায় না যা প্রাদেশিক নয়। যদি কোনও কালে সারা জগতের জন্য একটি অপ্রাদেশিক ভাষারূপ উদ্ভাবিত হয়—এবং সেই ভাষায় সম্পূর্ণ অপ্রাদেশিক গীত রচিত হয় তাহলেও পৃথিবীর সমস্ত লোক সেই গীত বা ভাষা উপভোগ করবে কি না—যথেষ্ট সন্দেহ হয়। 'রাগ' বা 'melody' উপভোগ করতে হলে মাত্র সুষ্ঠু নির্দোষ শ্রবণেন্দ্রিয়েরই প্রয়োজন। কিন্তু গীত উপভোগ করতে হ'লে—অধিকন্তু ভাষা বুঝবার ক্ষমতা থাকা চাই, এবং ভাব ধ্বনি ও রস গ্রহণ করার যোগ্যতাও অর্জন করা চাই। আমাদেরই বাংলাদেশে সকলেই কি কীর্তনগীত উপভোগ করার যোগ্যতা রাখে?

বাংলাদেশের লোক হয়েও বাঙালী কতখানি অপ্রাদেশিক, লেখক মহর্ষি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যযোজনার প্রসঙ্গেই উদাহরণ দিয়েছেন। সঙ্গীতের প্রচেষ্টায় বাঙালি শিল্পী বাংলার বাইরে থেকে কতখানি সংগ্রহ করেছে তার অন্য জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত উদয়শঙ্করের পরিকল্পনা বৈচিত্র্য, তবে আপনাপন সংস্কার ও প্রতিভা অবহেলা করে বাইরের অনুকরণ করাই অবনতির লক্ষণ। এই আত্মাবমাননা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে নিজ দেশের মর্ম ও নিজ সমাজের ঐতিহ্য আলোচনা করা উচিত। মণিলাল সেন মহাশয়ের পুস্তক এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে থাকল সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহের বিষয়ে তিনি সুষ্ঠু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। আশা করি ভবিষ্যৎ কোনো সংস্করণে তিনি বিশদতর আলোচনা করে বাংলার সঙ্গীতের ইতিহাসের উৎকৃষ্টতম অংশের উপর আলোকপাত করবেন।

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৫৭

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

শ্রীঅরবিন্দ

প্রতিকৃতি
১৩১৪ ?

১৫ আগস্ট ১৮৭২ - ৫ ডিসেম্বর ১৯৫০

কারামুক্তির পর

বৈশাখ ১৩১৬

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৫৭

স্বাক্ষর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি
পথ-চাওয়া নয়নের বাণী।

২

বইল বাতাস, পাল তবু না জোটে—
ঘাটের খাণে নৌকো মাথা কোটে।

৩

কাছে থাকি যবে ভুলে থাকো,
দূরে গেলে যেন মনে রাখো।

৪

যে বন্ধুরে আজো দেখি নাই
তাহারি বিরহে ব্যথা পাই।

৫

হে বনস্পতি, যে বাণী ফুটিছে
পাতায় কুসুমে ডালে—
সেই বাণী মোর অন্তরে আসি
ফুটিতেছে সুরে তালে।

The same voice that finds form in leaves
and flowers
sings and dances in my life.

৬

বসন্ত, আনো মলয়সমীর,
ফুলে ভরি দাও ডালা—
মোর মন্দিরে মিলনরাতির
প্রদীপ হয়েছে জ্বালা।

Bring thy south breeze, Spring,
fill the basket with flowers.
For in my house the lamp has been lit
for the meeting of love.

৭

আকাশের চুম্বনবৃষ্টিরে
ধরণী কুসুমে দেয় ফিরে।

The sky rains kisses.
The Earth returns it in flowers.

৮

আঁধার নিশার
গোপন অন্তরাল,
তাহারি পিছনে
লুকায়ে রচিলে
তারার ইন্দ্রজাল।

From behind the screen of night
You spread the magic of your stars.

৯

ক্ষণকালের গীতি
চিরকালের স্মৃতি।

The song is for a few moments,
its memory is for long days.

১০

বেদনার অশ্রু-উর্মিগুলি
গহনের তল হতে রত্ন আনে তুলি।

On the shore smile gems
thrown up by anguished waves of tears.

ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার

শ্রীরাজশেখর বসু

সকল লোকেরই কথায় ও আচরণে নানাপ্রকার ভঙ্গী থাকে। এই ভঙ্গী যদি ব্যক্তিগত লক্ষণ হয় এবং অনর্থক বার বার দেখা যায় তবে তাকে মুদ্রাদোষ বলা হয়। যেমন লোকবিশেষের তেমনই জাতি বা শ্রেণী বিশেষেরও মুদ্রাদোষ আছে। দক্ষিণ ভারতের পুরুষ লজ্জা জানাবার জন্য হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। সকৌতুক বিস্ময় প্রকাশের জন্য ইংরেজ শিস দেয়। অনেক বাঙালী নবযুবক পথ দিয়ে চলবার সময় কেবলই মাথায় হাত বুলোয়— চুল ঠিক রাখবার জন্য। অনেক বাঙালী মেয়ে নিম্নমুখী হয়ে এবং ঘাড় ফিরিয়ে নিজের দেহ নিরীক্ষণ করতে করতে চলে— সাজ ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য। বাঙালী বৃদ্ধদেরও সাধারণ মুদ্রাদোষ আছে, অবৃদ্ধরা তা বলতে পারবেন।

জাতি বা শ্রেণী বিশেষের অঙ্গভঙ্গী বা বাক্যভঙ্গী এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। আমাদের ভাষায় সম্প্রতি যেসকল মুদ্রাদোষ ও বিকার বিস্তারিত হচ্ছে তার সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করছি।

বাংলা ভাষার একটি প্রধান লক্ষণ জোড়া শব্দ, রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছেন শব্দদ্বৈত। 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশী, অন্য আর্য ভাষায় তত নহে।' তিনি সংস্কৃত থেকেও উদাহরণ দিয়েছেন— গদ্‌গদ, বর্বর, জন্মজন্মনি, উত্তরোত্তর, পুনঃপুনঃ, ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা শব্দদ্বৈত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা— মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, হাড়ে হাড়ে— এগুলি পুনরাবৃত্তি বাচক। বুকে বুকে, কাঠে কাঠে— পরস্পর সংযোগ বাচক। সঙ্গে সঙ্গে, পাশে পাশে— নিয়তবর্তিতা বাচক। চলিতে চলিতে, হাসিয়া হাসিয়া— দীর্ঘকালীনতা বাচক। অন্য অন্য, লাল লাল, যারা যারা, ঝুড়ি ঝুড়ি— বিভক্ত বহুলতা বাচক। টাটকা টাটকা, গরম গরম, নিজে নিজে— প্রকর্ষ বাচক। যাব যাব, শীত শীত, মানে মানে— ঈষদূনতা মৃদুতা বা অসম্পূর্ণতা বাচক। পয়সা টয়সা, বোঁচকা বুঁচকি, গোলা গুলি, কাপড় চোপড়— অনির্দিষ্ট প্রভৃতি বাচক।

হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও অল্পাধিক শব্দদ্বৈত আছে। বিদেশীর দৃষ্টিতে এই রীতি ভারতবাসীর মুদ্রাদোষ। শুনেছি, সেকালে চীনাবাজারের দোকানদার সাহেব ক্রেতাকে বলত, টেক টেক নো টেক নো টেক, একবার তো সী। একজন ইংরেজ পর্যটক লিখেছেন, মাদ্রাজ প্রদেশে কোনও এক হোটেলে হুইস্কির দাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর পেয়েছিলেন— টেন টেন আনা ওআন ওআন পেগ। বিদেশীর কাছে যতই অদ্ভুত মনে হ'ক, শব্দদ্বৈত আমাদের ভাষার প্রকৃতিগত এবং অর্থপ্রকাশের সহায়ক, অতএব তাকে মুদ্রাদোষ বলা যায় না। কিন্তু যদি অনাবশ্যক স্থলে দুই শব্দ জুড়ে দিয়ে বার বার প্রয়োগ করা হয় তবে তা মুদ্রাদোষ। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'অনির্দিষ্ট প্রভৃতি বাচক' বলেছেন সেই শ্রেণীর অনেক জোড়া শব্দ সম্প্রতি অকারণে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এগুলির বিশেষ লক্ষণ— জোড়ার শব্দদুটি

অসমান কিন্তু প্রায় অনুপ্রাসযুক্ত এবং প্রত্যেকটিরই অর্থ হয়। এই প্রকার বহুপ্রচলিত এবং নির্দোষ জোড়া শব্দও অনেক আছে, যেমন— মণি-মুক্তা, ধ্যান-ধারণা, জল-স্থল, খেত-খামার, নদী-নালা।

দুঃখ-দুর্দশা, ক্ষয়-ক্ষতি, সুখ-সুবিধা, উদ্‌যোগ-আয়োজন, প্রভৃতি জোড়া শব্দ আজকাল খবরের কাগজে খুব দেখা যায়। স্থলবিশেষে এই প্রকার প্রয়োগের সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি শব্দই যথেষ্ট। কেবল দুঃখ বা কেবল দুর্দশা, কেবল ক্ষয় বা কেবল ক্ষতি, ইত্যাদি লিখলেই উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। এই রকম শব্দ যদি সর্বদাই জোড়া লেগে থাকে এবং অনর্থক বার বার প্রয়োগ করা হয় তবে তা মুদ্রাদোষ।

দুজন সুস্থ সবল লোক যদি সর্বদা পরস্পরের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটা অভ্যাস করে তবে দুজনেরই চলনশক্তির হানি হয়, একের অভাবে অন্য জন স্বচ্ছন্দে চলতে পারে না। প্রত্যেক শব্দেরই স্বাভাবিক অর্থপ্রকাশশক্তি আছে যার নাম অভিধা। এই স্বাভাবিক অর্থ আরও স্পষ্ট হবে মনে করে যদি সর্বদা আর একটি শব্দ জুড়ে দেওয়া হয় তবে দুই শব্দেরই শক্তি কমে যায়। যেখানে একটিতেই কাজ চলতে পারত সেখানে দুটিই না লিখলে আর চলে না। আজকাল জনসাধারণের ভাষা শিক্ষার একটি প্রধান উপায় সংবাদপত্র। শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, ভাল বা মন্দ, যে প্রয়োগ লোকে বার বার দেখে তাই শিষ্ট রীতি মনে করে আত্মসাৎ করে। শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোকের মুখে 'পরিস্থিতি, বাধ্যতামূলক, অংশগ্রহণ, কার্যকরী উপায়,' ইত্যাদি শোনা যায়।

সংবাদপত্রে sports অর্থে খেলাধূলা চলছে। শিশুর খেলাকে এই নাম দিলে বেমানান হয় না, কিন্তু ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতিকে খেলাধূলা বললে খেলোয়াড়ের পৌরুষ ধূলিসাৎ হয়। লোকে বলে— মাঠে খেলা দেখতে যাচ্ছি। খেলাধূলা দেখতে যাচ্ছি বলে না। শুধু খেলা শব্দে যখন কাজ চলে তখন অনুপ্রাসের মোহে খেলাধূলা লেখবার দরকার কি?

শব্দবাহুল্য বাঙালীর একটি রোগ। ক্লাইভ স্ট্রীটের নাম এখন নেতাজী সুভাষ রোড করা হয়েছে। শুধু নেতাজী রোড বা সুভাষ রোড করলে কিছুমাত্র অসম্মান হত না অথচ সাধারণের বলতে আর লিখতে সুবিধা হত। সম্প্রতি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজের নাম নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ করা হয়েছে। শুধু নীলরতন কলেজ করলে কি দোষ হত? বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বদলে বঙ্কিমচন্দ্র বা বঙ্কিম স্ট্রীট করলে অমর্যাদা হত না। যাঁরা খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন তাঁদের পদবীর দরকার হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষ। কৌলিক পদবীর বোঝা থেকে সাধারণে তাঁদের অনেকটা নিষ্কৃতি দিয়েছে, কিন্তু ভক্তজন তাঁদের স্কন্ধে নূতন উপসর্গ চাপিয়েছেন। অনেকে মনে করেন প্রত্যেক বার নামোল্লেখের সময় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি রাজনারায়ণ, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র না লিখলে তাঁদের অসম্মান হয়। রবীন্দ্রনাথ মহাভাগ্যবান, তাই সুকবি, কবিবর, মহাকবি, কবিসম্রাট প্রভৃতি তুচ্ছ বিশেষণের উর্ধ্বে উঠে গেছেন, দরকার হলে নামের পরিবর্তে তাঁকে শুধু কবি বা কবিগুরু আখ্যা দিলেই যথেষ্ট হয়।

যেখানে কোনও লোকের স্বমহিমা পর্যাপ্ত মনে হয় না সেখানেই আড়ম্বর আসে। দারোয়ানের চৌগোঁপ্পা, পাগড়ি আর জমকালো পোশাক, ফিল্ড-মার্শালের ভালুকের চামড়ার প্রকাণ্ড টুপি, সন্ন্যাসী

বাবাজীর দাড়ি জটা গেরুয়া আর সাতনরী রুদ্রাক্ষের মালা— এ সমস্তই মহিমা বাড়াবার কৃত্রিম উপায়। আধুনিক শংকরাচার্যদের নামের পূর্বে এক শ আট শ্রী না দিলে তাঁদের মান থাকে না, কিন্তু আদি শংকরাচার্যের শ্রীর প্রয়োজন নেই, এবং হরি দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতা দু-একটি শ্রীতেই তুষ্ট।

বাণ গৌড়ী রীতির লক্ষণ বলেছেন, অক্ষরডম্বর। এই আড়ম্বরের প্রবৃত্তি এখনও আছে। অনেক বাক্যে অকারণে শব্দবাহুল্য এসে পড়েছে, লেখকরা গতানুগতিক ভাবে এইসব সাড়ম্বর বাক্য প্রয়োগ করেন। 'সন্দেহ নাই'— এই সরল প্রয়োগ প্রায় উঠে গেছে, তার বদলে চলছে— 'সন্দেহের অবকাশ নাই'। 'চা পান' বা 'চা খাওয়া' চলে না, 'চা পর্ব' লেখা হয়। 'মিষ্টান্ন খাইলাম' স্থানে 'মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করা গেল'। মাঝে মাঝে অলংকার হিসাবে এরকম প্রয়োগ সার্থক হতে পারে, কিন্তু যদি বার বার দেখা যায় তবে তা মুদ্রাদোষ।

শব্দের অপচয় করলে ভাষা সমৃদ্ধ হয় না, দুর্বল হয়। যেখানে 'ব্যর্থ হইবে' লিখলে চলে সেখানে দেখা যায় 'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে'। অনেকে 'দিলেন' স্থানে 'প্রদান করিলেন,' 'যোগ দিলেন' স্থানে 'অংশগ্রহণ করিলেন' বা 'যোগদান করিলেন,' 'গেলেন' স্থানে 'গমন করিলেন' লেখেন। 'হিন্দীভাষী' লিখলেই অর্থ প্রকাশ পায়, অথচ লেখা হয় 'হিন্দীভাষাভাষী'। 'কাজের জন্য (বা কর্মসূত্রে) বিদেশে গিয়াছেন'— এই সরল বাক্যের স্থানে দুরূহ অশুদ্ধ প্রয়োগ দেখা যায়— 'কর্মব্যপদেশে বিদেশে গিয়াছেন'। ব্যপদেশের মানে ছল বা ছুতা। 'পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল' স্থানে লেখা হয়— 'পূর্বাহ্নেই· ·'। পূর্বাহ্নের একমাত্র অর্থ সকালবেলা।

বাংলা একটা স্বাধীন ভাষা, তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি আছে, সংস্কৃতের বশে চলবার কোনও দরকার নেই— এই কথা অনেকে বলে থাকেন। অথচ তাঁদের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিকৃত সংস্কৃতপ্রীতি দেখা যায়। বাংলা 'চলন্ত' শব্দ আছে, তবু তাঁরা সংস্কৃত মনে করে অশুদ্ধ 'চলমান' লেখেন, বাংলা 'আগুয়ান' স্থানে অশুদ্ধ 'অগ্রসরমান' লেখেন, সুপ্রচলিত 'পাহারা' স্থানে 'প্রহরা' লেখেন। বাকীর সংস্কৃত বক্রী নয়, পাঁঠার সংস্কৃত পণ্টক নয়, পাহারার সংস্কৃতও প্রহরা নয়।

অনেক লেখকের শব্দবিশেষের উপর ঝোঁক দেখা যায়, তাঁরা তাঁদের প্রিয় শব্দ বার বার প্রয়োগ করেন। একজন গল্পকারের লেখায় চার পৃষ্ঠায় পঁচিশ বার 'রীতিমত' দেখেছি। অনেকে বার বার 'বৈকি' লিখতে ভালবাসেন। কেউ কেউ অনেক প্যারাগ্রাফের আরম্ভে 'হাঁ' বসান। আধুনিক লেখকরা 'যুবক যুবতী' বর্জন করেছেন, 'তরুণ তরুণী' লেখেন। বোধ হয় এঁরা মনে করেন এতে বয়স কম দেখায় এবং লালিত্য বাড়ে। অনেকে দাঁড়ির বদলে অকারণে বিস্ময়চিহ্ন (!) দেন। অনেকে দেদার বিন্দু (···) দিয়ে লেখা ফাঁপিয়ে তোলেন। অনাবশ্যক হস্-চিহ্ন দিয়ে লেখা কণ্টকিত করা বহু লেখকের মুদ্রাদোষ। ভেজিটেবল ঘি-এর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে খাবার তৈরির বিধি দেওয়া থাকে তাতে দেখেছি— 'তিন্‌টি ডিম্‌ ভেঙ্গে নিন্‌, তাতে এক্‌টু নুন্‌ দিন্‌'।

আর একটি বিজাতীয় মোহ আমাদের ভাষাকে আচ্ছন্ন করেছে। একে মুদ্রাদোষ বললে ছোট করা হবে, বিকার বলাই ঠিক। ব্রিটিশ শাসন গেছে, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তার ভূত আমাদের আচারব্যবহারে আর ভাষায় অধিষ্ঠান করে আছে। বিদেশীর কাছ থেকে আমরা বিস্তর ভাল জিনিস পেয়েছি। দু শ

বৎসরের সংসর্গের ফলে আমাদের কথায় ও লেখায় কিছু কিছু ইংরেজী রীতি আসবে তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কি বর্জনীয়, কি উপেক্ষণীয় এবং কি রক্ষণীয় তা ভাববার সময় এসেছে।

পাঁচ বছরের মেয়েকে নাম জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়— কুমারী দীপ্তি চ্যাটার্জি। সুশিক্ষিত লোকেও অম্লানবদনে বলে— মিস্টার বাসু (বা বাসিউ), মিসেস রয়, মিস ডাট। মেয়েদের নামে ডলি লিলি রুবি ইভা প্রভৃতির বাহুল্য দেখা যায়। যার নাম শৈল বা শীলা সে ইংরেজীতে লেখে Sheila। অনিল হয়ে যায় O'neil, বরেন হয় Warren। এরা স্বনামে ধন্য হতে চায় না, নাম বিকৃত করে ইংরেজের নকল করে। এই নকল যে কতটা হাস্যকর ও হীনতাসূচক তা খেয়াল হয় না। সংক্ষেপের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যানার্জি না করে বন্দ্য করলে দোষ কি? সেই রকম মুখ্য চট্ট গঙ্গ্য ভট্টও চলতে পারে। সম্প্রতি অনেকে নামের মধ্যপদ লোপ করেছেন, নাথ চন্দ্র কুমার মোহন ইত্যাদি বাদ দিয়েছেন। ভালই করেছেন। দিব্যেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি প্রকাণ্ড নাম এখন ফ্যাশন নয়। পদবীও সংক্ষিপ্ত করলে ক্ষতি কি? মিস-এর অনুকরণে কুমারী লিখলে কি লাভ হয়? কয়েক বৎসর পূর্বেও কুমারী সধবা বিধবা সকলেই শ্রীমতী ছিলেন। এখন কুমারীকে বিশেষ করার কি দরকার হয়েছে? পুরুষের কৌমার্য তো ঘোষণা করা হয় না।

আদিতে যার নাম ছিল আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, লাট সাহেবের অনুগ্রহ লাভের জন্য তার নাম কারমাইকেল কলেজ করা হয়। এখন আবার প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করে আর. জি. কর কলেজ করা হয়েছে। ইংরেজী অক্ষর না দিয়ে রাধাগোবিন্দ কলেজ করলেই কালোচিত হত। একটি সমিতির বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে দেখতে পাই— Better Bengal Society। বাংলা দেশ এবং বাঙালীর উন্নতি করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে ইংরেজী নাম আর ইংরেজী বিজ্ঞাপন কেন? এখনও কি ইংরেজ মুরব্বীর প্রশংসা পাবার আশা আছে?

মেরুদণ্ডহীন অলস সুকুমার কমলবিলাসী হবার প্রবৃত্তি অনেকের আছে, সন্তানের নামকরণে তা প্রকাশ পায়। দোকানদারেরও স্বপনপসারী তরুণকুমার হবার সাধ হয়েছে। আমাদের পাড়ার একটি দরজীর দোকানের নাম— দি ড্রিমল্যাণ্ড স্টিচার্স। অন্যত্র স্বপন লণ্ড্রিও দেখেছি। তরুণ হোটেল, তরুণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, এবং ইয়ং গ্র্যাজুয়েট নামধারী দোকান বিস্তর আছে। পাঁচ ছ বৎসর আগে বউবাজারে একটি দোকান ছিল— ইয়ং মোসলেম গ্র্যাজুয়েট ফ্রেণ্ড্স। একসঙ্গে তারুণ্য ইসলাম আর পাস করা বিদ্যার আবেদন।

অরবিন্দ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেক দিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখব। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। তাঁকে দেখে যা আমার মনে জেগেছে সেই কথা লিখতে ইচ্ছা করি।

খৃস্টান শাস্ত্রে বলে বাণীই আদ্যাশক্তি। সেই শক্তিই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। নবযুগ নবসৃষ্টি, সে কখনও পঞ্জিকার তারিখের ফর্দ থেকে নেমে আসে না। যে যুগের বাণী চিন্তায় কর্মে মানুষের চিত্তকে মুক্তির নূতন পথে বাহির করে তাকেই বলি নবযুগ।

আমাদের শাস্ত্রে মন্ত্রের আদিতে ওঁ, অন্তেও ওঁ। এই শব্দটিকেই পূর্ণের বাণী বলি। এই বাণী সত্যের অয়মহং ভো— কালের শঙ্খকুহরে অসীমের নিশ্বাস। ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের বান ডেকে যে যুগ অতল ভাব-সমুদ্র থেকে কলশব্দে ভেসে এল তাকে বলি য়ুরোপের এক নবযুগ। তার কারণ এ নয়, সেদিন ফ্রান্সে যারা পীড়িত তারা পীড়নকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধালে। তার কারণ, সেই যুগের আদিতে ছিল বাণী। সে বাণী কেবলমাত্র ফ্রান্সের আশু রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের খাঁচায় বাঁধা খবরের কাগজের মোড়কে ঢাকা, ইস্কুল-বইয়ের বুলি আওড়ানো, টিয়ে পাখি নয়। সে ছিল মুক্তপক্ষ আকাশবিহারী বাণী, সকল মানুষকেই পূর্ণতর মনুষ্যত্বের দিকে সে পথনির্দেশ করে দিয়েছিল।

একদা ইটালির উদ্‌বোধনের দূত ছিলেন মাট্‌সীনি, গারিবাল্ডি। তাঁরা যে মন্ত্রে ইটালিকে উদ্ধার করলেন সে ইটালির তৎকালীন শত্রু-বিনাশের দ্রুতফলদায়ক মারণ উচাটন পিশাচ -মন্ত্র নয়— সমস্ত মানুষের নাগপাশ-মোচনের সে গরুড়মন্ত্র, নারায়ণের আশীর্বাদ নিয়ে মর্তে অবতীর্ণ। এইজন্যে তাকেই বলি বাণী। আঙুলের আগায় যে স্পর্শবোধ তার দ্বারা অন্ধকারে মানুষ ঘরের প্রয়োজন চালিয়ে নিতে পারে। সেই স্পর্শবোধ তারই নিজের। কিন্তু সূর্যের আলোতে নিখিলের যে স্পর্শবোধ আকাশে আকাশে বিস্তৃত তা প্রত্যেক প্রয়োজনের উপযোগী অথচ প্রত্যেক প্রয়োজনের অতীত। সেই আলোককেই বলি বাণীর রূপক।

সায়ান্স্‌ একদিন য়ুরোপে যুগান্তর এনেছিল। কেন। বস্তুজগতে শক্তির সন্ধান জানিয়েছিল ব'লে না, জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অন্ধতা ঘুচিয়েছিল ব'লে। বস্তুসত্যের বিশ্বরূপ স্বীকার করতে সেদিন মানুষ প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। আজ সায়ান্স্‌ সেই যুগ পার করে দিয়ে আর-এক নবতর যুগের সম্মুখে মানুষকে দাঁড় করালে। বস্তুরাজ্যের চরম সীমানায় মূল তত্ত্বের দ্বারে তার রথ এল। সেখানে সৃষ্টির আদিবাণী। প্রাচীন ভারতে মানুষের মন কর্মকাণ্ড থেকে যেই এল জ্ঞানকাণ্ডে, সঙ্গে সঙ্গে এল সৃষ্টির যুগ। মানুষের আচারকে লঙ্ঘন করে আত্মাকে ডাক পড়ল। সেই আত্মা যন্ত্রচালিত কর্মের বাহন নয়, আপন মহিমাতে সে সৃষ্টি করে। সেই যুগে মানুষের জাগ্রত চিত্ত বলে উঠেছিল, চিরন্তনের মধ্যে বেঁচে ওঠাই হল বেঁচে যাওয়া, তার উলটাই মহতী বিনষ্টি। সেই যুগের বাণী ছিল : য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

আর-একদিন ভারতে উদ্‌বোধনের বাণী এল। সমস্ত মানুষকে ডাক পড়ল, বিশেষ সংকীর্ণ পরামর্শ নিয়ে নয়, যে মৈত্রী মুক্তির পথে নিয়ে যায় তারই বাণী নিয়ে। সেই বাণী মানুষের চিত্তকে তার সমগ্র উদ্‌বোধিত শক্তির যোগে বিপুল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করলে।

বাণী তাকেই বলি, যা মানুষের অন্তরতম পরম অব্যক্তকে বাহিরে অভিব্যক্তির দিকে আহ্বান

করে আনে, যা উপস্থিত প্রত্যক্ষের চেয়ে অনাগত পূর্ণতাকে বাস্তবতর সত্য বলে সপ্রমাণ করে। প্রকৃতি পশুকে নিছক দিনমজুরি করতেই প্রত্যহ নিযুক্ত করে রেখেছে। সৃষ্টির বাণী সেই সংকীর্ণ জীবিকার জগৎ থেকে মানুষকে এমন জীবনযাত্রায় উদ্ধার করে দিলে যার লক্ষ উপস্থিত কালকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের কানে এল : *টিকে থাকতে হবে,* এ কথা তোমার নয়; তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, সেজন্যে মরতে যদি হয় সেও ভালো। প্রাণযাপনের বদ্ধ গণ্ডির মধ্যে যে আলো জ্বলে সে রাত্রির আলো; পশুদের তাতে কাজ চলে। কিন্তু মানুষ নিশাচর জীব নয়।

সমুদ্রমন্থনের দুঃসাধ্য কাজে বাণী মানুষকে ডাক দেয় তলার রত্নকে তীরে আনার কাজে। এতে করে বাইরে সে যে সিদ্ধি পায় তার চেয়ে বড় সিদ্ধি তার অন্তরে। এ যে দেবতার কাজে সহযোগিতা। এতেই আপন প্রচ্ছন্ন দৈবশক্তির 'পরে মানুষের শ্রদ্ধা ঘটে। এই শ্রদ্ধাই নূতন যুগকে মর্তসীমা থেকে অমর্তের দিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই শ্রদ্ধাকে নিঃসংশয় স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাঁর মধ্যে যাঁর আত্মা স্বচ্ছ জীবনের আকাশে মুক্ত মহিমায় প্রকাশিত। কেবলমাত্র বুদ্ধি নয়, ইচ্ছাশক্তি নয়, উদ্যম নয়, যাঁকে দেখলে বোঝা যায় বাণী তাঁর মধ্যে মূর্তিমতী।

আজ এইরূপ মানুষকে যে একান্ত ইচ্ছা করি তার কারণ, চার দিকেই আজ মানুষের মধ্যে আত্ম-অবিশ্বাস প্রবল। এই আত্ম-অবিশ্বাসই আত্মঘাত। তাই রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধিই আজ আর-সকল সাধনাকেই পিছনে ঠেলে ফেলেছে। মানুষ বস্তুর মূল্যে সত্যকে বিচার করছে। এমনি করে সত্য যখন হয় উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হয় আর-কিছু, তখন বিষয়ের লোভ উগ্র হয়ে ওঠে, সে লোভের আর তর সয় না। বিষয়সিদ্ধির অধ্যবসায়ে বিষয়বুদ্ধি আপন সাধনার পথকে যতই সংক্ষিপ্ত করতে পারে ততই তার জিত। কারণ, তার পাওয়াটা হল সাধনা-পথের শেষ প্রান্তে। সত্যের সাধনায় সর্বক্ষণেই পাওয়া। সে যেন গানের মতো, গাওয়ার অন্তে সে গান নয়, গাওয়ার সমস্তটার মধ্যেই। সে যেন ফলের সৌন্দর্য, গোড়া থেকেই ফুলের সৌন্দর্যে যার ভূমিকা। কিন্তু লোভের প্রবলতায় সত্য যখন বিষয়ের বাহন হয়ে উঠল মহেন্দ্রকে তখন উচ্চৈঃশ্রবার সহিসগিরিতে ভর্তি করা হল তখন সাধনাটাকে ফাঁকি দিয়ে সিদ্ধিকে সিঁধ কেটে নিতে ইচ্ছে করে, তাতে সত্য বিমুখ হয়, সিদ্ধি হয় বিকৃত।

সুদীর্ঘ নির্বাসন ব্যাপ্ত করে রামচন্দ্রের একটি সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। যতই দুঃখ পেয়েছেন ততই গাঢ়তর করে উপলব্ধি করেছেন সীতার প্রেম। তাঁর সেই উপলব্ধি নিবিড়ভাবে সার্থক হয়েছিল যেদিন প্রাণপণ যুদ্ধে সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করে আনলেন।

কিন্তু রাবণের চেয়ে শত্রু দেখা দিল তাঁর নিজেরই মধ্যে। রাজ্যে ফিরে এসে রামচন্দ্র সীতার মহিমাকে রাষ্ট্রনীতির আশু প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলেন, তাঁকে বললেন : সর্বজনসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় অনতিকালেই তোমার সত্যের পরিচয় দাও। কিন্তু এক মুহূর্তে জাদুর কৌশলে সত্যের পরীক্ষা হয় না, তার অপমান ঘটে। দশ জন সত্যকে যদি না স্বীকার করে তবে সেটা দশ জনেরই দুর্ভাগ্য। সত্যকে যে সেই দশ জনের ক্ষুদ্র মনের বিকৃতি-অনুসারে আপনার অসম্মান করতে হবে এ যেন না ঘটে। সীতা বললেন : আমি মুহূর্তকালের দাবি মেটাবার অসম্মান মানব না, চিরকালের মতো বিদায় নেব। রামচন্দ্র এক নিমিষে সিদ্ধি চেয়েছেন, এক মুহূর্তে সীতাকে হারিয়েছেন। ইতিহাসের যে উত্তরকাণ্ডে আমরা এসেছি এই কাণ্ডে আমরা তাড়াতাড়ি দশের-মন-ভোলানো সিদ্ধির লোভে সত্যকে হারাবার পালা আরম্ভ করেছি।

বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেনের দুর্লভ কাব্যরত্নের ঝুলি থেকে একদিন এক পুরাতন বাউলের গান পেয়েছিলুম। তার প্রথম পদটি মনে পড়ে :

নিঠুর গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে।

যে মানসমুকুলের বিকাশ সাধনসাপেক্ষ, দশের সামনে অগ্নিপরীক্ষায় তার পরিণত সত্যকে আশুকালের গরজে সপ্রমাণ করতে চাইলে, আয়োজনের ধুমধাম ও উত্তেজনাটা থেকে যায়, কিন্তু তার পিছনে মানসটাই অন্তর্ধান করে।

এই লোভের চাঞ্চল্যে সর্বত্রই যখন সত্যের পীড়ন চলেছে তখন এর বিরুদ্ধে তর্কযুক্তিকে খাড়া করে ফল নেই। মানুষকে চাই, যে মানুষ বাণীর দূত, সত্যসাধনায় সুদীর্ঘকালেও যাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, সাধনপথের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যেরই অমৃত পাথেয় যাঁকে আনন্দিত রাখে। আমরা এমন মানুষকে চাই যিনি সর্বাঙ্গীণ মানুষের সমগ্রতাকে শ্রদ্ধা করেন। এ কথা গোড়াতেই মেনে নিতে হবে যে, বিধাতার কৃপাবশতই সর্বাঙ্গীণ মানুষটি সহজ নয়, মানুষ জটিল। তার ব্যক্তিরূপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহুবিচিত্র। কোনো বিশেষ অপ্রশস্ত আদর্শের মাপে ছেঁটে একঝোঁকা ভাবে তাকে অনেক দূর বাড়িয়ে তোলা চলে। মানুষের মনটাকে যদি চাপা দিই তবে চোখ বুজে গুরুবাক্য মেনে চলার ইচ্ছা তার সহজ হতে পারে। বুঝিয়ে বলার পরিশ্রম ও বিলম্বটাকে খাটো করে দিতে পারলে মনের শক্তি বাড়ানোর চেয়ে মনের বোঝা বাড়ানো, বিদ্যালাভের পরিবর্তে ডিগ্রি-লাভ, সহজ হয়। জীবনযাত্রাকে উপকরণশূন্য করতে পারলে তার বহনভার কমে আসে। তবুও সহজের প্রলোভনে সবচেয়ে বড়ো কথাটা ভুললে চলবে না যে, আমরা মানুষ, আমরা সহজ নই।

তিব্বতে মন্ত্রজপের ঘূর্ণিচাকা আছে। এর মধ্যে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় বলেই আমাদের মনে অবজ্ঞা আসে। সত্যকার মন্ত্রজপ একটুও সহজ নয়। সেটা শুদ্ধমাত্র আচার নয়, তার সঙ্গে আছে চিত্ত, আছে ইচ্ছাশক্তির একাগ্রতা। হিতৈষী এসে বললেন : সাধারণ মানুষের চিত্ত অলস, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল, অতএব মন্ত্রজপকে সহজ করবার খাতিরে ঐ শক্ত অংশগুলো বাদ দেওয়া যাক, কিছু না-ভেবে না-বুঝে শব্দ আউড়ে গেলেই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট ; সজীব ছাপাখানার মতো প্রত্যহ কাগজে হাজার বার নাম লিখলেই উদ্ধার। কিন্তু সহজ করবার মধ্যেই যদি বিশেষ গুণ থাকে তবে আরও সহজই-বা না করব কেন। চিত্তের চেয়ে মুখ চলে বেগে, মুখের চেয়ে চাকা। অতএব চলুক চাকা, মরুক চিত্ত।

কিন্তু মানুষের পন্থা সম্বন্ধে যে গুরু বলেন 'দুর্গং পথস্তৎ' তাঁকে নমস্কার করি। চরিতার্থতার পথে মানুষের সকল শক্তিকেই আমরা দাবি করব। বহুলতা পদার্থটিই মন্দ এই মতের খাতিরে বলা চলে যে, ভেলা জিনিসটাই ভালো, নৌকাটা বর্জনীয়। এক সময়ে অত্যন্ত সাদাসিধে ভেলায় অত্যন্ত সাদাসিধে কাজ চলত। কিন্তু মানুষ পারলে না থাকতে, কেননা সে সাদাসিধে নয়। কোনোমতে স্রোতের উপর বরাত দিয়ে নিজের কাজ সংক্ষেপ করতে তার লজ্জা। বুদ্ধি ব্যস্ত হয়ে উঠল, নৌকোয় হাল লাগালো, দাঁড় বানালে, পাল দিলে তুলে, বাঁশের লগি আনলে বেছে, গুণ টানবার উপায় করলে, নৌকোর উপর তার কর্তৃত্ব নানা গুণে নানা দিকে বেড়ে গেল, নৌকোর কাজও পূর্বের চেয়ে হল অনেক বেশি ও অনেক বিচিত্র। অর্থাৎ মানুষের তৈরি নৌকো মানবপ্রকৃতির জটিলতার পরিচয়ে কেবলই এগিয়ে চলল। আজ যদি বলি 'নৌকো ফেলে দিয়ে ভেলায় ফিরে গেলে অনেক দায় বাঁচে' তবে তার উত্তরে বলতে হবে : মনুষ্যত্বের

দায় মানুষকে বহন করাই চাই। মানুষের বহুধা শক্তি, সেই শক্তির যোগে নিহিতার্থকে কেবলই উদ্‌ঘাটিত করতে হবে, মানুষ কোথাও থামতে পাবে না। মানুষের পক্ষে নাপ্লেসুখমস্তি। অধিককে বাদ দিয়ে সহজ করা মানুষের নয়, সমস্তকে নিয়ে সামঞ্জস্য করাই তার। কলকারখানার যুগে ব্যাবসা থেকে সৌন্দর্যবোধকে বাদ দিয়ে জিনিসটাকে সেই পরিমাণে সহজ করেছে, তাতেই মুনফার বুভুক্ষা কুশ্রীতায় দানবীয় হয়ে উঠল। এ দিকে মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল ঘানি ঢেঁকি থেকে বিজ্ঞানকে চেঁচেমুছে ফেলায় ওগুলো সহজ হয়েছে, সেই পরিমাণে এদের আশ্রিত জীবিকা অপটুতায় স্থাবর হয়ে রইল; বাড়েও না, এগিয়ে চলেও না, নড়বড় করতে করতে কোনোমতে টিকে থাকে। তার পরে মার খেয়ে মরে শক্ত হাতের থেকে। প্রকৃতি পশুকেই সহজ করেছে, তারই জন্য স্বল্পতা; মানুষকে করেছে জটিল, তার জন্যে পূর্ণতা। সাঁতারকে সহজ করতে হয় বিচিত্র হাত পা নাড়ার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে, হাঁটুজলে কাদা আঁকড়ে অল্প পরিমাণে হাত পা ছুঁড়ে নয়। ধনের আড়ম্বর থেকে গুরু আমাদের বাঁচান, দারিদ্র্যের সংকীর্ণতার মধ্যে ঘের দিয়ে নয়, ঐশ্বর্যের অপ্রমত্ত পূর্ণতায় মানুষের গৌরববোধকে জাগ্রত ক'রে।

এই সমস্ত কথা ভাবছি, এমন সময় আমাদের ফরাসি জাহাজ এল পণ্ডিচেরি বন্দরে। ভাঙা শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট করেই নামতে হল। তা হোক। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে: ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। কথা বেশি বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারই মধ্যে মনে হল, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খরদস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খৃস্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন: যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে: শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্‌বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়, আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।

শান্তিনি জাহাজ। ২৯ মে ১৯২৮

[প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৫

জয়শঙ্খ তাঁর? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে, বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুব তারকার মত? জয়, তব জয়!
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা! কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল!
মোছো রে, দুর্বল চক্ষু, মোছো অশ্রুজল!

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে,
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে! বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার —
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্যপানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি! শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
কপট বেষ্টন; — যে নপুংসক চিরদিন

চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলে নি অন্যায়; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার,
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে; দুর্গতির করে অহংকার;
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ, মাতৃরক্ত প্রায়;
সেই ভীরু নতশির চিরশান্তিভারে
রাজকারা-বাহিরেতে নিত্য-কারাগারে।

বন্দী পীড়া দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয়বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি,
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল ঝংকার, —
নাহি তাহে দুঃখতান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ
কোথা হতে ঝঞ্ঝাসাথে সিন্ধুর গর্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মাদ নর্তন
পাষাণ পিঞ্জর টুটি, — বজ্রগর্জরব
ভেরীমন্দ্রে মেঘপুঞ্জে জাগায় ভৈরব।

এ উদাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গ মাঝার,
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!

তার পরে তাঁরে নমি, যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক-কান্তারে
রিক্ত হস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি অন্ধকারে।
যিনি নানা কণ্ঠে কন নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে—"দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়,
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার,
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার!
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।"

৭ই ভাদ্র ১৩১৪

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩০১-১৩৫৭

বিভূতিভূষণের রচনা

বিভূতিভূষণের রচনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব ইচ্ছা ছিল। কখনো কখনো এ বিষয়ে বিভূতিবাবুর সহিত কথা বলিয়াছি। তিনি খুশি হইয়াছেন, বলিয়াছেন, 'বেশ হবে, তুমি লেখো।' কিন্তু কিছুই করা হইয়া ওঠে না, সময়াভাব ও আলস্য প্রধান কারণ। আরও একটি কারণ ছিল, ভাবিয়াছি এত ত্বরা কিসের? আলোচনার যোগ্য অনেক বই বিভূতিবাবু অবশ্য লিখিয়াছেন, কিন্তু আরও কিছু লিখুন না কেন। সুর সমের কাছে আসিলে তবে তাহার পুরা রূপটি সহজগ্রাহ্য হয়, বিভূতিবাবুর রচনার ধারা তো এখনো সমাপ্তির কাছে আসে নাই, তবে আবার এত ত্বরা কেন। কিন্তু সুর 'সমের' কাছে আসিবার আগেও যে সুরকারের জীবন সমাপ্ত হইতে পারে এই স্থূল কথাটা মনে পড়ে নাই, অন্তত বিভূতিবাবুর সম্পর্কে মনে পড়িবার কোনো কারণ ছিল না। সুস্থ সবল প্রাণবান্ পুরুষ ছিলেন তিনি। মৃত্যু চরম যবনিকা টানিয়া দিয়া অকালে সমাপ্তি ঘটাইয়া দিল। বিভূতিবাবুর সাহিত্যিক খ্যাতি অক্ষয় হইল, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যধারার আর প্রবাহিত হইবার সম্ভাবনা রহিল না। আমার প্রত্যাশিত সম আসিল না, আসিল চরম শান্তি। এক সময়ে ভাবিয়াছিলাম এত ত্বরা কেন, এখন ভাবিতেছি আর বিলম্ব কিসের? এখন এ আলোচনায় তাঁহার খুশি হইবার সম্ভাবনা আর নাই; নাই থাকুক, আমি তো খুশি হইব, আর আমার মত তাঁহার অনুরাগীগণও খুশি হইবেন আশা করিতে পারি।

বিভূতিবাবুর রচনার সাহিত্যিক আলোচনার ইচ্ছার মূলে বিশেষ একটি কারণ ছিল, সে-কারণ এখনও বিদ্যমান। সেটি বুঝাইয়া বলিলে বিভূতিবাবুর রচনা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইবে, অমনি প্রসঙ্গত বর্তমান সাহিত্য সংক্রান্ত কুয়াশাও খানিকটা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা।

বিভূতিবাবুর সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার রচনায় কালের ও সমাজের পরিচয় একেবারেই নাই। আবার বিভূতিবাবুর রচনার যাঁহারা অনুরাগী তাঁহারা এ কথা স্পষ্ট না বলিলেও অনুরূপ সন্দেহ যে তাঁহাদের মনেও আছে, কেবল বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তিবৃদ্ধির ভয়েই প্রকাশ করেন না, এমনও মনে হয়। বিভূতিবাবুর সমালোচকগণ বলেন যে, বর্তমান বাঙালি লেখকগণের সকলেরই রচনা স্বকাল ও স্বসমাজ দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু বিভূতিভূষণের অধিকাংশ রচনায় যেন দেশকালের কৈবল্য ঘটিয়াছে, সেসব যে আজকার ঘটনা তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিবার উপায় নাই, তাঁহার রচনায় যে কোকিল ডাকিতেছে তাহা শুনিয়া মনে পড়ে, 'বাংলা দেশে ছিলাম যেন তিন শ বছর আগে'। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহারা বাংলা দেশের অন্য দুইজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর উল্লেখ করেন। তাঁহারা বলেন যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও বনফুলের রচনা পড়িলেই মনে হয় যে লেখক মধ্য-বিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের লোক। আর শুধু তাই নয়, যুদ্ধোত্তর দেশব্যাপী ভাবান্দোলনের আঘাত আসিয়া তাঁহাদের শিল্পকমলকে নিরন্তর দোলাইতেছে; বিভূতিভূষণের রচনায় তেমন দোল কই? তাঁহাদের মতে বিভূতিবাবুর শিল্প তরঙ্গহীন,

কালের চাঞ্চল্যহীন সরোবরের পদ্ম। এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে চিন্তার বিষয় বই কি। কিন্তু আদৌ কি এ অভিযোগ সত্য? কোনো কৃতী শিল্পীর পক্ষে স্বকাল ও স্বসমাজকে এড়াইয়া শিল্পসৃষ্টি করা কি আদৌ সম্ভব? সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস স্মরণ করিয়া তো এমন একটি দৃষ্টান্তও চোখে পড়িতেছে না। তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুলের রচনায় কালের ও সমাজের ঠিক যে লক্ষণগুলি প্রকট বিভূতিবাবুর রচনায় হয়তো সেগুলি প্রকট নয়। কিন্তু অন্য লক্ষণ যে প্রকট হয় নাই তা কে বলিল? কাল যে কেবল নিরবধি আর পৃথিবী যে কেবল বিপুলা তাই নয়, দেশ ও কালের ধর্ম ও লক্ষণও বিচিত্র। এমন কোন্ দর্পণ আছে যাহাতে সমগ্র আকাশের প্রতিবিম্ব ধরে? এমন কোন্ লেখক আছে সমগ্র জীবনের ছাপ যে ধরিতে সক্ষম হইয়াছে? জীবন যখন অপেক্ষাকৃত সরল ছিল তখনকারও সমস্ত ছাপই কি হোমারে আছে, না, দান্তেতে আছে, না, শেক্সপীয়রে আছে? জীবন তো ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। ডিকেন্স ও থ্যাকারে দুই জনেই সমসাময়িক এবং দুই জনেই যুগন্ধর ঔপন্যাসিক। কিন্তু ডিকেন্সের উপন্যাসে যুগের যেসব লক্ষণ প্রকট, থ্যাকারের উপন্যাসে সেগুলি প্রকট হয় নাই, অন্যগুলি প্রকট হইয়াছে। তাই বলিয়া ডিকেন্সের তুলনায় থ্যাকারেকে কেহ নিন্দা করে না, এই-টুকু মাত্র বলে যে তাঁহাদের দর্পণ ভিন্নমুখে অবস্থিত, তাই ভিন্ন দিকের ছায়াকৃতি ধরিয়াছে। কাজেই তারাশঙ্করবাবু ও বনফুলের রচনায় স্বকালের ও স্বসমাজের যে লক্ষণ প্রকট, সেগুলি যদি বিভূতিবাবুর রচনায় না থাকে, তাই বলিয়াই তিনি নিন্দার্হ নহেন। তাঁহার রচনায় হয়তো সমাজের ও কালের অন্য দিকের ছায়া পড়িয়াছে। সেগুলির স্বরূপ-আবিষ্কারই যথার্থ সমালোচনাকার্য। সমালোচক ও নিন্দক ভিন্ন গোত্রের মানুষ।

এ যুগের কতকগুলি লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট, কাহারো চোখ এড়ায় না, এমনকি সংবাদপত্রের রিপোর্টারের পক্ষেও সেগুলি সহজগ্রাহ্য। তেমন একটি লক্ষণ শ্রমিক-ধনিক-সংঘাত, আর-একটি লক্ষণ সর্বজনীন অসন্তোষ। এই দুটি ধারা অনুসরণ করিলে বাকি অনেকগুলি লক্ষণকে উপধারা রূপে পাওয়া যাইবে। বর্তমান অধিকাংশ বাঙালি লেখকের রচনা এইসব ধারা ও উপধারার দ্বারা চিহ্নিত। স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিভূতিভূষণের রচনার এগুলি বৈশিষ্ট্য নয়। ইহাতে এইটুকু মাত্র প্রমাণ হয় যে, তিনি বিশিষ্ট। সেটা তো নিন্দার বিষয় নয়।

২

বিভূতিভূষণের অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোট গল্পের অবলম্বন কি? মানুষের প্রাত্যহিক জীবন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ছোটখাটো সুখ-দুঃখের যে লীলাচাঞ্চল্য আছে, সুখের ভিতরে যে দুঃখের আভাস আছে, দুঃখের মধ্যেও যে আনন্দের ইঙ্গিত আছে, বিভূতিভূষণ সাহিত্যরচনার জন্য সেগুলিকেই আশ্রয় করিয়াছেন, জীবনাড়ম্বর তাঁহার সাহিত্যের উপজীব্য নয়। এদিক দিয়া তাঁহার গ্রন্থগুলিকে গার্হস্থ্য উপন্যাস বলা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে যেসমস্ত গার্হস্থ্য উপন্যাস বাংলাদেশে লিখিত হইয়াছে বিভূতিবাবুর রচনা ঠিক সে পর্যায়ভুক্ত নহে। কারণ এমন একটি নূতন উপাদান তাঁহার রচনায় আছে, জলে যে ভাবে ছায়া মিশ্রিত হইয়া থাকে সেইভাবে আছে, যাহা রবীন্দ্রপূর্ব যুগের

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্য গৃহীত ফোটোগ্রাফ

গার্হস্থ্য উপন্যাসে ছিল না। সেটি প্রকৃতি। এটি রবীন্দ্রপূর্ব যুগে অভাবিত ছিল। এটি জীবনের একটি নূতন সূত্র, আমাদের দেশে তো বটেই, পাশ্চাত্ত্য দেশেও। প্রকৃতিকে জীবনের উপাদান রূপে গ্রহণ ও স্বীকার নূতন যুগের লক্ষণ, সে নূতন যুগ এখনও পুরাতন হয় নাই। পশ্চিমের হাত হইতে রবীন্দ্রনাথ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে রবীন্দ্রোত্তরগণ গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পীগণের মধ্যে বিভূতিভূষণ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেই বিভূতিবাবুর রচনায় নূতনত্ব, দেশ ও কালের চিহ্ন। এই উপাদানটি সবচেয়ে বেশি আধুনিক, শ্রমিক-ধনিক -সংঘাত বা সর্বজনীন অসন্তোষের চেয়েও অনেক বেশি আধুনিক। প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নূতন সাহিত্যের এখানেই প্রভেদ। এই প্রভেদের সূচনা কবে কিরূপভাবে হইল? এখানে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের নজির গ্রহণ ছাড়া উপায় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে Lyrical Ballads ও Industrial Revolution সমসাময়িক। শুধু তাই নয়, একই মনোভাবের ও জীবনধারার এপিঠ-ওপিঠ। আরও একটি নজির স্মরণ করা যাইতে পারে। রুসো ও ভল্টেয়ারকে ফরাসি বিপ্লবের পূর্বসূরি বলা হয়। কিন্তু দু জনের জীবনধর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত। ভল্টেয়ার যন্ত্রযুগের পরোক্ষ গুরু, আর রুসো প্রকৃতির প্রতি অন্ধ আকর্ষণের প্রত্যক্ষ ঋষি। একজন লিরিকাল ব্যালাড্‌সের পশ্চাতে দণ্ডায়মান, অপরজন দণ্ডায়মান ইনডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশানের পশ্চাতে। আজ পর্যন্ত সভ্যদেশের জীবনযাত্রা এই দুই ধারার দ্বারা প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত ও আন্দোলিত। একটির উপধারা শ্রমিক-ধনিক-সংঘাত, অপরটির উপধারা প্রকৃতিকে জীবনের উপাদানরূপে গ্রহণ। এই ধারা ও উপধারা কালক্রমে আমাদের জীবনে, কাজেই আমাদের সাহিত্যেও, আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মাঝখানে আছেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি প্রধানত একতরকে গ্রহণ করিয়া তাহাতে বৈচিত্র্য, গভীরতা ও আধ্যাত্মিক আলোক আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার পরবর্তীগণ কেহ একটিকে, কেহ অপরটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই যাঁহাদের রচনায় শ্রমিক-ধনিক-সংঘাতের বা সর্বজনীন অসন্তোষের বিকাশকে লক্ষ্য করিয়া স্বকাল ও স্বসমাজের লক্ষণ পাইলাম মনে করি, তাঁহাদের আধুনিক মনে করি, এ যেমন সত্য, তেমনি যাঁহাদের রচনায় প্রকৃতিকে মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য উপাদানে পরিণত হইতে দেখি, তাঁহারাও তেমনি আধুনিক হইবেন, ইহাও তেমনি সত্য। বস্তুত কোনো লেখক ইচ্ছা করিলেও অনাধুনিক হইতে পারেন না, বড়জোর আধুনিকতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন, এই পর্যন্ত। বিভূতিবাবু ইচ্ছা করিয়া আধুনিকতাকে প্রচ্ছন্ন করেন নাই, আবার উগ্রভাবে প্রকট করিয়াও তোলেন নাই, শিল্পের ইন্দ্রধনুর সাতরঙের সঙ্গে সুকৌশলে মিশাইয়া দিয়াছেন। এই কারণে তাহা অনেকের চোখ এড়াইয়া যায়। বর্ণান্ধ ব্যক্তির মত কাব্যান্ধ ব্যক্তিও সংসারে অবিরল নয়। চোখের দোষের জন্য বস্তুকে দোষী করা কি ন্যায়সঙ্গত!

বিভূতিবাবু যে আর দশজন শক্তিশালী বাঙালি লেখকের মতই আধুনিক, স্বকাল ও স্বসমাজের লক্ষণের অধীন, এতক্ষণ ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম। এবার সেই লক্ষণের বিশেষ রূপ কি, দেখাইতে চেষ্টা করিব।

৩

সাহিত্যে প্রকৃতির দুটি রূপ দেখিতে পাই। একটি মানুষের প্রতিকূল ও প্রতিস্পর্ধী, সে মানববিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, আপন নিয়মে ও আপন প্রাণশক্তিতে পূর্ণ ও চালিত; আর-একটি মানুষের অনুকূল,

ও সর্বদা মানুষের কাছে ধরা দিতে প্রস্তুত, সে ক্ষণে ক্ষণে মানবসমাজের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া মানুষকে বিচিত্রতর ও সুন্দরতর করিয়া তুলিতেছে। প্রথমটির রূপ দেখিতে পাই হার্ডির *Egdon Heath*এ এবং হুগোর *Toilers of the Sea*র সমুদ্রে; দ্বিতীয়টির রূপ বিভিন্ন মহাকবির কাব্যে দৃশ্যমান। ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যে, কালিদাসের শকুন্তলা ও অন্যান্য কাব্যে, রবীন্দ্রনাথে, শেলি প্রভৃতির কাব্যে প্রকৃতি মানুষের অনুকূল ও অনুষঙ্গী। অবশ্য কবির স্বভাব অনুসারে এবং কালের রুচি অনুসারে তাহাতে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। ওয়ার্ডস্বার্থে পাই অধ্যাত্ম মহিমা, মানুষ ও প্রকৃতি যেন একই সাধনপন্থার সাধক ও ও উত্তরসাধক; রবীন্দ্রনাথে 'মানবের রূপ হেরি বরষার মাঝে'। একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। যাঁহারাই মানুষ ও প্রকৃতিকে একসূত্রে দেখিয়াছেন ও গাঁথিয়াছেন সকলেই কবি। বঙ্কিমচন্দ্রেও এই কবিপ্রাণতা লক্ষ্য করিবার মত। বিভূতিভূষণও মূলত কবি।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসেও প্রকৃতি ও মানুষ একসূত্রে গ্রথিত। তাঁহার সর্বজনপরিচিত অপু 'অর্ধেক মানব তুমি অর্ধেক প্রকৃতি'। কিন্তু এটি কেবল অপুর লক্ষণ নয়, বিভূতিবাবুর সমস্ত রচনারই সাধারণ লক্ষণ। তবু ওরই মধ্যে একটু প্রভেদ ও একটি বিবর্তনের বেগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার প্রথমজীবনের উপন্যাসে মানবকে নিসর্গায়িত ও নিসর্গকে মানবায়িত করিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু এ প্রকৃতি পল্লী-প্রকৃতি। বাংলাদেশের পল্লীতে প্রকৃতির যে রূপ দেখা যায় তাহা রুদ্র নয়, ভীম নয়, তাহা স্নিগ্ধ ও ক্ষুদ্র। তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, অভিভূত করে না। পল্লীবালক অপু ও পল্লীপ্রকৃতি যেন পরস্পরের খেলার সাথী, যেন পরস্পরের পরিপূরক।

তাঁহার পরবর্তী কালের গ্রন্থে, যেমন আরণ্যকে ও হে অরণ্য কথা কও গ্রন্থে, প্রকৃতির রূপ ভিন্ন। বস্তুগত ভাবে সে প্রকৃতি পাহাড়পর্বত, অরণ্যমালা ও রুক্ষ বন্ধুর ভূখণ্ড। কিন্তু এখানেও দেখি একটি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পাহাড়পর্বত, অরণ্য ও বন্ধুর ভূখণ্ড— কোনোটারই ভীমকান্ত সৌন্দর্যকে কবি দেখান নাই, কারণ তিনি দেখেন নাই। তাহাদের মুগ্ধ ও সুন্দর দিকটাই তিনি দেখিয়াছেন এবং আঁকিয়াছেন। মানব-প্রকৃতির দুর্দাম বৃত্তিগুলিকে যেমন তিনি অঙ্কিত করেন নাই, তাহার প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র রূপটাকেই যেমন তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তেমনি প্রকৃতি সম্বন্ধেও তিনি এই নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন। বয়স বাড়িলেও অপু বালকই থাকিয়া গিয়াছে, বাল্যজীবনের সরল সৌন্দর্যই তাহার প্রধান সম্পদ। এই সরল সৌন্দর্য অঙ্কনেই বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। প্রকৃতির মধ্যেও সেই সরল সৌন্দর্যেরই তিনি সন্ধান করিয়াছেন। পল্লী-প্রকৃতিতে তাহা সহজলভ্য। পাহাড়পর্বতে ও দুর্গম অরণ্যে তাহা সহজলভ্য নয়, কিন্তু একেবারে দুর্লভও নয়। এই দুর্লভের আবিষ্কারেই বিভূতিবাবুর প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে। বিভূতিবাবু সমস্ত মানবসমাজকে অপুর সমাবেশরূপে দেখিয়াছেন, আবার প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকেও পল্লীপ্রকৃতির রূপান্তরভাবে দেখিয়াছেন। তিনি কৈশোরের কবি, সরল সৌন্দর্যের সন্ধানী। গৃহের আঙিনা তাঁহাকে যেমন মুগ্ধ করে, এমন আর কিছু নয়। জীবন তাঁহার কাছে সংগ্রাম নয়, খেলাঘর। সেইজন্য রণক্ষেত্র তাঁহাকে আকর্ষণ করে নাই, করিয়াছে বালকের খেলাঘর। বৃহৎ বিশ্বকে খেলাঘরে পরিণত করিয়া দেখিতে না পারিলে যেন তাঁহার তৃপ্তি নাই। বিভূতিভূষণের বিশ্ব একটি সুবৃহৎ ও সুবিচিত্র খেলাঘর; তাহার অধিবাসীরা সকলেই বালক-বালিকা, সেখানকার পাহাড়পর্বত অরণ্য প্রান্তর সবই খেলাঘরের মাপের। তাঁহার বিশ্বকর্মা নিজেই যেন বালক, খেলার সঙ্গী গড়িয়া খেলার শখ মিটাইয়া লইতেছেন— বিভূতিভূষণ নিজেও শেষ পর্যন্ত বালক

ছিলেন। তাই জীবনের জটিল ও দুর্গম দিকটা তাঁহার চোখে পড়িত না, কিম্বা পড়িলেও জটিলতার মর্ম বুঝিতে পারিতেন না, সমস্তকেই নিজের ছাঁচে সরল করিয়া প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার দেবযান গ্রন্থখানিও এমনি একটি রহস্যময় খেলাঘর। রহস্যময় এই জন্য বলিলাম যে খেলাঘরের মত রহস্যময় আর কি হইতে পারে। জীবনের সমস্ত স্বাদ যে ক্ষুদ্রায়তনে পাওয়া যায়, তাহার আয়তনের ক্ষুদ্রতাই কি দেখিব? তাহার রহস্যের অতলতা কি কিছুই নয়?

পরলোকের মত ব্যাপার, যাহার প্রমাণ নাই, যাহার অস্তিত্বে অনেকেই অবিশ্বাসী, তাহাকে শিল্প-বস্তুতে পরিণত করা সহজ নয়। ইন্দ্রিয়াতীতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রকাশের মাধ্যম কোথায়? দুয়ের মাপকাঠি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবু বিভূতিবাবু দেবযানে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা অসাধারণ। পরলোককেও তিনি একটি খেলাঘররূপে রচনা করিয়াছেন, বড়জোর সে যেন ও বাড়ির খেলাঘর, বড়জোর তাহার খেলুড়িরা যেন আর-এক জন্মের লোক। হয়তো ঐ একটিমাত্র রূপেই পরলোককে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পবস্তুতে পরিণত করা সম্ভব, অন্য পন্থা হয়তো সত্যই নাই।

যাঁহারা দেবযান গ্রন্থে পরলোকতত্ত্ব দেখিতে পান তাঁহাদের সঙ্গে আমি একমত নই। উহা পরলোকতত্ত্ব নয়, পরলোকের উপন্যাস। বস্তুত যাঁহারা বিভূতিভূষণের রচনায় ক্ষণেক্ষণে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই সঙ্গে আমার মতের গভীর অনৈক্য। তত্ত্ব যদি কিছু থাকে থাকুক, তাহাতে বিভূতিবাবুর কৃতিত্ব নয়, বরঞ্চ যেখানেই তত্ত্বের বাড়াবাড়ি সেখানেই তাঁহার রচনার দুর্বলতা। যখনই তিনি ভাবিতে শুরু করেন, অপুর মত কথা বলেন; কিন্তু যখন তিনি অনুভব করিতে শুরু করেন, তাঁহার তুলনা নাই। বিভূতিবাবুর জগৎ চিন্ময় নয়, হৃন্ময়। ঐ খানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। মানুষের ও প্রকৃতির সংসারে (বিভূতিবাবুর কাছে দুই জনে প্রতিবেশী ও একই খেলাঘরের খেলুড়ি) যে-আনন্দ ছড়ানো রহিয়াছে, El doradoর রাজপথে যেমন মণিমাণিক্য ছড়ানো থাকে তেমনি ভাবে যে সহজ সুখদুঃখ ছড়ানো আছে —বিভূতিবাবু মুগ্ধ অপুর মত তাহা কুড়াইয়া আঁচলে সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে কি তাঁহার জগতে দুঃখ নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু তাহাও খেলাঘরের দুঃখের চেয়ে তীব্রতর নয়, খেলা ভাঙিলেই সে দুঃখ ভুলিতে বেশিক্ষণ লাগে না, অবিশিষ্ট থাকে খেলার সুখটি। যে-Joy in widest commonalty spread, তাহাকেই গভীরভাবে শুদ্ধভাবে হৃদয়ে গ্রহণ এবং সরলভাবে প্রকাশ বিভূতিভূষণের যথার্থ কৃতিত্ব এবং তাঁহার সাহিত্যিক অমরত্বের দাবিও ঐ সূত্রে।

বিভূতিভূষণের রচনার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নয়। দু-একখানা বই বাদে তাঁহার সবগুলি রচনাই সুখপাঠ্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। মূল্যবান রেশমি কাপড় যেমন নির্বিশেষে গায়ে লাগিয়া থাকে, একটুও বেখাপ হয় না, তেমনি তাঁহার ভাষা ও ভাব গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে, কোথাও এতটুকু ব্যবধান নাই। এমন যে হইতে পারিয়াছে তাহার কারণ বিষয়নির্বাচনে তিনি ভুল করেন নাই। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ পথের পাঁচালীকে অনেকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করেন। প্রথম গ্রন্থেই তিনি তাঁহার প্রতিভার যোগ্য বিষয়কে লাভ করিয়াছেন, এমন সৌভাগ্য অল্প লেখকেরই হইয়া থাকে। অনেক লেখক আছেন যাঁহারা ভুল করিতেই অভ্যস্ত। হেমচন্দ্রের স্বাভাবিক শক্তি ছিল ব্যঙ্গ-রচনায়, অথচ তিনি বৃহদাকার মহাকাব্য রচনায় শক্তির অপব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আবার নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক শক্তি লিরিক রচনায়, তিনিও মহাকাব্য রচনায় শক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন। বিভূতিভূষণ এদিক দিয়া সৌভাগ্যবান।

বিষয় ও বিষয়ী এখানে অঙ্গাঙ্গী। এমন যে হইতে পারিয়াছে তাহার আবার মূল কারণ, বিভূতিভূষণের মধ্যেকার শিল্পী ও ব্যক্তিতে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, শিল্পী ও ব্যক্তি পরস্পরের সমর্থক ও পরিপূরক ছিল। অনেক স্থলেই দেখা যায় ব্যক্তি ও শিল্পীতে একটা দ্বন্দ্বের ভাব বিদ্যমান, এবং সেই সূত্রে তাঁহাদের রচনা দ্বিধাগ্রস্ত, তাঁহাদের রচনাও পাঠককে পূর্ণ তৃপ্তি দান করিতে পারে না। বিভূতিভূষণের তুচ্ছতম রচনা ও বৃহত্তম উপন্যাস সমস্তই পাঠককে তৃপ্ত করিয়া থাকে, কারণ সেখানে ব্যক্তি ও শিল্পী দুই জনেই সমান তৃপ্তির সহিত রচনাকার্যে সহযোগিতা করিয়াছে, কোথাও এতটুকু অতৃপ্তির দ্বিধা নাই।

বাংলাদেশে বিভূতিভূষণের চেয়ে শক্তিমান লেখকের অভাব নাই, কিন্তু একমাত্র শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে এমন জনপ্রিয় ও তৃপ্তিদায়ক লেখক আর আছেন কি না সন্দেহ। ইহার কারণ তাঁহার অপু (তাঁহার সৃষ্ট সব চরিত্রই অল্পবিস্তর অপুর রূপান্তর) আমাদেরই বিস্মৃত শৈশব। তাঁহার নিশ্চিন্দিপুর আমাদেরই ছাড়িয়া-আসা গ্রাম, তাঁহার রচনা সেই গ্রামেরই মানসযাত্রার পথ ; আর স্বয়ং বিভূতিভূষণ, তাঁহার রচনা পড়িতে পড়িতে ভুলিয়া যাই তিনি যে একজন লেখক, মনে হয় তিনি যেন আমাদের শৈশবের বিস্মৃত-প্রায় খেলার সাথী, মনে হয় তিনি যেন আমাদের পূর্বজন্মের বিস্মৃত খেলার সঙ্গী। তাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র, তাঁহার অঙ্কিত পল্লীপ্রকৃতি, তাঁহার রচনা, এবং স্বয়ং লেখক-মানুষটি আমাদের এমন মুগ্ধ করে, এমন তৃপ্তিদান করে, আমাদের বিস্মৃত শৈশবকে জাগাইয়া দিয়া পুনরায় সেদিনকার খেলাঘরে এমন অনায়াস আন্তরিকতার সহিত আহ্বান করে। আমার মনে হয়, এখানেই তাঁহার জনপ্রিয়তার রহস্যের মূল। এমন কথা কয়জন সাহিত্যিক সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। সাহিত্যসভায় তিনি যোগ্য আসন পাইবেন কি না জানি না, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে এই সর্দার খেলুড়ির গলায় বনফুলের মালা পরাইয়া দিতে অন্য খেলুড়িগণ দ্বিধা মাত্র করিবে না।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বিভূতিভূষণের ছোটগল্প

যে কারণেই হোক, বাঙালি পাঠকের নিকট ছোটগল্প অপেক্ষা উপন্যাসের আদর বেশি। তাই পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপের স্রষ্টা বিভূতিভূষণ পাঠকের নিকট যত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, মেঘমল্লার, মৌরীফুল, পুঁইমাচার লেখক বিভূতিভূষণ ততটা নহেন। উপন্যাসের বৃহৎ পটভূমিকায় তেলরঙে আঁকা বর্ণাঢ্য চিত্রসম্ভার পাঠকের চোখকে এত ঝলসাইয়া দিয়াছে যে, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জলরঙে আঁকা ছোট ছোট চিত্রগুলি হয়তো পরিপূর্ণ সমাদর পায় নাই। কিন্তু মুগ্ধ পাঠকের বিচারে এই ছোটগল্পগুলির উৎকর্ষ তাঁহার উপন্যাস হইতে এক তিল কম নহে।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা লইয়া বিতর্কের অবসান আজও হয় নাই, কারণ আসলে ছোটগল্পের সংজ্ঞাই নাই। চুলচেরা হিসাব করিয়া পদে পদে মিল খুঁজিয়া অভিধান দেখিয়া সনেট রচনা যদি-বা সম্ভব হয়, অনুরূপ গাণিতিক কৌশলে ছোটগল্প লিখিবার চেষ্টার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। বিভূতিভূষণের সাফল্যের প্রধানতম

কারণ এই যে, তিনি এই গাণিতিক কৌশলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া অবলীলাক্রমে কাহিনী বলিয়া গিয়াছেন, এবং বিনা আয়াসে যাহা বলিয়াছেন তাহাই পরিপূর্ণভাবে রসোত্তীর্ণ ছোটগল্পে পরিণত হইয়াছে।

বিভূতিভূষণ দেশ ঘুরিয়াছেন প্রচুর। কিন্তু বারে বারে ফিরিয়া আসিয়াছেন যশোর জেলার এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে, যাহার শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ তাঁহার কল্পনাকে প্রেরণা জোগাইয়াছে। এই নগণ্য পল্লীর মধ্যে এত কাব্য লুকাইয়া আছে— এ খবর বিভূতিভূষণের আগে কেহ পায় নাই। ইহারই মধ্যে তিনি অবিরাম গল্পের বিষয় খুঁজিয়া পাইয়াছেন, ইহারই বাঁশঝাড় পুকুর ডোবা বনপথ বন্যকুসুমের সুবাস তাঁহাকে নব নব সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

এ কথার অর্থ ইহা নহে যে, বিভূতিভূষণ শুধু এই গ্রাম ও পারিপার্শ্বিককেই চিনিয়াছিলেন, আর-কিছুর খবর রাখেন নাই। তিনি নানা দেশ, নানা মানুষ, এমন কি বিভিন্ন কাল লইয়াও গল্পরচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কল্পনার উৎস কোথায়, তাহা বুঝিতে দেরি হয় না।

সঙ্গেসঙ্গে তিনি চিনিয়াছিলেন পল্লীর মানুষগুলিকে। গল্পের পাত্রপাত্রী হওয়ার বিশেষ-কোনো যোগ্যতা তাহাদের নাই। নাগরিক সভ্যতার হাওয়া তাহাদের গায়ে লাগে নাই, রাণাঘাটকেও তাহারা পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে, দার্জিলিঙ মেলের ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের আলোকমালা দেখিয়াও তাহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে; বাহাদুরপুর পর্যন্ত রেলপথে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের কাছে যে সম্মান পাওয়া যায়, বাহিরের পৃথিবীতে ততটা সম্মান পাইতে হইলে অন্তত সুমেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করা প্রয়োজন।

এই নিতান্ত অজ্ঞ সরল মানুষগুলির বিবরণ তাঁহার অনেক গল্পেই পাওয়া যায়। এইরূপ একদল মানুষের পরিচয় মিলে মরীচিকা গল্পে:

> ছোট্ট গাঁ, সবশুদ্ধ ঘর পঞ্চাশেক লোকের বাস। কেহ বিদেশে যায় না, চাকুরী করে না, করিবার দরকারও নাই। সামান্য জমিজমাটুকু নাড়িয়া চাড়িয়া প্রত্যেকে একরকম দিনপাত করে। কুলবেড়ে গ্রামের বাহিরে যে বড় জগৎটা আছে, সে-সম্বন্ধে কেহ কিছু জানেও না, জানিবার জন্য মাথাও ঘামায় না। তাই কাল যখন জানা গেল, চাটুয্যে-বাড়িতে মেয়ে দেখিতে যে আসিতেছে, সে কলিকাতার ছেলে ও কলেজে শিক্ষিত, তখন এই অদৃষ্টপূর্ব জীবটিকে দেখিবার ও তাহার সহিত কথাবার্তা কহিবার আনন্দটা খাওয়ার আনন্দকে ছাপাইয়া উঠিল। —মৌরীফুল, মরীচিকা, পৃ ১১২

উপরের বর্ণনা শুধু কুলবেড়ে গ্রামের নহে, বিভূতিভূষণের রচনায় যতগুলি পাড়াগাঁয়ের বিবরণ আছে, সকলের উপরেই প্রযোজ্য। এ যেন একটা ভিন্ন জগৎ। এ জগতে কলকারখানা নাই, মোটরগাড়ি-ট্রাম নাই, সিনেমা নাই, হয়তো কাছাকাছি রেলপথও নাই। এখানে দিগন্তপ্রসারী মাঠ আছে, ধানক্ষেত আছে, ঘনবন ঝোপঝাড় আছে, বৈঁচীর জঙ্গল আছে, ঘেঁটুফুলের মৃদুমধুর সুবাস আছে। অপরাহ্ণে পল্লীবধূ নির্জন মেঠো পথ দিয়া পুকুরে জল লইতে আসে, গা ধুইতে ধুইতে সূর্যের শেষরশ্মি মিলাইয়া যায়, চকিতে কলস ভরিয়া লঘুপদে শঙ্কিতা বধূ বাড়ি ফিরিয়া যায়।

অতীতের কাহিনী নয়, মোটামুটি বর্তমান যুগেরই কথা। নাগরিক জীবনের অবিশ্রাম চঞ্চলতা এখানে অজ্ঞাত, কলিকাতার মত শহর দুরধিগম্য। নাগরিক সভ্যতার বড় সুখদুঃখের খবর ইহারা পায় নাই, নিজেদের ছোট সুখদুঃখ লইয়াই ব্যস্ত, বৃহত্তর সুখেরও প্রয়োজন অনুভব করে না, দুঃখেরও খবর রাখে না।

বিভূতিভূষণের রচনার রসোপলব্ধি করিতে হইলে এই মানুষগুলি ও তাহাদের পারিপার্শ্বিকের সহিত

ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই অতিসাধারণ নগণ্য প্রাণীগুলির জন্মমৃত্যু-আনন্দ-বেদনার কাহিনীই তাঁহার ছোটগল্পের অন্যতম উপজীবিকা।

ইহারা দেবদেবী মানে এবং দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস কখন্ ছেলেমানুষীতে পরিণত হয় ইহারা জানিতেও পারে না। পুরাণোক্ত দেবদেবী এবং মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবদেবী তো আছেনই, তাহা ছাড়া যে-কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনার সংবাদ পাইলেই দৈবশক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া মানিয়া লয়। বাঁশের খুঁটির মধ্যেও দেবতা লুকাইয়া থাকেন, প্রয়োজন হইলে দেখা দেন, বিপদে উদ্ধার করেন, রোগীকে রোগমুক্ত করেন। নন্দলালের বড়ছেলের বউ বিবাহের চার বৎসর পরে ক্যান্সারে পড়িল, জীবনের কোনো আশা রহিল না, যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে একরাত্রে তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িল—

তাহার মনে হইল, পাশের খুঁটিটা আর খুঁটি নাই। তাহাদের গ্রামের শ্যামরায়-মন্দিরের শ্যামরায় ঠাকুর যেন সেখানে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।· ·শ্যামরায়ের মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়— তেমনি সুন্দর, সুঠাম, সুবেশ কমনীয় তরুণ দেবীমূর্তি !· ·

—মৌরীফুল, খুঁটি-দেবতা, পৃ ৮৪

বধূর রোগ সারিয়া গেল। লেখক বলিতেছেন, "সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু খুঁটি-দেবতা সেই হইতে এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।" কিন্তু সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। যাহাদের ধর্মের ভিত্তি বিশ্বাস, তাহারা স্বপ্নে শ্যামরায়কে দেখিয়া রোগমুক্ত না হইলেই বিস্ময়ের কারণ ঘটে।

প্রচলিত মাপকাঠিতে ফেলিয়া বিচার করিলে এ গল্পটির মধ্যে অনেক খুঁত মিলিবে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের ভিত্তিতে আইনকানুনের বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই, তাই ছোটগল্পের কোনো নিয়ম না মানিয়াও রসিকের বিচারে গল্পটি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এমনি নিয়মবিহীন বেহিসাবী গল্প বিভূতিভূষণের অনেক আছে। 'হাসি' গল্পটি অলৌকিক ঘটনার আখ্যান: পশ্চিমের কোনো স্টেশনে কয়েকজন বন্ধু শীতে কাতর হইয়া বসিয়া আছে, রাত্রির অন্ধকারের সহিত শীতের হাওয়া মিশিয়া যে অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে, একজন তাহাকে বলিল 'uncanny sensation'। তাহার পরে স্টেশনমাস্টার আসিলেন, গল্প করিলেন সুন্দরবনের মধ্যে নদীর উপরে নৌকায় বসিয়া একরাত্রে হাসির শব্দ শুনিয়াছিলেন, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

আর বিশেষ কিছু নাই গল্পটিতে। কিন্তু গল্প শেষ হইবার পূর্বেই পাঠকের শরীরও uncanny sensationএ ভরিয়া যায়, যদিও ভীতিপ্রদর্শনের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও গল্পটির মধ্যে নাই। লেখক অত্যন্ত সহজ ভাষায় বিনা কারিকুরিতে গল্প বলিয়া গিয়াছেন, পাঠক তাহাতেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।

'প্রত্নতত্ত্ব' গল্পটিও অতিপ্রাকৃত বিষয় লইয়া। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাচীন মূর্তি খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহারই সূত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাঁহার কাছে আসিয়াছেন। গল্পের বক্তব্য এ যুগের নহে, প্রাচীন বৌদ্ধযুগের আভাস আসিয়াছে প্রত্নতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া।

বৌদ্ধযুগ লইয়া বিভূতিভূষণ একাধিক গল্প রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বহুবৎসর পূর্বে রচিত 'মেঘমল্লার' অবিসংবাদীভাবে শ্রেষ্ঠ। শুধু বিভূতিভূষণের রচনার মধ্যে নহে, সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের ছোটগল্পের সম্ভার খুঁজিলে এমন সার্থক গল্প সামান্য কয়েকটির বেশি পাওয়া যাইবে না। অতি বড় গাণিতিক সমালোচকও ইহার ত্রুটি ধরিতে ইতস্তত করিবেন।

তরুণ ছাত্র প্রদ্যুম্ন বাঁশির আলাপে অদ্বিতীয়। সুরদাস ছদ্মনামধেয় কাপালিক গুণাঢ্যের প্ররোচনায় সে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত্রে মেঘমল্লার আলাপ করিয়া দেবী সরস্বতীকে পৃথিবীতে আকর্ষণ করিয়া আনিল, সেই রাত্রেই গুণাঢ্যের মন্ত্রে তিনি বন্দিনী হইলেন, দেবীত্ব ভুলিয়া সামান্যা অসহায়া ভীরু মানবীতে পরিণত হইলেন। ফলে দেশ হইতে বিদ্যা ও শিল্পকলা অন্তর্হিত হইল, শিল্পী ছবি আঁকা ভুলিলেন, পণ্ডিত ব্যাকরণ ভুলিলেন, ভাস্কর তথাগতের মূর্তি গড়িতে গিয়া গড়িলেন দস্যু দমনকের মূর্তি।

দেবীর পূর্বরূপ ফিরাইয়া দিবার একটিমাত্র উপায়, কেহ যদি মন্ত্রপূত জল তাঁহার গায়ে ছিটাইয়া দেয়। কিন্তু যে এ কাজ করিবে, সেই মুহূর্তে সে পাথরে পরিণত হইবে। গুণাঢ্য কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত, কিন্তু পাথরে পরিণত হইতে রাজি নয়। কারণ, 'মৃত্যুর পরে হয়তো পরজগৎ আছে, কিন্তু পাষাণ হওয়ার পর ?'

সে কাজ করিল প্রদ্যুম্ন, বাঁশির আলাপে যে দেবীকে গুণাঢ্যের প্রভাবে আনিয়াছিল।

ভাষার দিক দিয়া এ গল্পটির তুলনা নাই—

হঠাৎ সামনের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে সারা মাঠটা তরল আলোকে প্লাবিত হয়ে গেল! প্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখলে, মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী! তাঁর নিবিড় কৃষ্ণকেশরাজি অযত্নবিন্যস্ত-ভাবে তাঁর অপূর্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর আয়তনয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ্ম কোন স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা, তাঁর তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্যপুষ্পাভরণে মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্যে মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটে উঠেছে· ·হাঁ, এই তো দেবী বাণী! —মেঘমল্লার, পৃ ১৩

একাধিক লেখক প্রাচীন যুগের কাহিনীতে সাফল্যলাভ করিয়াছেন, কিন্তু সকলেই সে যুগের আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন সংস্কৃতভাঙা ভাষার সাহায্যে। একান্ত পরিচিত সহজ ভাষায় প্রাচীন বৌদ্ধযুগের মায়া রচনা করিয়া পাঠককে বিভোর করিতে ইহার পূর্বে আর কেহ পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। এইখানেই বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব। তাঁহার ভাষা বিষয়নিরপেক্ষ হইয়া শুধু রচনার গুণে বাঙলার পল্লী, বিহারের বনভূমি, বৌদ্ধযুগের বিদিশার আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। পল্লীবধূর মর্মবেদনা, রূপহীনা গরিবের মেয়ের লোভাতুরতার ট্রাজেডি, অশরীরী আত্মার তীব্র হাহাকার, সবই ফুটিয়াছে ঐ একই ভাষার সাহায্যে। মুন্সীয়ানা দেখাইবার চেষ্টা নাই, ফলে ভাষার সহজ সাবলীল গতি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পাঠককে চমক লাগাইবার প্রয়াস নাই, বিনা আয়াসেই পাঠকের মন মুগ্ধ বিস্মিত হয়, স্থানকালের বন্ধন ভুলিয়া কখনো প্রাচীন বিদিশায়, কখনো বাঙলার পল্লীতে, কখনো বা তিন শ বছর আগে কীর্তি রায়ের দেশে ঘুরিয়া ফিরে।

'মৌরীফুল' ও 'পুঁইমাচা' দুইটি পল্লীরমণীর ইতিহাস। এক জন তরুণী, কালোর মধ্যে সুন্দরী, মুখরা। অপর জন কিশোরী, রূপহীনা, অতিদরিদ্রের কন্যা এবং আহার-বিষয়ে অতিলোভী। এই দুইটি মেয়ের জীবনের দুঃখও দুই রকম। এক জন স্বামীর কাছে সোহাগ চাহিয়া পায় নাই, সেই রাগ ভুলিয়াছে স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ির সহিত কলহ করিয়া। আরেক জনেব স্বল্পস্থায়ী জীবনের অসহনীয় দারিদ্র্যে কোনো দিন পেট ভরিয়া আহার জুটিল না, শুধু মায়ের লজ্জা ও বাপের বিপদের কারণ হইয়াই রহিল।

সুশীলাকে শ্বশুর-শাশুড়ি কলহপ্রিয়া মুখরা বধূ বলিয়াই চিনিল, তাহার মধ্যে হৃদয় বলিয়া যে কিছু থাকিতে পারে, সে খবর কেহ পাইল না। স্বামী সারাদিন চাকুরি করে, গভীর রাত্রিতে বন্ধুমহলে আড্ডা

দিয়া যখন ফিরে, তখন আর স্ত্রীকে সোহাগ করিবার সময় থাকে না, কোনো রকমে খাইয়া শুইতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু আঠারো বছর বয়সের তরুণী বধূর হৃদয় স্বামীর নিকট একটু আদরের আকাঙ্ক্ষায় আকুল, সে নানা ছলে সেই আদরটুকু আদায় করিতে চায়। কিন্তু সেই আদরের আকাঙ্ক্ষাই কখন তুমুল ক্রোধে পরিণত হয়, নিজেই বুঝিতে পারে না।

সুশীলা গল্প শুনিতে চায়। উদ্দেশ্য আর কিছু নহে, গল্পের ছলে স্বামীকে জাগাইয়া রাখিয়া এক ফাঁকে একটু সোহাগ আদায় করা। জিদ করিয়া বলে—

বলো না একটা, একটা ছোট দেখেই না হয় বলো— এত ক'রে বলছি, একটা কথা রাখতে পারো না?
কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিল— আঃ! এ তো বড় জ্বালা হল! রাতেও একটু ঘুমুবার যো নেই— সমস্তদিন তো গলাবাজিতে বাড়ি সরগরম রাখবে, রাত্তিরটাও একটু শান্তি নেই?
এইটাই ছিল সুশীলার ব্যথার স্থান। স্বামীর মুখে এ কথা শুনিয়া সে ক্ষেপিয়া গেল— বেশ করি, গলাবাজি করি, তাতে অসুবিধা হয় আমাকে পাঠিয়ে দাও এখান থেকে— রাতদুপুর করলে কে! নিজে আসবেন রাতদুপুরের সময় আড্ডা দিয়ে, কে এত রাত পর্যন্ত ভাত নিয়ে বসে থাকে? নিজেরই দেহ, পরের আর তো দেহ না! খেটেখুটে এসে একেবারে রাজা করেছেন আর কি! নিজের খাটুনিটাই কেবল· · —মৌরীফুল, পৃ ৯

এ হেন উত্তরের পরে ক্রমে যাহা ঘটা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ঘটিল, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহার, এবং স্ত্রী কর্তৃক নখাঘাতে স্বামীর হাতে রক্তপাত। এমন বধূকে ভালোবাসিতে পারে কে?

পরদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সুশীলার সহিত আলাপ হইল ধনী ঘরের এক বধূর সহিত। অল্প আলাপেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্টা হইয়া সখীত্বকে দৃঢ় করিল নদীর ধারের মৌরীফুল উপলক্ষ করিয়া 'মৌরীফুল' পাতাইয়া।

মেলায় এক বুড়ি ঔষধ বেচিতেছিল, স্বামীর প্রেম নিবিড় করিয়া পাওয়ার আশায় সুশীলা তাহার কাছে ঔষধ কিনিল, কিন্তু সেই ঔষধই কাল হইল। স্বামীকে খাওয়াইতে গিয়া সুশীলা ধরা পড়িয়া গেল, সকলে ধরিয়া লইল সে স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে। ঠিক হইল, এমন বধূকে দূর করিয়া দেওয়া হইবে পরদিনই।

সেই একদিন একরাত্রি ধরিয়া বধূ কত অতীতের স্বপ্ন দেখিল— ভবিষ্যৎ যাহার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে যেমন করিয়া দেখে, তেমনি করিয়া। বিবাহের অব্যবহিত পরে স্বামীর প্রেম, কত আশা, কত আনন্দ। স্বপ্ন শেষ হইয়া গেল। সুশীলা ভাবিল, জগতে কেউ তাহাকে ভালোবাসে না, কেবল ভালোবাসে মৌরীফুল।

কিন্তু সে ভালোবাসার অভিব্যক্তির সময় মিলিল না। যখন স্বামী তাহার উপর বিরূপ হয় নাই, তখন যেসব পরীর গল্প করিত, সেইসব জ্যোৎস্নারাতের পরীর দেশেই বোধ হয় সুশীলা চলিয়া গেল দুইদিন মাত্র জ্বর ভোগ করিয়া। শেষ কথা শুধু বলিল, 'সত্যি মৌরীফুল, তা নয়, ওরা যা বলছে— আমি অন্য ভেবে· ·'

এই ভাগ্যহীনা রমণীর অব্যক্ত বেদনা আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলে, কিন্তু যাহারা জীবিতকালে তাহার মনের কথা বুঝে নাই, বোঝার চেষ্টাও করে নাই, আসন্নমৃত্যুকালেও তাহারা বুঝিল না— মৌরীফুলই বা কে, আর বধূ কি ভাবিয়া কি যেন করিতে গিয়াছিল, যাহাতে বিপরীত ফল ফলিল।

'পুঁইমাচা' গল্পের ক্ষেন্তি চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের মেয়ে, 'লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও আগোছালো— বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দুটা ডাগর-ডাগর ও শান্ত।' মেয়েটির লোভের অন্ত নাই। আহারের বিন্দুমাত্র উপায় থাকিলে প্রায় অখাদ্য জিনিসও কুড়াইয়া আনিতে তাহার আপত্তি নাই। লোকের বাড়ির বাগান পরিষ্কার করিবার জন্য বৃদ্ধ পীতবর্ণ পুঁইগাছ ফেলিয়া গিয়াছে, ক্ষেন্তি তাহাই কুড়াইয়া আনিয়াছে। গরিবের ঘরে বয়স্থা কুমারী মেয়ে থাকাই পাপ, তাহার উপরে আবার রূপহীনা। সকলকে ছাপাইয়া তাহার লোভাতুরতা অসহ্য। মায়ের রাগ হইবারই কথা, তা বাপ যতই আপনভোলা হইয়া মাছের চার এবং খেজুর-রসের সন্ধানে ফিরিয়া বেড়ান।

বিবাহ হইলে ক্ষেন্তি নাকি চার ছেলের মা হইত, এবং তৎসত্ত্বেও খাওয়ার নামে তাহার জ্ঞান থাকে না, মেয়ের এতখানি নোলা মায়ের অসহ্য। পুঁইডাঁটা আস্তাকুড়ে স্থান পাইল, ক্ষেন্তির রসনা বুঝি আর তাহা আস্বাদনের সুযোগ পাইল না। কিন্তু খাওয়ার সময়ে ক্ষেন্তি দেখিল পুঁইডাঁটা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং চচ্চড়িতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

পুঁইডাঁটা-লোভী মেয়েটি কোথা হইতে একটা পুঁইগাছের চারা আনিয়া অসময়ে পুঁতিয়া রাখিল, ভবিষ্যতে বড় হইয়া রসনার ইন্ধন জোগাইবে এই ভরসায়। সেই পুঁইগাছ একদিন বড় হইল, কিন্তু ক্ষেন্তির ভোগে আসিল না। তাহার আগে অনেক-কিছু ঘটিয়া গেল, ক্ষেন্তির বিবাহ, পতিগৃহে যাত্রা, এবং মৃত্যু—

যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে· ·বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে· ·সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!· ·—মেঘমল্লার, পুঁইমাচা, পৃ ১৭৮

নায়িকা হওয়ার উপযুক্ত গুণ মৌরীফুল গল্পের সুশীলার যদি-বা থাকিয়া থাকে, ক্ষেন্তির একেবারেই নাই। দরিদ্রা পল্লীবধূর বহুতর দুঃখবেদনা লইয়া কাহিনী রচিত হইয়াছে, কিন্তু লোভরূপ ট্রাজেডি আগে বোধ হয় স্থান পায় নাই।

শুধু কয়েকটি গল্পের সাহায্যে বিভূতিভূষণের সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষের বিচার সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহার সহানুভূতি কোন দিকে, এই কয়টি গল্প হইতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যে সরস্বতী প্রদ্যুম্নের বাঁশির টানে মর্ত্যে আসিয়া গুণাঢ্যের মায়ায় বন্দিনী হইয়াছিলেন, বিভূতিভূষণের লেখনীর উপর তাঁহার আশিস অমিতপরিমাণে বর্ষিত হইয়াছিল, তাই যাহাই তিনি লিখিয়াছেন, প্রায় সবই সুপাঠ্য ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে।

বাঙালি যতই নাগরিক সভ্যতা আশ্রয় করুক, তাহার অন্তরে ছায়াশীতল পল্লী সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা থাকিয়াই যায়। তা সে জীবনে এক পা-ও শহরের বাহিরে না গিয়া থাকিলেও। গ্রামের সম্বন্ধে যে কল্পনা তাহার মনকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার সহিত বাস্তবের খুব বেশি মিল হয়তো সব সময়ে থাকে না। কিন্তু সেই গ্রামের এবং তাহার মানুষগুলির কথা সহৃদয়তার সহিত বলিতে পারিলে তাহার মন আকৃষ্ট হইতে বাধ্য। বিভূতিভূষণের সাফল্যের মূলে এই কারণটি অন্তত কিছু পরিমাণে বর্তমান। আরো অনেক লেখকই পল্লীজীবনের কাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সকলে যে অনুরূপ সাফল্যলাভ করেন নাই, তাহার কারণ পল্লীকে বিভূতিভূষণ যেমন ভাবে চিনিয়াছিলেন, পল্লীর মানুষের সহিত নিজেকে

যেমন ওতপ্রোত ভাবে মিশাইয়াছিলেন, ততটা হয়তো সবাই পারেন নাই। বিভূতিভূষণ দূর হইতে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়া মানুষের সুখদুঃখ দেখিয়া যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের সুখদুঃখের অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার অনুভূতি তাঁহার সরস লেখনীর সহিত মিশিয়া যে রস সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কখনো শান্ত, কখনো করুণ, কখনো রুদ্র, কিন্তু সব সময়েই মধুর।

বাঙালি পাঠকের যতটা সমালোচক-দৃষ্টি, অন্য ভাষার পাঠকদের বোধ হয় ততটা নয়। সাধারণ পাঠকের বিচারে যাহা মেকি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, বাঙলা সাহিত্যে তাহা কখনো দীর্ঘজীবী হয় নাই। বাঙালি পাঠক যাহা ভুল করিয়াছে, অন্য দিকে। মেকিকে আসল বলিয়া ভ্রম তাহার হয় নাই, কিন্তু উৎকৃষ্টকে সাধারণ বলিয়া ভুল কখনো কখনো সে করিয়াছে। কালের বিচারে সেসব রচনা বিস্মৃতির অন্তরাল হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু যেসব সৌভাগ্যবান লেখকের লেখাকে পাঠক প্রথম হইতেই সাদর সম্বর্ধনা জানাইয়াছে, বিভূতিভূষণ তাঁহাদের অন্যতম। তবু মনে হয়, ছোটগল্প-লেখক বিভূতিভূষণ এখনো তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পান নাই। তাঁহার যে কল্পনা কখনো অজয় নদীর তীরে, কখনো দ্বারবাসিনীর বৈষ্ণবপল্লীতে, কখনো মধ্যপ্রদেশের গভীর অরণ্যে, কখনো-বা প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বিদিশায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে, আবার অসহিষ্ণুভাবে যশোর জেলার ছোট পল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি তাঁহার উপন্যাসে নহে, ছোটগল্পে।

কিন্তু শুধু কল্পনা নহে। নিছক কল্পনা দিয়া কাল্পনিক মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী হয়তো লেখা যায়, কিন্তু প্রাণের সৃষ্টি করা যায় না। বাস্তবের সহিত কল্পনার এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিভূতিভূষণের লেখনীতে হইয়াছিল বলিয়াই তাহার এত সার্থকতা।

শ্রীআর্যকুমার সেন

পথের পাঁচালি

. . পথের পাঁচালির আখ্যানটা অত্যন্ত দেশি। কিন্তু কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালি যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, নতুন জিনিস ঝাপসা হয় নি, মনে হয় খুব খাঁটি, উঁচুদরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তা দরের রাঙতায় সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েচি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই, দেখা হয়েচে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখি নি। এই গল্পে গাছপালা পথঘাট মেয়েপুরুষ সুখদুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েচে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতো সে সুস্পষ্ট। . .

১৩৪০

রবীন্দ্রনাথ

জর্জ বার্নার্ড শ

শিল্পী পিকভ

জর্জ বার্নার্ড শ

১৮৫৬-১৯৫০

শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী

জর্জ বার্নার্ড শ'র ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী সংক্ষেপে বলতে গেলে কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়: ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে, অর্থাৎ প্রায় ৯৫ বৎসর পূর্বে, আয়র্লণ্ডে ডাবলিন শহরে তিনি এক দরিদ্র প্রটেস্টাণ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জর্জ কার্ শ এবং পিতৃকুল থেকে তিনি পেয়েছিলেন এক বিশেষ জাতের কৌতুকপরায়ণতা, যা আপন উচ্ছলতায় স্থান কাল পাত্রের বাধা অস্বীকার করে সভ্যসমাজের বিস্ময় এমনকি ক্রোধ উদ্রেক করেছে। কার্যকালে নিজের জীবনে বিপরীত ব্যবহার সত্ত্বেও জর্জ কার্ শ বাক্যে এবং মনে মদ্যপানবিরোধী ছিলেন। পুত্রের চরিত্রে পিউরিটান সংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল এবং শুধু মদ নয় ধূমপান পর্যন্ত তাঁর অভ্যাসবিরুদ্ধ ছিল। মাতা লুসিণ্ডা এলিজাবেথের নিকট শ পেয়েছিলেন তীব্র সংগীতানুরাগ এবং অসাধারণ কল্পনাপ্রবণতা। শৈশবে স্নেহহীন শাসনহীন উদাসীন পরিবেশে একপ্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে তিনি মানুষ হন। বিদ্যালয়ে শিক্ষা এমন কিছু পেয়েছিলেন বা পান নি যার ফলে উত্তরকালে নিজের শৈশব সম্বন্ধে উৎসাহসূচক কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কৈশোরে মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে পারিবারিক অর্থাভাবনিবন্ধন বিদ্যালয় ত্যাগ করে অর্থোপার্জনের জন্যে তাঁকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। তার পূর্বেই অবশ্য তিনি লিখতে শুরু করেন। আফিসের কাজে যথাসম্ভব অবহেলা প্রদর্শন করে ঐ বয়সেই তিনি ধর্মবিষয়ে তর্কপটুতা, সাহিত্যপ্রচেষ্টা এবং সংগীত-প্রিয়তার পরিচয় দেন। ডাবলিনে বাস করা অসম্ভব বিবেচনা করে জননী যখন আসবাবপত্র বিক্রয় করে লণ্ডনে চলে গেলেন তখন ঘরে শুধু পতিপুত্র নয়, পিয়ানোযন্ত্রটিও রেখে গেলেন। সংগীতহীন গৃহে সংগীত সৃষ্টি করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন পুত্র এবং নিজের চেষ্টায় এবং আনন্দে দ্রুতবেগে তাঁর সংগীতশিক্ষা অগ্রসর হল।

ইতিমধ্যে আফিসের কাজে তাঁর উন্নতি হয়েছিল, তথাপি ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে, অর্থাৎ প্রায় কুড়ি বৎসর বয়সে, তিনি আফিস পরিত্যাগ করে মাতার কাছে লণ্ডনে উপস্থিত হন। সম্বল ছিল তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস, অক্লান্ত পরিশ্রম-পরায়ণতা। লণ্ডনে অত্যধিক দারিদ্র্যের মধ্যে প্রথমটা অর্থোপার্জনে সফল হন নি বটে কিন্তু সাহিত্য-প্রচেষ্টার তাঁর বিরাম ছিল না: নিয়ম করে প্রত্যহ পাঁচ পৃষ্ঠা (quarto pages) লিখতেন, ফলে লেখা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনায়াসসাধ্য। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৩ এই পাঁচ বৎসরে তিনি পাঁচটি উপন্যাস লিখে ফেলেছিলেন।

১৮৭৬ থেকে ১৮৮৫ সাল শ'র জীবনে চরম দারিদ্র্যের কাল। সঙ্গেসঙ্গে এ কথাও বলা যেতে পারে— এটা তাঁর শিক্ষার কাল। অবশ্য শিক্ষাটা তিনি অর্জন করছিলেন লণ্ডনে, জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে। দরিদ্র পিতা এবং দরিদ্র মাতা নিজেদের সামান্য আয় থেকে সাহায্য করে শ'কে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সাংসারিক অর্থে কোনো কাজেই তিনি প্রবেশ করলেন না। বলা বাহুল্য, তাঁর উপন্যাস কোনো প্রকাশকের আগ্রহ উৎপাদন করে নি।

এই নয় বৎসরে লিখে তিনি পেয়েছিলেন ছয় পাউণ্ড, তার মধ্যে পাঁচ পাউণ্ডই আয় হয়েছিল একটি বিজ্ঞাপন-রচনায়, পাঁচ শিলিং একটি ব্যঙ্গকবিতা লিখে এবং বাকি পনেরো শিলিং পেয়েছিলেন একটি গদ্য রচনা করে। আর্থিক অসাফল্য তাঁকে নিরুদ্যম বা স্বধর্মচ্যুত করতে পারে নি। তথ্য, তত্ত্ব এবং চিন্তার জগতে তাঁর স্বাধীন বিচরণ এবং নিরলস সাহিত্যপ্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। ব্রিটিশ মিউজিয়মে তাঁর অধিকাংশ সময় কেটেছে। জীবন সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন এই সময়ে, লণ্ডনে। প্রচলিত ধর্মের অযৌক্তিকতা এবং মিথ্যা অতিরঞ্জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে শ্লেষাত্মক কৌতুকবাণ নিক্ষেপ করার আগ্রহ ছেলেবেলা থেকেই তাঁর একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল; লণ্ডনে অত্যধিক শেলী-প্রীতির ফলে সেই আগ্রহ ক্রমে 'না-ঈশ্বর বিশ্বাসে' পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবনে এই নেতিপ্রধান যুগ কেটে যেতে বেশি দেরি হয় নি। প্রচলিত ধর্মের ঘোরতর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃতি এমনই ধর্মনির্ভর যে তাঁকে স্বধর্ম আবিষ্কার করতে হয়েছে এবং তার পর তাঁর নিজস্ব ধর্ম তিনি উগ্রভাবে প্রচার করেছেন।

১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে এই ভাবী তর্কবীর লণ্ডনে একটি বিতর্কসভায় যোগ দেন এবং বক্তৃতাকালে নিদারুণ হৃৎস্পন্দন অনুভব করেন। এই দুর্বলতা তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে যাওয়ামাত্র সংকল্প করলেন যে এখন থেকে তিনি প্রত্যেক সভায় উপস্থিত হবেন এবং সুযোগ পেলেই বলবেন। এই সংকল্প তিনি কার্যে পরিণত করেছিলেন। তিন বৎসর পর ১৮৮২ সালে এইরকম এক সভায় তিনি আমেরিকার বিখ্যাত বক্তা হেনরি জর্জের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। ফলে ধর্ম বনাম বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি ছেড়ে অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সমাজব্যবস্থা বিষয়ে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হন। এই সময়েই তিনি মার্ক্স-এর *Das Capital* পড়েন এবং সমাজতন্ত্রবাদের সারতত্ত্বে বিশ্বাস তখন থেকেই স্থাপন করেন। সমাজতন্ত্রবাদ তাঁর ধর্মে পরিণত হয়। তিনি Fabian Societyতে যোগ দেন ১৮৮৪ সালের মে মাসে, এবং অচিরেই এই দলের অন্যতম প্রধান বক্তা এবং নেতায় পরিণত হন। তাঁর এই সমাজতান্ত্রিক যুগে উপন্যাসগুলি ধারাবাহিক ভাবে অ্যানি বেসান্ট সম্পাদিত OUR CORNER কাগজে প্রকাশিত হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে TO-DAY কাগজে তাঁর শেষ উপন্যাস *An Unsocial Socialist* প্রকাশিত হচ্ছিল।

১৮৮৫ সাল থেকে শ'র সাহিত্যপ্রচেষ্টা অর্থাগমের দিক দিয়ে খানিকটা উন্নতি লাভ করে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে সহাধ্যায়ী বন্ধু উইলিয়ম আর্চারের সহায়তায় THE PALL MALL GAZETTEএ পুস্তক-সমালোচনার কাজ পান; অতঃপর এই কাজে এবং THE WORLD ও OUR CORNER কাগজে চিত্র সমালোচনা দ্বারা ১৮৮৫ সালে সর্বশুদ্ধ তাঁর আয় ১১২ পাউণ্ডে[১] দাঁড়ায়। বিগত নয় বৎসরের তুলনায় ১৮৮৫ সালে তাঁর আয়, শ'র ভঙ্গিতে বলতে গেলে, শতকরা ১৬৭০০ বা ১৬৭ গুণ বেড়েছিল। ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৮ এই কয় বৎসরকাল বিভিন্ন কাগজে যথাক্রমে পুস্তক, চিত্র, সংগীত এবং নাট্যসমালোচনা দ্বারা লণ্ডনের চিন্তাশীল সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য উৎপাদন করেন। সংগীতে ওয়াগনার এবং নাটকে ইব্‌সেন এই দুই নবাগত শিল্পীর আদর্শ তিনি প্রচার করেন। সংগীত এবং নাট্যকলা সম্বন্ধে তাঁর এই সময়কার মতামত *The Perfect Wagnerite, The Quintessence of Ibsenism, Dramatic Opinions and Essays* গ্রন্থে এবং অর্থনৈতিক মতামত *Fabian Essays* ইত্যাদি গ্রন্থে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে।

১ মরিস্ কলবোর্ন (*The Real Bernard Shaw* গ্রন্থে) বলছেন ১১৭ পাউণ্ড ৩ পেন্স

শ'র জীবনে ১৮৯৮ সাল বিশেষভাবে স্মরণীয়: এই বৎসর কঠিন পীড়ানিবন্ধন তিনি *Saturday Review* কাগজে নাট্যসমালোচনার কাজ ছেড়ে দেন, ইতিমধ্যে অবশ্য নাট্যকার হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা হতে থাকে এবং ঠিক এই সময় আমেরিকার রঙ্গমঞ্চে তাঁর একটি নাটক (*The Devil's Disciple*) অভিনয়ের ফলে বিশেষ অর্থাগমের সূচনা হয়; বিগত বারো বৎসর তিনি সপ্তাহে প্রায় তিনদিন যত্রতত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন এবং জনসভার বক্তা হিসাবে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন— এই সময় থেকে এত ঘনঘন বক্তৃতা দেওয়া ছেড়ে দেন; এই বৎসরেই তিনি প্রচুর বিত্তশালিনী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর সাংবাদিক-সমালোচক এবং বক্তার জীবন একরূপ শেষ হয়— যদিও মাঝে মাঝে সমালোচনা এবং বক্তৃতাদান দুইই করেছেন— নাট্যকারের কাজই প্রধান স্থান অধিকার করে এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর হয়।

শ'র প্রথম নাটক *Widowers' Houses* উইলিয়ম আর্চারের সহযোগিতায় (কথা ছিল প্লট উদ্ভাবন করবেন আর্চার এবং শ লিখবেন সংলাপ) লেখা আরম্ভ হয় ১৮৮৫ সালে, দুই অঙ্ক লেখার পর আর্চারের পছন্দ না হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়। সাত বৎসর পর ১৮৯২ সালে 'নূতন নাটকে'র তাগিদে শ নাটকখানা শেষ করেন এবং Independent Theatreএ প্রথম অভিনীত হয়। এ ছাড়া ১৮৯৩ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে শ যথাক্রমে *The Philanderer, Mrs. Warren's Profession, Arms and the Man, Candida, The Man of Destiny, You Never Can Tell, The Devil's Disciple, Caesar and Cleopatra* এবং *Captain Brassbound's Conversion* এই নয়খানা নাটক রচনা করেন। রঙ্গমঞ্চে আর্থিক সাফল্য অর্জন না হোক, চাঞ্চল্য উৎপাদনের দিক দিয়ে শ কৃতকার্য হয়েছিলেন বলা চলে। নাটকীয় উৎকর্ষের দিক দিয়ে *Candida, The Devil's Disciple,* এবং *Captain Brassbound's Conversoin* সম্বন্ধে মোটের উপর সমালোচকেরা একমত হয়েছিলেন। উইলিয়ম আর্চার *Mrs. Warren's Profession*এরও প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু সেন্সর এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেওয়ায় বহুকাল অভিনীত হতে পারে নি। অন্য নাটকগুলির সম্বন্ধে মতভেদ হলেও এটা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, লেখকের নাট্যক্ষমতার পরিচয় প্রত্যেক বইএ পাওয়া গেছে। শ'র নাট্যকাররূপে খ্যাতির সোপান হিসাবে এই প্রথম দশটি নাটকের উল্লেখ করা চলে।

১৯০১ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে তাঁর খ্যাতির সূর্য প্রায় মধ্যগগনে উঠেছে। সাতটি নাটকের মধ্যে চারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: *Man and Superman, John Bull's Other Island, Major Barbara, The Doctor's Dilemma* রচনার পর তাঁর নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এই সময় ভেন্‌ড্রেন-বার্কার (*Vendrenne-Barker*) এর যুগ্ম পরিচালনায় Court Theatreএ বিশেষ করে তাঁর নাটক অভিনীত হয়ে নাট্যামোদী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আনন্দদান করেছে। এর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নাটকের পর নাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসাবে *Getting Married, The Shewing-up of Blanco Posnet, Misalliance, Fanny's First Play, Androcles and The Lion, Pygmalion* ইত্যাদির নাম করা চলে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর *Heartbreak House* প্রকাশিত হয়, অতঃপর *Back To Methuselah* এবং *Saint Joan*এ শ নাট্যকার হিসাবে কীর্তির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। এর পরও তিনি বহু নাটক লিখেছেন (শেষ

নাটক ১৯৫০ সালে অর্থাৎ মৃত্যুর বৎসরে লেখা) ; তার মধ্যে *The Apple Cart* এবং *On the Rocks* এই দুইটি রাজনৈতিক নাটক এবং *In Good King Charles's Golden Days*এর উল্লেখ করা যায়। সর্বশুদ্ধ শ সাতান্নটি[২] নাটক রচনা করেন ১৮৯২ থেকে ১৯৫০ এই আটান্ন বৎসরে।

নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের পর তিনি প্রধানতঃ নাট্যরচনাতেই জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটিয়েছেন। অবশ্য তাঁর বহু বিচিত্র বিষয়ে উৎসাহ, চিরজাগ্রতচিত্ত এবং ক্লান্তিবিহীন লেখনী ও রসনা থেকে নানাপ্রকার রচনাই ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছে। তাই প্রধানতঃ নাট্যকার হলেও সমালোচক এবং ধর্ম নৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক পুস্তিকাকার হিসাবেও তাঁর স্থান সমসাময়িক সমাজে এবং ইংরেজি সাহিত্যে অতি উচ্চে। বাকচাতুর্যে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এবং উত্তর-প্রত্যুত্তর ক্ষমতায়ও (repartee) তাঁর অদ্ভুত পারদর্শিতা বিখ্যাত। এ হিসাবে তাঁকে সচরাচর ডাক্তার জনসনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু ডাক্তার জনসনের জবাবে অনেক সময় একটা ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতা লক্ষ্য করা যায় যা শ'র স্বধর্মবিরুদ্ধ। মোট কথা এ দিক দিয়ে শ অদ্বিতীয় ছিলেন।

১৯১৪-১৮ সালে বিশ্বযুদ্ধের অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় অন্যায়ভাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ক্ষুন্ন হয়। শ'র কাছে সত্য কথা অপ্রিয় হলেই বলার তাগিদ বাড়ে। শ এই সময় *Common Sense About the War* নামে এক ইস্তাহার লেখেন এবং তার ফলে শ-বিদ্বেষ নিদারুণ ভাবে ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের পরে এই ভাব দূর হয় এবং শ যে মোটেই অন্যায় কিছু বলেন নি এই ধারণা বৃদ্ধি পায়। ক্রমে তাঁর হাস্যরস, কৌতুকপরায়ণতা, তাঁর বাগবৈদগ্ধ্য এবং অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের ফলে জীবদ্দশাতেই তিনি কাহিনীতে পরিণত হয়েছিলেন। ৯৪ বৎসর বয়সে ১৯৫০ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে পরিণত বয়সে মৃত্যু স্বাভাবিক হলেও শ'র মহাপ্রয়াণ এত আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক মনে হয়েছে যে অন্য দশটা স্বাভাবিক ঘটনার মত জগৎ তা গ্রহণ করতে পারে নি। মনে হয়েছে, একটি দিক্‌পালের মৃত্যুতে যেন একটা যুগের সমাপ্তি ঘটেছে।

২

বর্তমান যুগের ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নাটক লিখতে শুরু করেন দৃশ্যতঃ প্রাণের তাগিদে নয়, অনেকটা প্রয়োজনের বশে। সমসাময়িক ব্রিটিশ থিয়েটারে যে-জাতীয় নাটক অভিনয় হত নাট্যসমালোচক হিসাবে শ তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই-জাতীয় নাটকে নাট্যকার গঠনকৌশলের উপরই জোর দিতেন বেশি ; বস্তুতঃ শুধু গঠনমাহাত্ম্যেই এই নাটকের নাম হয়েছিল সুগঠিত (well-made) নাটক এবং গঠন ব্যাপারটাও দাঁড়িয়েছিল যান্ত্রিক ফরমূলায়। বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই নাটকের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, ফলে এই নাটক হয়েছিল প্রাণহীন। ইব্‌সেন তাঁর গদ্য নাটকে গতানুগতিক বিষয় ছেড়ে প্রচলিত সমাজ ও সামাজিক আদর্শের শ্লেষাত্মক সমালোচনা করেন এবং তাই

২ এই গণনায় বই হিসাবে প্রকাশিত হয় নি এমন ছোটখাট একাঙ্ক নাটিকা এবং অন্যান্য নাট্যরচনাও ধরা হয়েছে। *The King And the Doctors* (১৯২৯) অবশ্য ধরা হয় নি, শ নিজেই এই রচনার নাম দিয়েছেন *An Improbable Fiction* এবং নাটকের মত কথোপকথনের আঙ্গিকেও তিনি ইহা লেখেন নি। *The King, the Constitution and the Lady* (১৯৩৬) গণনায় ধরা হয়েছে, *Why She Would Not* অসমাপ্ত বলে ধরা হয় নি।

নিয়ে ইউরোপে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। শ ইব্‌সেনপন্থী ছিলেন এবং ইব্‌সেনীয় নাটকের অভিনয়ের জন্য যে আন্দোলন চলে তিনি ছিলেন তার পুরোভাগে। এই 'নূতন নাটক' প্রবর্তনের পক্ষে বাধা ছিল অনেক। আর্থিক ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত প্রযোজক পাওয়া গেল, কিন্তু নাটক কোথায়? শুধু ইব্‌সেনের নাটক ভাঙিয়ে কতকাল চলবে? নূতন নাটকের এই জরুরি দাবি মেটাতে শ তাঁর ১৮৮৫ সালে অর্ধসমাপ্ত *Widowers' Houses* সম্পূর্ণ করলেন এবং Independent Theatre তা রঙ্গমঞ্চে পরিবেশন করলেন।

সামাজিক অব্যবস্থা এবং দুষ্ট ব্যবস্থার বহু বিচিত্র তথ্যে তাঁর মস্তিষ্ক তখন ভরপুর, এই দুষ্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুক্তিবিরোধী মিথ্যা আদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহও দুর্জয়, তার সঙ্গে যোগ হল তাঁর অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা। নূতন নাটকের দাবি যে উপযুক্ত ভাবেই মিটবে তাতে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। কাল্পনিক পরিবেশে নাটকীয় দৃশ্যের সাহায্যে কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করে নাটকের পর নাটক রচনা করতে লাগলেন: *Wiowers' Houses, Philanderer, Mrs. Warren's Profession, Arms and the Man, The Man of Destiny, You Never Can Tell* ইত্যাদি। সৃষ্টির প্রাচুর্যে এবং প্রাণশক্তির বিপুলতায় নূতন নাটক প্রতিষ্ঠিত হল। ক্রমে অন্যান্য প্রতিভার সমাবেশে তা বিচিত্র হল। ব্রিটিশ নাট্যজগতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা হল। নূতন নাটকের জরুরি প্রয়োজন মিটে গেল; কিন্তু শ'র বিকশিত সৃষ্টি-প্রতিভা ততদিনে তার প্রকাশের মাধ্যম আবিষ্কার করেছে। এতকাল তাঁর বলিষ্ঠ, মুখর, বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল প্রতিভা উপযুক্ত মঞ্চ খুঁজে পায় নি, অবশেষে রঙ্গমঞ্চে তা সার্থক হল।

ইব্‌সেনের নাটক সম্বন্ধে শ এক খানা বই লিখেছেন, তাঁর উৎসাহ এ বিষয়ে উগ্র, কিন্তু তাই বলে এ কথা ভাবা ভুল হবে যে তাঁর নাটকে তিনি ইব্‌সেনের অনুকরণ করেছেন। খুঁজলে ইব্‌সেনের সঙ্গে তাঁর মিলের চেয়ে অমিলই বেশি চোখে পড়বে। অন্ততঃ, এমন-একটি গুরু বিষয় তিনি ইব্‌সেনের নাটকে খুঁজে পেয়েছেন বলেছেন যা ইব্‌সেনের নাটকে থাক্ বা না থাক্ তাঁর নিজের জীবনে এবং নাটকে প্রচুর। ইব্‌সেনের *A Doll's House* নাটকের শেষ অঙ্কে বিগত জীবন সম্বন্ধে Norar ভ্রান্তি যখন কেটে গেল তখন স্বামীকে সে বলল, "· ·Sit down here, Torvald. You and I have much to say to one another · · Sit down. It will take some time; I have a lot to talk over with you." এই উক্তিকে অসাধারণ প্রাধান্য দিয়ে শ বলেছেন আলোচনার উপর এই জোর দিয়ে ইব্‌সেন ইউরোপ জয় করেছেন এবং নূতন নাটকের ভিত্তিস্থাপন করেছেন।

আলোচনা-প্রধান নাটক যদি নূতন-নাটকের সর্বপ্রধান পরিচয় হয় তবে তার পুরোহিত ইব্‌সেন নন, জর্জ বার্নার্ড শ। কেননা তাঁর নাটকে সরস আলোচনা এবং বিতর্ক এত প্রাধান্য পেয়েছে যে তা একদিকে যেমন তাঁর নাটকের বিশেষ আকর্ষণ অন্যদিকে এর ফলে তাঁর নাটকের অন্যান্য মূল্যবান দিকের প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। অবশ্য সেজন্য শ দায়ী নন, দায়ী সমসাময়িক সমালোচকদের অক্ষমতা। তাঁর নাটকীয় চরিত্রগুলির বৈচিত্র্য, তাদের অদ্ভুত প্রাণশক্তি, তাঁর নাট্যকল্পনার বলিষ্ঠতা এবং গভীরতার উপযুক্ত স্বীকৃতি শ তাঁর সমালোচকদের কাছে পান নি। তিনি বলেছিলেন, 'I could get drama enough out of the economics of slum poverty,' তাঁর এ দাবি অন্যান্য অনেক দাবির মতই যথার্থ।

ভাবাবেগহীন যুক্তির স্তরে আলোচনা শ-নাটকের বিশেষত্ব। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা নিছক আলোচনা নয়, নাটকীয় চরিত্র এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে এই আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে, ফলে এই আলোচনাকে বলা যেতে পারে নাটকীয় আলোচনা। নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের জীবনের সমস্যা নিয়ে বিতর্ক এবং আলোচনার ভিতর দিয়ে। সচরাচর নাটকে যে প্রকার দ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ মেলে শ'র নাটকে তা সুলভ নয়। তাঁর নাটকে ভাবাবেগকে প্রধান স্থান দেওয়া হয় নি। তাই প্রচলিত প্রেমের দ্বন্দ্ব তাতে জমে উঠে নি। তাঁর নাটকে দ্বন্দ্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নৈতিক আদর্শের নয়, লোভের সঙ্গে নির্লোভের নয়, বীরের সঙ্গে কাপুরুষের নয়, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার নয়, এককথায় ভালোর সঙ্গে মন্দের নয়। তাঁর নাটকে পক্ষ-প্রতিপক্ষের মধ্যে কে ভালো কে মন্দ, কে বীর কে কাপুরুষ সে প্রশ্ন প্রধান নয়। নাটকীয় দ্বন্দ্ব জমে উঠেছে চরিত্রগুলির পরিবেশগত এবং চরিত্রগত দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করে। Mrs. Warren এবং Vivie Warren দুজনের মতামতই প্রবল যুক্তিসহকারে উপস্থিত করা হয়েছে *Mrs. Warren's Profession* নাটকে। যে সমাজে Mrs. Warrenএর বাস সে সমাজ কাল্পনিক নয়, যাঁরা দর্শকের আসনে বসে এই নাটক দেখেছেন তাঁরাও এই সমাজেরই বাসিন্দা। শ শুধু সমসাময়িক সমাজের নরনারী নয়, তাদের সমস্যা এবং তাদের পরিবেশের বাস্তবরূপও কল্পনায় সৃষ্টি করেছেন। তাই নাটকের পাত্রপাত্রীর যে সমস্যা সে সমস্যা সমস্ত সমাজের। যে সমাজে Mrs. Warren সম্ভব সেই সমাজের নরনারীকে ডেকে এনে যেন শ বলছেন, 'এই দেখ তোমাদের কীর্তি, এই দেখ তোমরা কি সমস্যা সৃষ্টি করেছ'। তিনি বলতে চেয়েছেন, এক নায়িকা নিয়ে দুই প্রেমিকের দ্বন্দ্ব এবং সমস্যা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার ; তাঁর নাটকে সমস্যা সামাজিক, যে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব সমস্ত সমাজের। এই জন্যই তাঁর নাটককে বলা হয় Problem Play বা সমস্যামূলক নাটক।

নাটকের আঙ্গিকে নানারকম পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছেন। ইতিপূর্বে নাটকে দৃশ্যসংকেত এবং মঞ্চনির্দেশ ব্যাপারটা কোনো নাট্যকারের হাতেই এত বিস্তৃত আকার ধারণ করে নি। তাঁর এই নির্দেশ অনেক অভিনেতা এবং মঞ্চপরিচালকের বিরক্তির কারণ হয়েছে। প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বলেও অনেক সমালোচক এই পরিবর্তন ভালো চোখে দেখতে পারেন নি। উপন্যাসের পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি নায়ক-নায়িকার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। গ্রীক নাটকের কোরাসে নাট্যকারের মতামত, দর্শন এবং নাটকের তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে। শ'র নাটকে বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশ, দৃশ্যবর্ণনা এবং বিস্তৃততর ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে গ্রীক কোরাসের তুল্য।

শ রঙ্গমঞ্চে আর-একটি জিনিস আমদানি করেছেন, সে হচ্ছে মননশীল যুক্তিবাদী বাক্‌চতুর নায়ক। নাট্যবস্তু এবং নাট্যঘটনা যুক্তির স্তরে কল্পিত বলে নায়কনায়িকা এবং তাদের কথোপকথনও সেই স্তরে হয়েছে। এতে নাটকের সংগতি এবং স্বাভাবিকতাই রক্ষা পেয়েছে, নাট্যকল্পনার বিচরণসীমা এবং নাটকের সম্ভাবনার সীমাও বিস্তৃত হয়েছে।

নাটকে চরিত্র, ঘটনাসংস্থান এবং কথোপকথন দ্বারা যুক্তিবুদ্ধিনির্ভর আইডিয়া প্রকাশ এবং বিস্তার যে অসম্ভব নয় অসংগত নয় শ'ই তা প্রথম প্রমাণ করলেন। তাঁর নাটকে গঠনকুশলতা নেই, এ নালিশ হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'Instead of planning my plays, I let them grow as they came ·'। এ কথার অর্থ এই নয় যে, তাঁর নাটকে কোনোই প্ল্যান্ নেই ; এর অর্থ এই যে,

সচরাচর গঠন বলতে যা বোঝায় সেই-জাতীয় বস্তুর জন্ম তিনি মাথা ঘামান নি। তাঁর নাটকীয় কল্পনায় যে আইডিয়া চরিত্র এবং পরিবেশযোগে মূর্ত হয়েছে, তার নাট্যরূপ স্থির হয়েছে ঐ আইডিয়া বিকাশের সঙ্গেসঙ্গে। বিচ্ছিন্ন, এমনকি অপ্রাসঙ্গিক, ঘটনাবলী বলে যাদের মনে হয়েছে তাদের ঐক্য দান করেছে তাঁর আইডিয়া। গঠনশিথিলতার চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁর *Heartbreak House* নাটকের উল্লেখ করা হয়, কিন্তু এই নাটকের ঐক্য একান্তভাবে সেই আইডিয়া-নির্ভর যে আইডিয়া এই নাটকে তিনি নাট্যরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অবশ্য তাঁর এই প্রচেষ্টা হয়তো সর্বত্রই দৃঢ়বদ্ধ রচনায় পরিণত হয় নি। কিন্তু তাঁর নাটক-সমালোচনায় এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তাঁর নাটকে বিচ্ছিন্ন ঘটনার নাটকীয় ঐক্য আইডিয়ার সূত্রে গ্রথিত।

যুক্তিপ্রধান নায়ক যেমন তিনি সৃষ্টি করেছেন তেমনি নায়িকাও সৃষ্টি করেছেন, যারা অবলা নয়, লজ্জাশীলা নয়, ফুলের ঘায়ে যারা মূর্ছা যায় না ; যারা শুধু তর্কে পটু নয়, যারা এগিয়ে প্রেম করতে জানে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হাতাহাতি পর্যন্ত করতে সক্ষম। ভিক্টোরীয় যুগে দাসীকে প্রহারনিরত নায়িকা Blanche Sartoriusকে দেখে কেন সমসাময়িক সমালোচকগণ হতবাক এবং প্রতিবাদপরায়ণ হয়েছিলেন তা বোঝা শক্ত নয়। তাঁর এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবজীবনের সঙ্গে নাটকের যোগসাধন করেছে।

নায়ক-নায়িকাদের মুখে দীর্ঘ বক্তৃতাও তিনি দিয়েছেন, কিন্তু তাতে প্রকৃতপক্ষে নাটকীয় সংগতি নষ্ট হয় নি। *Hamlet* নাটকে Hamletএর 'To be or not to be . .' এই স্বগতোক্তির চেয়ে অথবা *Merchant of Venice*এ Shylockএর 'Hast not a Jew eyes· ·' বক্তৃতার চেয়ে *The Man of Destiny* নাটকে Napoleonএর 'No, because the English are a race apart · ·' এই বক্তৃতাতে নাটকীয় অসংগতি বেশি প্রকাশ পায় নি। বস্তুতঃ নাট্যকল্পনার গভীরে এই স্বগতোক্তি এবং দীর্ঘ বক্তৃতা উভয়েই সংগত এবং বোধ হয় অনিবার্য।

এককথায় তাঁর নাটককে বলা যেতে পারে সামাজিক এবং বুদ্ধিগত, মননশীলতা তার প্রাণ। তাঁর বক্তব্য এত জরুরি, সমসাময়িক সমাজের দিক দিয়ে এত গুরুতর, তাঁর নাট্যকল্পনা এত আইডিয়াঘেঁষা যে গঠনকৌশল নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। স্ক্রিব (Scribe) এবং সার্দু (Sardou) পরিকল্পিত 'সুগঠিত' নাটকে বলবার কিছু ছিল না, তাই নাট্যকার তাঁর সমস্ত ক্ষমতা গঠনকৌশলে নিয়োজিত করেছেন। শ'র নূতন নাটকে তার প্রয়োজন নেই। তাঁর নাটকে চরিত্রগুলি প্রাণশক্তিতে এত উচ্ছল, তাদের বাক্‌চতুরতা এবং বাক্‌ভঙ্গি বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে এমন দীপ্যমান, যুক্তির দ্বন্দ্ব এবং বিতর্ক পরিবেশন এমন চাতুর্যপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক, সমস্যার এমন চিন্তাশীল অথচ সকৌতুক আলোচনা, ব্যঙ্গের এমন কষাঘাত যে দর্শক এবং পাঠক রুদ্ধনিঃশ্বাসে তা উপভোগ করে। যদি দর্শকের মনে হয় যে তাঁরাই অপরাধী, তাঁদের উপলক্ষ্য করেই ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হচ্ছে, তাহলেও তাঁদের দুঃখ করবার হেতু নেই, কেননা ব্যঙ্গের ঘুসির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ হাস্যরস ঘুষ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় অপ্রিয় কথা তো কৌতুক করেই বলা চলে, শ তাই বলেছেন। সুধী পাঠক বা দর্শক বুঝবেন এ শুধুই কৌতুকরসে পরিপূর্ণ কমেডি নয়, এ কমেডি ব্যঙ্গপূর্ণ এবং এর একটা ব্যবহার হচ্ছে সম্মার্জনীর।

৩

শ'র নাটক শুধু কমেডি নয়, ব্যঙ্গ এমনকি বিশেষ একপ্রকারের শ্লেষাত্মক কমেডি। এ বিষয়ে অনেকটা তাঁর সমধর্মী নাট্যকার ছিলেন অ্যারিস্টফ্যানিস্। অবশ্য শ্লেষাত্মক সাহিত্যের প্রকারভেদ আছে। সুইফ্‌টের শ্লেষ নিষ্ঠুর এবং বিদ্বেষপরায়ণ, স্যারভেন্টেসের ব্যঙ্গ দরদ-মাখানো, ভোলতেয়ারের শ্লেষ বুদ্ধির অহমিকায় অবজ্ঞাপূর্ণ, ঠোঁটবাঁকানো, রাবলে'র ব্যঙ্গ ফুর্তির অট্টহাস্যে আকাশফাটানো, অ্যারিস্টফ্যানিসের শ্লেষ কৌতুকপরায়ণ, উদ্ভট ভাঁড়ামোমিশ্রিত এবং মাঝে মাঝে তীব্রভাবে ব্যক্তিগত। শ'র শ্লেষেও উদ্ভট ভাঁড়ামোমিশ্রিত কৌতুক রয়েছে, তবে তা আশ্চর্যভাবে ব্যক্তিগত বিদ্বেষমুক্ত। নির্বোধকে তা আক্রমণ করে সত্য, কিন্তু আক্রমণকারীর উদ্দেশ্যের শুভ্র পবিত্রতায় এবং কৌতুকহাস্যের প্রাবল্যে সে আঘাত ব্যক্তিগতভাবে নির্বোধের গায়ে লাগে না, শুধু নির্বুদ্ধিতা লজ্জা পায়। উচ্ছল প্রাণশক্তি এবং উদ্দেশ্যের পবিত্রতার সঙ্গে ব্যঙ্গকৌতুকের সংমিশ্রণে সমাজসংস্কারের দিকটা যে আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না বা মনে হয় না তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু কমেডীয় প্রতিভা যেমন তাঁর সম্বন্ধে প্রধান কথা, তেমনি তাঁর চিন্তাশীল সংস্কারকের দিকটা অগ্রাহ্য করলে তাঁকে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না।

শ'র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সমসাময়িক জীবনে এবং সমাজে প্রচণ্ড মূর্খতা এবং বিরাট ভণ্ডামি: সত্যের মুখোসপরা মিথ্যা, ধর্মের মুখোসপরা অধর্ম, আদর্শের মুখোসপরা স্বার্থপরতা। এই ভণ্ডামি তিনি অনুকম্পাহীন কঠোরতার সঙ্গে তাঁর নাটকে প্রকাশ করেছেন। *Major Barbara*তে তিনি দেখিয়েছেন, আমরা যে সমাজে বাস করি তাতে *Salvation Army*কেও বেঁচে থাকতে হয় সেই ব্যক্তির দয়ায় যার অস্ত্রের বিরাট কারখানা মানবসমাজ ধ্বংসের হাতিয়ার তৈরি করছে। *Widowers' Houses*এ দেখিয়েছেন, যে-উচ্চশিক্ষিত এবং স্বচ্ছল যুবক নিজেকে মহৎজ্ঞানে দরিদ্র বস্তীবাসীদের শোষক মালিককে ঘৃণা করবার বিলাস পোষণ করছে তার নিজের উচ্চশিক্ষা এবং স্বচ্ছলতার মূলে রয়েছে সেই অর্থ যা উচ্চহারে বন্ধকীসুদ হিসাবে ঐ বস্তীমালিকের নিকট থেকে কড়াক্রান্তিহিসাবে আদায় হচ্ছে। *Mrs. Warren's Profession*এ তিনি বলেছেন, যে-সমাজে নারী কোনো ভদ্রকাজে পরিশ্রমদ্বারা স্বাধীনভাবে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বচ্ছলতার সঙ্গে জীবিকা নির্বাহ না করতে পারবে, সে সমাজে বেশ্যাবৃত্তি দেখা দেবেই এবং বাধ্য হয়ে নারী তার মতামত এবং নীতিগত আদর্শ বিসর্জন দিয়ে পতিতা সাজবে। *The Doctor's Dilemma* নাটকে একজন ডাক্তার বলছেন, 'ডাক্তারী তো পেশা নয়, এ একটা ষড়যন্ত্র।' ঐ নাটকের ভূমিকায় আরও স্পষ্টভাবে সোজাসুজি শ বলেছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে ডাক্তারদের দোষ না হলেও সমাজের এটা একটা অদ্ভুত মূঢ়তা যে যে-ডাক্তার রোগীর পা কাটবার জন্যে টাকা পাবে তার উপরই বিচার করবার ভার দেওয়া হয়েছে পা-টা কাটা সংগত কি না। জল্লাদ নিজের হাতে ফাঁসি দিয়ে যে টাকা পায় তাতে তার জীবিকা নির্বাহ হয়, কাকে ফাঁসি দিতে হবে সে বিচারের ভারটাও যদি তার হাতে থাকত তবে ফাঁসির দড়ি থেকে কম লোকের গলাই অব্যাহতি পেত। বলা বাহুল্য এসব ক্ষেত্রে অপরাধী ডাক্তার নয়, বেশ্যা নয়, অস্ত্রকারখানার মালিক নয়, অপরাধী সেই সমাজ যার ব্যবস্থায় এসমস্ত সম্ভব হয়, শোষণের উপর যার ভিত্তি এবং নির্বুদ্ধিতা ও নিষ্ঠুরতা যার উপজীব্য। দারিদ্র্যের চেয়ে বড় অপরাধ বর্তমান সমাজে নাই, অতএব বার্নার্ড শ সমাজকে বলছেন, তোমার এই অমানুষিক ব্যবস্থা বদলাও; সঙ্গেসঙ্গে ব্যক্তিকে

সমাধান করেছেন, যতদিন সমাজ তার ব্যবস্থা না বদলাচ্ছে ততদিন খবরদার, আর যাই হও, গরীব হয়ো না।

সমাজ কতকগুলি আদর্শ নিয়ে রোমান্স সৃষ্টি করেছে, এর বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেছেন। সৈনিক সম্বন্ধে, বীর সম্বন্ধে, যুদ্ধ সম্বন্ধে যেসমস্ত মিথ্যা কাল্পনিক আদর্শ সমাজে ছড়িয়ে আছে তার মুখোস তিনি খুলেছেন একাধিক নাটকে। *The Man of Destiny*তে দেখিয়েছেন সত্যিকার নেপোলিয়ন আদর্শের গৌরবে মহৎ নন, সত্যিকার নেপোলিয়ন বুদ্ধিমান, চতুর, বিবেকহীন, আত্মস্বার্থপরায়ণ। *Arms and the Man* নাটকে পেশাদার সৈনিক Bluntschli পকেটে গুলি না রেখে চকোলেট রাখে,[৩] না ঠেকলে লড়াই করে না ; নেপোলিয়নের মতে সাহসের উৎস হচ্ছে ভয়,[৪] মরিয়া হলেই মানুষ সাহস দেখায়। বড় বড় কথা, যথা আদর্শ, কর্তব্য, প্রায়ই শুধু হীনতা এবং দুর্বলতা ঢাকবার উপায় মাত্র। *The Doctor's Dilemma* নাটকে Sir Patric Cullen বলছেন, 'A blackguard's a blackguard, an honest man's an honest man, and neither of then will ever be at a loss for religion or morality to prove that their ways are the right ways'। সমাজের প্রচলিত ধর্ম এবং নীতি, অধর্ম এবং অন্যায় ঢাকবার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এই সত্যই তাঁর রচনায় শ উদ্ঘাটন করেছেন।

তাঁর নাটকে যারা প্রকৃত ধার্মিক, সত্যিকার নীতি মেনে চলে তাদের প্রকৃতিতে সবচেয়ে বড় লক্ষণ হচ্ছে অকপটতা, আন্তরিকতা। Richard Dudgeon (*The Devil's Disciple*) প্রকৃত ধার্মিক, Blanco (*The Shewng-up of Blanco Posnet*) প্রকৃত সৎলোক, তারা কোনো অবস্থায়ই প্রচলিত নীতি এবং কর্তব্যের ধার ধারে না। যখন তাদের জীবনে পরীক্ষা আসে তখন নিতান্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই স্ব স্ব প্রকৃতির ধর্ম হিসাবেই তারা আত্মত্যাগের পথটাই বেছে নেয়।

The Devil's Disciple নাটকের শেষ অঙ্কে ধর্মযাজক Anthony Anderson 'শয়তানের শিষ্য' Richard Dudgeonকে লক্ষ্য করে যা বলেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ।[৫]

ইংরেজ এবং আইরিশ জাতির প্রতি ব্যঙ্গ সরস হয়ে উঠেছে *John Bull's Other Island*এ। Larry Doyle এবং Tom Broadbent চরিত্রের বৈপরীত্যে উভয়ের জাতীয় চরিত্রের ব্যঙ্গময় চিত্র ফুটে উঠেছে। Tom Broadbent চরিত্রের সাহায্যে কৌতুকরস এবং Keegan চরিত্রের গভীরতার জন্যও এই নাটক অমর হয়ে থাকবে।

রোমান্টিক প্রেম সম্বন্ধেও শ ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েন নি। রোমান্স মাত্রই অবাস্তব এবং সমাজের পক্ষে হানিকর, এই বিশ্বাসে তিনি প্রেমকে শুধু জীবন-বিধাতার (Life Force) অস্ত্র হিসাবে

---

৩ শ যে ঠিক কথাই বলেছেন তা পেশাদার সৈনিকরা অন্ততঃ স্বীকার করেন। Duke of Wellington বলেছিলেন, 'The Army crawls on its belly.'

৪ "Napoleon : It is fear that makes men fight : it is indifference that makes them run away : fear is the mainspring of war."—*The Man of Destiny.*

৫ 'This foolish young man boasted himself the Devil's Disciple; but when the hour of trial came to him, he found that it was his destiny to suffer and be faithful to the death. I thought myself a decent minister of the gospel of peace; but when the hour of trial came to me, I found that it was my destiny to be a man of action . .'

দেখেছেন। এই তত্ত্ব *Man and Superman*এ নাট্যরূপ পেয়েছে। তাঁর মতে নিম্নস্তরের জীব থেকে যেমন মানুষের বিকাশ হয়েছে তেমনি বিবর্তনের ফলে মানুষ থেকে অতিমানুষ জন্মাবে। জীবনবিধাতা সেই অভিপ্রায়ে মানুষ নিয়ে পরীক্ষা করছেন। প্রেম, বিবাহ এসমস্ত তাঁর অস্ত্র ; নারী প্রকৃতি বা জীবনবিধাতার চর, বিবর্তনের মাধ্যম মাত্র। এই তত্ত্ব অবশ্য সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের নয় ; প্রেম এবং পরিণয়ে পুরুষের চেয়ে নারী বেশি তৎপর, এ ধারণাও তাঁর একার নয় ; পলায়মান পুরুষের পশ্চাদ্ধাবন এবং অবশেষে পাণিগ্রহণ ইতিপূর্বে অন্য নাট্যকারও দেখিয়েছেন। কাজেই Ann কর্তৃক পলায়মান Tannerএর পাণিগ্রহণে খুব নূতনত্ব কিছু নাই এবং এটাই এ নাটকের বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি কিছুটা বিবর্তনবাদ, কিছুটা নীট্‌সে, শোপেনহাউয়ার-এর দার্শনিক তত্ত্ব নিজস্বভাবে আত্মস্থ করে. নাট্যবস্তুর সাহায্যে *Man and Superman* নাটকে পরিবেশন করেন। তৃতীয় অঙ্কে Tannerএর বিরাট স্বপ্নের নাট্যরূপের ভিতর দিয়ে বিবাহ এবং সৃষ্টিমূলক বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার হয়েছে। বিবাহ সম্বন্ধে যতরকম মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব প্রায় সবই নাট্যাকারে আলোচিত হয়েছে *Getting Married* নাটকে। *You Never Can Tell* এবং *Candida*তেও বিবাহ সম্বন্ধে শ'র মতামত সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সমাজে নিম্নপদস্থ ব্যক্তি অথবা যেসমস্ত চরিত্র সাধারণের মত নয়, একটু ক্ষ্যাপাটে ধরনের এমন লোকের মুখেই শ অনেক সময় তাঁর জ্ঞানগর্ভ কৌতুকমিশ্রিত দার্শনিকসুলভ কথা বেশি করে দিয়েছেন। *Getting Married* নাটকে সব্‌জি-বিক্রেতা Collins বলেছে, 'Marriage is tolerable enough in its way if you're easygoing and don't expect too much from it. But it does not bear thinking about. The great thing is to get the young people tied up before they know what they're letting themselves in for'। *You Never Can Tell* নাটকে হোটেলের খাদ্যপরিবেশক Walter (নাম Walter, কিন্তু Dorothea সেক্সপীয়ারের সঙ্গে চেহারার মিল আবিষ্কার করে তার নামকরণ করেছে William) পরিণয়োদ্যত হতাশাপরায়ণ Valentineকে বলছে, 'Cheer up, sir, cheer up. Everyman is frightened of marriage when it comes to the point, but it often turns out very comfortable, very enjoyable and happy indeed, sir, from time to time. *I* never was master in my own house, sir : my wife was like your young lady : she was of a commanding and masterful disposition, which my son has inherited. But if I had to live my life twice over, I'd do it again : I'd do it again, I assure you. You never can tell, sir : you never can tell'। Peter Keeganকে সকলেই পাগল বলে জানে ; গভীর সত্যের বাণী শ তাঁর মুখেই প্রকাশ করেছেন।

Candida নাটকে স্ত্রীর মধ্যে মাতৃত্বের মহিমা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী-চরিত্রের (Candida) মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। অনেকের মতে এই নাটক শ'র শ্রেষ্ঠ কমেডি, প্রচলিত মতাবলম্বী সমালোচকের রসবোধও এতে ব্যাহত হয় নি। শ'র বিশিষ্ট মতামত ও রসগ্রহণে কারো কোনো বাধা জন্মায় নি। বাস্তবিক চরিত্রমহিমা, কথোপকথন, ঘটনাসংস্থান এবং নাটকীয় দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও সুন্দর স্বাভাবিক পরিণতির গুণে এই নাটক অসাধারণ জমেছে। রঙ্গমঞ্চে সার্থকভাবে প্রকৃত জাত-কবির চরিত্র

বার্নার্ড শ'র বৈঠকখানা

স্টুডিয়ো লিজা । ১৯৩৮

বার্নার্ড শ'র বাসভবন

স্টুডিয়ো লিজা

(Marchbanks) উপস্থিত করার এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর Candida চরিত্র তো শ'র শ্রেষ্ঠ চরিত্রগোষ্ঠীর অন্যতম।

প্রবল স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং ব্যক্তিত্ব শ'-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর কয়েকটি প্রধান চরিত্রে বর্তমান। Andrew Undershaft, Peter Keegan, John Tanner, Caesar ইত্যাদি চরিত্রে শ'র ব্যক্তিগত চরিত্রের অনেকটা আঁচ পাওয়া যায়। সমাজতন্ত্রবাদী এই চিন্তাবীর নিজের জীবনে এবং সাহিত্যে যে পরিমাণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ছিলেন তা দুর্জ্ঞেয় মানবচরিত্রের এক বিচিত্র উদাহরণ।

৪

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টাদের সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভে অনেক সময় দেখা যায় সমসাময়িক সমালোচকদের সঙ্গে তাদের মতান্তর, এমনকি মনান্তর, ঘটে। ফলে সমালোচকগণ সাহিত্যস্রষ্টাদের হাতে যেভাবে চিত্রিত হন তা তাঁদের আনন্দবর্ধন করে না বটে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা যথার্থ। হেনরি ফিল্ডিং *Tom Jones* গ্রন্থে সমালোচকদের প্রতি যে মন্তব্য* প্রকাশ করেছেন তাতে সমস্ত যুগের সাহিত্য-স্রষ্টাই সায় দেবেন। *Fanny's First Play* নাটকে শ সমালোচকদের প্রতি যে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন তাও উল্লেখযোগ্য।

স্রষ্টা এবং সমসাময়িক সমালোচকের ভিতর এই দ্বন্দ্বের হেতু একাধিক। একটা বড় কারণ এই যে, সমালোচকেরা ভুলে যান সমস্ত শিল্পস্রষ্টাদের বিচার করবার মাপকাঠি এক নয়। যে-মাপকাঠি শেক্সপীয়ারে প্রযোজ্য তা শ'র উপর প্রয়োগ করা অনেক সময় নিরর্থক এবং মূর্খতা, এর বিপরীতটাও অবশ্য সত্য। শেক্সপীয়ারের সম্বন্ধে শ বিরূপ উক্তি করেছেন সত্য, কিন্তু সেই উক্তির বিশেষ তাৎপর্য অনুধাবন না করে সমালোচকগণ শেক্সপীয়ারের নাটকের বিশেষ প্রকার উৎকর্ষের তুলনায় শ'র নাটক হীন এই মন্তব্য প্রকাশ করেই কর্তব্য সেরেছেন। বাস্তবিক এ কথাটা অনেকে ভুলে যান যে, শেক্সপীয়ার এবং শ উভয়েই স্ব স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। ঐতিহাসিক কারণে এবং সৃষ্টির প্রয়োজনে শেক্সপীয়ারের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা শ'র প্রয়োজন ছিল, কেননা শেক্সপীয়ারের প্রভাব শ তাঁর সৃষ্টিতে যে সত্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার নিদারুণ বাধা হয়েই দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শেক্সপীয়ারের মাপকাঠি দিয়ে শ'কে বিচার করে যাঁরা শ'র হীনতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তাঁরা নিজেদের হীনতা প্রমাণ করেছেন মাত্র।

শেক্সপীয়ার ট্র্যাজেডি এবং কমেডি দুইই লিখেছেন এবং এই দুই জাতীয় নাটকের আবেদনও ভিন্ন প্রকৃতির। শ' যদিও ট্র্যাজেডি লিখেছেন, তা খুব কম এবং ভিন্ন জাতের। শ'র প্রতিভা বিশেষভাবে

* "Now, in reality, the world have paid too great a compliment to critics, and have imagined them men of much greater profundity than they really are. From this complacence, the critics have been emboldened to assume a dictatorial power, and have so far succeeded, that they are now become the masters, and have the assurance to give laws to those authors from whose predecessors they originally received them.

"The critic, rightly considered, is no more than the clerk. . . . . . The clerk became the legislator, and those very peremptorily gave laws whose business it was, at first only to transcribe them."—*The History Tom Jones*, Vol. I (Book V, Chapter I).

কমেডীয় প্রতিভা এবং সে কমেডির সঙ্গে শেক্‌সপীয়ারের কমেডির তুলনা করা নিরর্থক, কেননা শ'র এবং শেক্‌সপীয়ারের আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সৃষ্টিপ্রেরণায় অনেক তফাত। তথাপি ইংরেজি সাহিত্যের এই দুই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে মিলও আছে। প্লট বিষয়ে, গঠনকৌশল ব্যাপারে উভয়ের কিছুটা ঔদাসীন্য এবং চরিত্রসৃষ্টিকাজে বিপুল আগ্রহ এবং সাফল্য লক্ষ্য করবার বিষয়। এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, যে-সমস্ত গ্রন্থকারের লেখা শ সবচেয়ে বেশি পড়েছেন এবং যাদের সৃষ্টির রস আকণ্ঠ পান[৭] করেছেন তাঁদের মধ্যে শেক্‌সপীয়ার অন্যতম। তিনি দাবি করেছেন, নাটকে গঠন-কৌশল অবহেলা করে তিনি শেক্‌সপীয়ারের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে প্লট নিয়ে মাথা ঘামানোর ফলে নাট্যসৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে। সে যাই হোক, শেক্‌সপীয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শ'র মনে কোনো সংশয় ছিল না, তিনি একাধিক বার শেক্‌সপীয়ারের গুণকীর্তন করেছেন।[৮]

শেক্‌সপীয়ার যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ কাব্য লিখেছেন সে সম্বন্ধে শ'র সন্দেহ থাকবার কারণ নাই। শ কমেডির দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছেন এবং যুক্তির সুরে তাঁর চরিত্রদের সৃষ্টি করেছেন, কাজেই শেক্‌সপীয়ারের সঙ্গে তাঁর তুলনার কোনো কথাই ওঠেনা। তবে শ'কেও শেক্‌সপীয়ারের মত করে

---

৭ "Thus instead of taking a step forward technically in the order of the calendar, I threw off Paris and went back to Shakespeare, to the Bible, to Bunyan . . . ., in whom I had been soaked from my childhood."—*Current British Thought*, No. I, 1947.

"Though I was saturated with the Bible and with Shakespeare before I was ten years old. . . ." Preface to *The Admirable Bashville*.

৮ *Three Plays For Puritans* নাটকের ভূমিকা থেকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধারযোগ্য :

"I am far too good a Shakespearean ever to forgive Henry Irving for producing a version of King Lear so mutilated that the numerous critics who had never read the play could not follow the story of Gloster. . .

"It does not follow, however, that the right to criticize Shakespeare involves the power of writing better plays. And in fact—do not be surprised at my modesty—I do not profess to write better plays. . No man will ever write a better tragedy than Lear. . . . . It is true that when we search for examples of a prodigious command of language and of graphic line, we can think of nobody better than Shakespeare and Michael Angelo. But both of them laid their arts waste for centuries by leading later artists to seek greatness in copying their technique. The technique was acquired, refined on, and elaborated over and over again; but the supremacy of the two great examples remained undisputed. . . . Human faculty being what it is, is it likely that in our time any advance, except in external conditions, will take place in the arts of expression sufficient to enable an author, without making himself ridiculous, to undertake to say what he has to say better than Homer or Shakespeare?" আসল কথা তিনি বলেছেন এর পরেই : "But the humblest author, and much more a rather arrogant one like myself, may profess to have something to say by this time that neither Homer nor Shakespeare said. And the playgoer may reasonably ask to have historical events and persons presented to him in the light of his own time, even though Homer and Shakespeare have already shown them in the light of their time. For example, Homer presented Achilles and Ajax as heroes to the world in the Iliads. In due time came Shakespeare, who said, virtually: I really cannot accept this spoilt child and this brawny fool as great men merely because Homer flattered them in playing to the Greek gallery. Consequently, we have, in Troilus and Cressida, the verdict of Shakespeare's epoch (our own) on the pair. This does not in the least involve any pretence on Shakespeare's part to be a greater poet than Homer."

লিখতে হবে, তা না হলে তাঁকে সার্থক নাট্যকার বলা যাবে না এই ধারণা যে ভুল শ তাঁর নাটকের সাফল্য এবং সার্থকতা দ্বারা তা প্রমাণ করে গেছেন। যাকে বলা হয় মানবচিত্তের গভীরতম ভাবাবেগ (fundamental passions) তা নিয়ে প্রচুর ভাবে শ কারবার করেন নি, কিন্তু জীবন নিয়ে কারবার করেছেন এ কথা ভুললে চলবে না। শ আর্টের জন্য লেখেন নি, বলেছেন ; অর্থাৎ জীবনের জন্যই তাঁর আর্ট।

আসল কথা, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টাকে বিচার করবার মাপকাঠি পাওয়া যাবে তাঁরই সৃষ্টিতে। শেক্‌সপীয়ারের নাটকের উৎকর্ষ পরীক্ষা করে যে-কয়েকটি আদর্শ পাওয়া গেল সেই আদর্শের অস্তিত্বের উপর অন্য নাট্যকারের রচনার উৎকর্ষ নির্ভর করে না। এই ভুল, অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের মাপকাঠি দ্বারা পরবর্তীদের বিচার করা, শ্রেষ্ঠ সমালোচক অ্যারিস্টটল কখনও করেন নি। তিনি নিজের মনগড়া বা কাল্পনিক মতবাদের কষ্টিপাথরে গ্রীক নাট্যকারদের যাচাই করতে চেষ্টা করেন নি, বরং তাঁদের আদর্শস্থানীয় বলে গ্রহণ করে তাঁদের নাটক অনুধাবন করে উৎকর্ষের কারণ এবং কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। অতীত দিক্‌পালগণের দৃষ্টান্তে সদ্যাগত দিক্‌পালের মহিমা-বিচারে বিপদ আছে। এদিক দিয়ে শ'র মত শেক্‌সপীয়ারকেও সমসাময়িক সমালোচকদের হাতে অবিচার সহ্য করতে হয়েছে।

সমসাময়িক সমালোচকদের সঙ্গে সাহিত্যস্রষ্টাদের মতান্তরের আর-একটা কারণ সমালোচকদের ব্যক্তিগত সংস্কার, তাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা। যে-নৈর্ব্যক্তিকতার অভাবের জন্য শ বড় নাট্যকার হতে পারেন নি বলে আর্চার সাহেব মিথ্যা আক্ষেপ করেছেন নিজের সমালোচনায় সেই নৈর্ব্যক্তিকতার অভাবের জন্যে শ'র কোনো কোনো নাটক তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়েছে। সমালোচককেও শুধু নিজের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার কষ্টিপাথরে যাচাই না করে স্রষ্টার চোখে দেখতে চেষ্টা করতে হয়— কি কথা স্রষ্টা বলতে চেয়েছেন, কেন এবং কি ভাবে সে কথা বলেছেন এবং যে ভাবে বলেছেন সে ভাবেই বা কেন বলেছেন।

স্পষ্ট দৃষ্টান্তে আসা যাক। *The Doctor's Dilemma* নাটকে নায়ক Louis Dubedatএর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবাকে লক্ষ্য করে একটি সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছেন, 'Do you think she would give me a few words on How it feels to be a widow ? Rather good title for an article, isn't it ?' এই দৃশ্যে এই উক্তি একাধিক ইংরেজ সমালোচককে পীড়া দিয়েছে। Dubedat মৃত্যুশয্যায় বলছে, 'I believe in Michael Angelo, Velasquez, and Rembrandt ; in the might of design, the mystery of colour, the redemption of all things by Beauty everlasting, and the message of Art that has made these hands blessed. Amen. Amen.' এই উক্তিও স্বাভাবিক নয় তাঁরা অভিযোগ তুলেছেন। তাঁরা মনে করেন সাংবাদিকের উক্তিতে ধরা পড়েছে শ'র ভাঁড়ামি এবং Dubedatএর মৃত্যুশয্যার উক্তিতে তাঁর বক্তৃতা-প্রিয়তা, এবং দুটোই হয়েছে অস্থানে। শেক্‌সপীয়ারের *Macbeth* নাটকের পঞ্চমাঙ্কে পঞ্চম দৃশ্যে নানাভাবে বিপর্যস্ত ঘোর বিপদগ্রস্ত ম্যাকবেথ পত্নীর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে যখন To-morrow and tomorrow বলে দীর্ঘ উক্তি করলেন সে-উক্তি এই-জাতীয় সমালোচকদের

কানে বোধ হয় বেমানান, অস্বাভাবিক এবং অস্থানে কাব্য বলে মনে হবে। অথচ অন্যের আদর্শ শেক্‌সপীয়ারের উপর না চাপিয়ে তাঁর নিজের সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর আদর্শ খুঁজলে দেখা যাবে আপাতদৃষ্টিতে যাই হোক *Macbeth* নাটকে Macbeth চরিত্র যে-স্তরে উদ্ভাবিত হয়েছে সেখানে এই কাব্যময় উক্তি ট্রাজেডীয় প্যাটার্নের মধ্যে সৌষাম্যের সঙ্গে খাপ খেয়েছে। এই নাটকেই দ্বিতীয় অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্যে Macbethএর প্রাসাদের দ্বারীর উক্তিকে সমসাময়িক সমালোচকগণ অস্থানে ভাঁড়ামি বলে নিন্দা করেছেন। অথচ সুধী সমালোচকগণ বুঝেছেন এই তথাকথিত ভাঁড়ামি ভাঁড়ামি তো নয়ই, বরং নৃপহত্যার বিভীষিকাকে আরও তীব্র করেছে। *The Doctor's Dilemma* নাটক একটি ট্র্যাজেডি এবং যে ট্রাজেডিপূর্ণ জগতের চিত্র শ এই নাটকে ধরেছেন তার সুরের সঙ্গে সাংবাদিকের উক্তি বেসুরো তো বাজেই নি বরং নাটকের প্রধান সুরটিকে গভীর ব্যঞ্জনা দিয়েছে। শেক্‌সপীয়ার ছিলেন কবি, তাঁর নাট্যকল্পনা কাব্যের স্তরে, তাই তিনি মানবাত্মার কাব্যগান রচনা করে শ্রোতাকে অনুভূতির উচ্চতম এবং গভীরতম স্তরে নিয়ে গেছেন। শ'র প্রতিভা, হাস্যরসিক, চিন্তাশীল, কমেডীয় প্রতিভা, জীবনটাকে তিনি 'সিরিয়স' কমেডির চোখে দেখেছেন, সেই দৃষ্টিতে তাঁর ব্যঙ্গকৌতুকমাখা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। তাই শ'র কমেডির আবেদন এবং শেক্‌সপীয়ারের ট্র্যাজেডির আবেদন ভিন্ন প্রকারের হতে বাধ্য। শেক্‌সপীয়ার যেমন তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন, শ'ও তাই। সমালোচক বা জনসাধারণের মতামতের চাপে শ কখনও স্বধর্ম ত্যাগ করেন নি; শিল্পবিষয়ে তাঁর বিবেকবোধ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

সমালোচকদের সংস্কার শ'-নাটক উপভোগে কেমন বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত মিলবে উইলিয়ম আর্চারের একটি মন্তব্যে। *Caesar and Cleopatra* নাটকে Britannus চরিত্রে ব্রিটিশ জাতির দুর্বলতার প্রতি শ্লেষ করা হয়েছে, এটা বোধ হয় আর্চারের ভালো লাগে নি। Caesar, Britannus এবং Apollodorusএর কথোপকথন দীর্ঘ এক পৃষ্ঠা উদ্ধার করে তিনি পাঠককে বলেছেন, 'I don't know whether you find this amusing'। তাঁর কাছে এটা নৈরাশ্যজনক ('depressing') মনে হয়েছে। এই বিস্তৃত উদ্ধৃতির শেষ কয়েক পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে দেওয়া হল— সুধী পাঠক আর্চারের ক্রোধের হেতু বুঝবেন এবং তাঁর উক্তির জবাব দেবেন:

Appollodorus. Hail, great Caesar! I am Apollodorus the Sicilian, an artist.

Britannus. An artist! Why have they admitted this vagabond?

Caesar. Peace, man. Apollodorus is a famous patrician amateur.

Britannus. [*disconcerted*] I crave the gentleman's pardon, [*To Caesar*] I understood him to say that he was a professional.

'জন বুল' ছাড়া এই ব্যঙ্গস্মিত কৌতুকরস উপভোগ করতে আর কারো বাধবে না। দ্বিতীয় একজন সমালোচক আবার কালব্যত্যয়দোষ (anachronism) দেখিয়ে বলেছেন, সিজারের সময়কার ইংরেজ-সমাজে amateur এবং professional ভেদাভেদ ছিল না।

শ'র বিরুদ্ধে নাট্যকার হিসাবে বোধ হয় সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে এই যে, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি

বাস্তব নয়, তারা প্রাণহীন পুতুলমাত্র, শুধু শ'র মতামতের মুখপাত্র হিসাবে তাদের অস্তিত্ব। এর জবাবে সংক্ষেপে শ'র ভঙ্গিতে বলা চলে যে, সমালোচকরা একবার নিজেদের মতামত কতকগুলি চরিত্রের মুখে বসিয়ে নাটক লিখে দেখুন, তাঁদের লেখা নাটকগুলি উৎকর্ষের দিক দিয়ে শ'র নাটকের কাছাকাছিও পৌঁছায় কি না।

বাস্তবিক শ'র সৃষ্ট নরনারীরা যে জীবন্ত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট মতামত আছে, বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাঁর নাট্যীয় অপক্ষপাত এ বিষয়ে অসাধারণ। বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত সমান জোরের সঙ্গে যুক্তিসহ করে উপস্থিত করেছেন। চরিত্রগুলি মোটেই শ'র মতামতের মুখপাত্র নয়। বস্তুতঃ কোন্ চরিত্রে সম্পূর্ণভাবে তাঁর মতামত পাওয়া যাবে তা বলা শক্ত। যে মত তাঁর নিজের নয় তাও অসাধারণ জোরের সঙ্গে তিনি তাঁর চরিত্রের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। Mrs. Warrenএর মতামত নিশ্চয়ই শ'র মতামত বলা চলে না, Andrew Undershaftএরও বহু উক্তি যুক্তিসহ করে উপস্থিত করা হয়েছে যা শ'র নিজের মত বলে চালানো যায় না। আবার এ কথাও বলা চলে না যে, শ'র মতামত তাঁর কোনো চরিত্রের মুখ দিয়ে প্রকাশ হয় নি। মোটের উপর, শেক্‌সপীয়ারের সঙ্গে যেমন তাঁর সৃষ্ট কোনো একটি চরিত্রের সম্পূর্ণ সর্বাঙ্গীণ মিল নাই, শ'র সঙ্গেও তাঁর সৃষ্ট কোনো চরিত্রের সম্পূর্ণ মিল নাই। তবে তাঁর চরিত্রগুলি এবং তাদের নাটকীয় অস্তিত্ব যুক্তিবুদ্ধির স্তরে উদ্ভাবিত হয়েছে, তাদের দ্বন্দ্ব জমে উঠেছে তর্কের মাধ্যমে, কিন্তু তাই বলে তারা প্রাণহীন নয় বা শ'র মতামতের মুখপাত্রও নয়। এ কথা ঠিক, Andrew Undershaft, John Tanner যে-ভাষায় কথা বলেছে একমাত্র শ'ই তা বলতে পারেন, কিন্তু তাদের মতামত সর্ব্বত্র শ'র মতামত নয়। এ কথা মনে রাখতে হবে Othello, Hamlet, Macbeth, এমন কি Iago যে ভাষায় কথা বলেছে তা একমাত্র শেক্‌সপীয়ারের দ্বারাই সম্ভব, অন্যের পক্ষে নয় —এই যুক্তিতে শেক্‌সপীয়ারের সৃষ্ট চরিত্রগুলি পুতুল হয়ে যায় নি। আসল কথা, নাটকীয় চরিত্র এবং তাদের ভাষা হুবহু জীবনের কপি হতে পারে না; নাট্যকারের কল্পনায় সৃষ্ট চরিত্র অবিকল জীবন্ত মানুষের মত কথা বলে না। শেক্‌সপীয়ারের বিশেষ কল্পনায় তাঁর চরিত্রগুলি নূতন জীবন পেয়েছে। শ'র চরিত্রগুলিও তাঁর বিশেষ প্রকার (বুদ্ধি এবং কৌতুকঘেঁসা) কল্পনায় নূতন জীবন লাভ করেছে— তাদের স্তরে তারা শুধু বাস্তব নয়, জীবন্ত।

শ'র নাটকে সৃষ্ট চরিত্রগুলির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য, প্রচুর প্রাণের প্রকাশ। কত বিচিত্রপ্রকার নরনারীর সমাবেশ তাঁর নাটকে ভাবলে তাঁর নাট্যক্ষমতায় মুগ্ধ হতে হয়। Bloomfield Bonington (B. B.), Candida, Marchbanks, Walter *(You Never Can Tell)*, John Tanner, Peter Keegan, Tom Broadbent, Andrew Undershaft, Dick Dudgeon, Captain Brassbound, Lady Cicely, Mrs. Warren, Bluntschli, Joan, Henry Higgins এরা প্রত্যেকেই শুধু জীবন্ত নয়, এরা সার্থক জীবনের যে স্তরে স্রষ্টা তাদের কল্পনা করেছেন এবং প্রাণ দিয়েছেন। ইংরেজি নাটকের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ অমর চরিত্রদের মধ্যে নিজেদের মহিমায় এরা আপনাদের স্থান করে নিয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতিনিশ্চয় শ-বিরোধী সমালোচক বলবেন, শেক্‌সপীয়ার মানবজীবনের গভীরতম ভাবাবেগ নিয়ে নাটক লিখেছেন অতএব তিনি অমর এবং অমরতার এই অদ্বিতীয় পন্থা। ভাবাবেগ

নিয়ে বহু নাট্যকার নাটক লিখেছেন কিন্তু শেক্‌সপীয়ার একটিই সম্ভব হয়েছে। আবার শ যে নাট্যবস্তু নিয়ে নূতন নাটক রচনায় সার্থকতা দেখিয়েছেন তা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয় নি। আসল কথা নাট্যক্ষমতা। শ্লেষাত্মক কমেডি লিখেও অমর হওয়া যায়। চোখের সামনে অ্যারিস্টফ্যানিসের দৃষ্টান্ত রেখে বলা চলে না যে, সাময়িক সমাজব্যবস্থা নিয়ে শ্লেষাত্মক কমেডি লিখলে অমর হওয়া যায় না, মানবহৃদয়ের অবিমিশ্র ভাবাবেগ চাই। আর তা ছাড়া শুধু সমাজব্যবস্থা নয়, নরনারীর জীবনের গোড়ার কথাও তাঁর নাট্যবস্তুর অন্তর্ভুক্ত; প্রেম এবং sexও তাঁর উপজীব্য। ভাবীকালে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা সাধারণ লোকের আগ্রহ না জাগাতে পারে, যেমন শেক্‌সপীয়ারের সময়কার থিয়েটারের অবস্থা সম্বন্ধে বর্তমানে সাধারণ লোকের উৎসাহ নাই, কিন্তু *Hamlet* নাটকে তখনকার থিয়েটারের নিতান্ত অস্থায়ী সাময়িক তথ্যকে যে-নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে আজও তা অগণিত লোকের উৎসাহের বস্তু হয়ে আছে। এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শেক্‌সপীয়ার তাঁর যুগে যে কারণে জনপ্রিয় ছিলেন, আজ বিশেষ করে সেই কারণেই যে তিনি জনপ্রিয়, তাও নয়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব বহু বিচিত্র কারণে; তা কালের সীমা অতিক্রম করে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রত্যেক যুগ তার সংস্কৃতি এবং বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দেয়। শ'র শ্রেষ্ঠত্বও ভাবী বিদগ্ধ সমাজে স্বীকৃত হবে।

নাট্যকার হিসাবে সার্থকতার একটা বড় পরীক্ষা হচ্ছে অভিনয়যোগ্যতা। শ'র নাটক যে অভিনয়-যোগ্য তার প্রমাণও প্রচুর ভাবেই পাওয়া গেছে। নাট্যকার হিসাবে প্রাপ্য সম্মান সমসাময়িক সমালোচকের কাছে তিনি উপযুক্তরূপে পান নি এ কথা সত্য। শেক্‌সপীয়ারের শ্রেষ্ঠ এবং সার্থক সমালোচনা হয়েছে তাঁদেরই হাতে যাঁরা তাঁর রসের সাগরে প্রথমটা নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছেন প্রশ্ন না করে। শেক্‌সপীয়ারের সাহিত্যই শেক্‌সপীয়ারের রসবিচার করতে শিখিয়েছে। এই সার্থক সমালোচকগোষ্ঠী অধিকাংশই তাঁর পরবর্তী যুগের। শ'র সার্থক সমালোচনার স্থষ্টি তাঁর সাহিত্য, তাঁর নাটকই করবে, ভাবীকাল তার আয়োজন করছে। তবে শেক্‌সপীয়ারের মত শ'রও সান্ত্বনা এই যে, জীবদ্দশাতেই তিনি স্বীকৃত হয়েছেন, কারো কাছে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে, কারো কাছে শ্রদ্ধামিশ্রিত ঈষৎ বিরূপতার সঙ্গে, আবার কারো কারো কাছে ক্রুদ্ধ নির্জলা কটূভাষণে। শ'র কমেডিস্রষ্টা প্রতিভা বোধ হয় শেষোক্ত প্রতিক্রিয়াকেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মেনে স্বভাবসুলভ কৌতুকহাস্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

৫

Plays Unpleasant গ্রন্থের ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে শ নিজের সম্বন্ধে একটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করেছেন। চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ তাঁর এক ডাক্তার বন্ধু একদা তাঁর চোখ পরীক্ষা করে বলেছিলেন শ'র চোখ সম্বন্ধে কোনো ডাক্তার উৎসাহবোধ করবে না, কেননা তাঁর দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক। শ ভেবেছিলেন এ কথার তাৎপর্য এই যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি বেশির ভাগ লোকের মতই। কিন্তু ডাক্তার বন্ধু তাঁর ভুল ভেঙে বলেছিলেন, এ কথার অর্থ ঠিক উলটো; অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিশক্তি চমৎকার, সমাজে শতকরা দশজনের এমন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি আছে কি না সন্দেহ, বাকি নব্বই জন লোকের দৃষ্টিশক্তি দোষদুষ্ট অস্বাভাবিক। ভেবে দেখলে বলতে হয়, যেখানে শতকরা নব্বই জনেরই চোখ খারাপ সেখানে চোখ খারাপ অবস্থাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ শ'র দৃষ্টিশক্তির স্বাভাবিকতাটাই অস্বাভাবিক।

শ'র দৈহিক চোখের ভালোমন্দের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক খুব কমই কিন্তু তাঁর মনের চোখটা যে শতকরা নিরানব্বই জনের মত নয় তাই নিয়েই গোলমাল বেধেছে। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং স্বীকৃত ব্যঙ্গচিত্র হচ্ছে হেঁটমুণ্ড উর্ধপাদ অবস্থার। অর্থাৎ শ'র মনের চোখ যা দেখে এবং যেভাবে দেখে শতকরা নব্বই জনের চোখ তার উলটো রকম দেখে। শেষোক্তদের দৃষ্টিশক্তি যদি হয় স্বাভাবিক তবে শ'র দৃষ্টিশক্তি নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক। কার দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক, কার অস্বাভাবিক তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। সচরাচর অবশ্য শ'কেই অস্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয় এবং তাঁর উক্তিকে paradox বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে ভাবীকালের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা হয়তো Hamletএর ভাষায় বলবেন, 'This was sometimes a paradox but now the time gives it proof'; *John Bull's Other Island* নাটকে Father Keeganও অনেকটা এই-জাতীয় একটা কথা বলেছেন 'Every jest is an earnest in the womb of time'.

সমাজে আর-দশটা লোক যেভাবে দেখে তিনি সেভাবে দেখেন না, অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকম স্বাভাবিক বলে সত্য তাঁর চোখে সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে এটাই তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। আরও একটা অত্যাবশ্যক তথ্য হচ্ছে, তিনি এই সত্যকে সাদাচোখে সোজাসুজি দেখেন নি, দেখেছেন কমিক দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর দৃষ্টিতে সত্য কমিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। *Back to Methuselah*তে He-Ancient বলছে: 'When a thing is funny, search it for a hidden truth'। একথা শ'র fun এবং jest সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে খাটে। তাঁর নাটকে যা funny তার অন্তরে গভীর সত্য আছে, সে সত্য বিশেষ প্রকারের সত্য, শুধু যা ঘটে তা নয়। সাহিত্যস্রষ্টা যে-সত্য প্রকাশ করেন তা কল্পনার প্রকৃতি এবং প্রকাশের ভঙ্গি অনুসারে বিভিন্ন জাতের হতে বাধ্য; Poetic truthএর মত tragic এবং comic truthও সত্যেরই প্রকার-বিশেষ। তাঁর নাটকে যে হাসির ছড়াছড়ি তার গভীরতাও অবহেলার বস্তু নয়। *Plays Pleasant*এর ভূমিকায় এক জায়গায় তিনি বলেছেন: 'When a comedy is performed any fool can make an audience laugh. I want to see how many of them, laughing or grave, are in the melting mood' সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ করে বলেছেন, 'And this result cannot be achieved, even by actors who thoroughly understand my purpose, except through an artistic beauty of execution unattainable without long and arduous practice and an intellectual effort which my plays do not seem serious enough to call forth.' ইতিপূর্বে *The Doctor's Dilemma* নাটকে সাংবাদিকের উক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এই উক্তিতে নিহিত যে হাস্যরস রয়েছে তাই সুরসিক পাঠক এবং দর্শকের মনে 'melting mood' এনে দেবে। যে-সমাজে নাট্যোল্লিখিতরূপ সমস্যা ডাক্তারের কাছে দেখা দেয়, যে-সমাজে সদ্যমৃতব্যক্তির বিধবাকে অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক প্রশ্ন করতে চায়, 'বিধবা হলে কেমন লাগে', সে সমাজের কথা কৌতুকের সঙ্গে বললেও সেই হাস্যকৌতুকের গভীরে আছে কান্না। রসিক ব্যক্তিরা একে ভাঁড়ামি বলবেন না।

শুধু নাটকে নয়, জীবনে কথায় এবং কাজে তাঁর কৌতুকপরায়ণতা সাধারণের কাছে তাঁর গভীর এবং গম্ভীর দিকটা ঢেকেছে। তাঁর সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা হচ্ছে এই যে লোকটা ধর্মবিদ্বেষী, তরলমতি,

মোটেই সীরিয়স নয়, স্থানে অস্থানে ভাঁড়ামি করাই তার ব্যাবসা। গীর্জায় বসে ধর্মযাজকের বক্তৃতার সময় যে ব্যক্তি খিল খিল করে হাসে তাকে ধর্মবিরোধী তরলমতি ভাবা হয়তো অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এই হাসার হেতু যদি হয় এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি যা গীর্জা এবং প্রচলিত ধর্ম আশ্রয় করে যে নীতিহীন চিন্তাহীন অধার্মিকতা প্রশ্রয় পাচ্ছে এবং পুষ্ট হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ এবং প্রবল প্রতিবাদ জানাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহলে যাকে বলা হয় levity বা তরলচিত্ততা, তাই হয়ে দাঁড়ায় অসাধারণ সীরিয়স। শ'র তথাকথিত তরলতা এবং ভাঁড়ামি তাঁর গাম্ভীর্যকে গোপন রাখতে পারে তাঁদের কাছেই যাঁরা শ-মানসের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত নন।[৯] Daily Herald কাগজের পাঠকদের জন্য প্রকাশিত তাঁর সম্পূর্ণ নাট্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকায় তিনি পাঠককে বলেছেন, 'But please do not think you can take in the work of my long life time at one reading. You must make it your practice to read all my works at least twice over every year for ten years or so. That is why this edition is so substantially bound for you.' এই উক্তি ভঙ্গিমাহাত্ম্যে শ'-মার্কা। এতে বহু পাঠক শুধু কৌতুকের পরিচয় পাবেন, দুঃখের বিষয় কৌতুকের স্তর ছাড়িয়ে আরও গভীরে এই উক্তির যাথার্থ্য বুঝবেন এমন পাঠকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। শেষোক্ত পাঠকের কেউ কেউ যদি এই উক্তিতে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন আছে মনে করেন তবে তা সত্যেরই অতিরঞ্জন, শ-সমালোচকদের সমালোচনার মত তা ফ্যাশনের অতিরঞ্জন নয়।

শ যদি নাটক নাও লিখতেন তবু তাঁর বাচনভঙ্গি, তাঁর হাস্যরস এবং কৌতুকপ্রিয়তা, সর্বোপরি তাঁর স্টাইলের গুণে তাঁকে প্রথমশ্রেণীর সাহিত্যিকের মর্যাদা দিতে হত। তাঁর বাচনভঙ্গি তাঁর সরস ব্যক্তিত্বের ছাপে অভিনব ; তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা বক্তব্যের গভীরতাকে সরস এবং চিত্তাকর্ষক করেছে ; ইংরেজি ভাষার শিল্প, প্রতিভা এবং অধ্যবসায়ের ফলে তাঁর করায়ত্ত। নাটকে যে-কথোপকথন তিনি সন্নিবিষ্ট করেছেন তার স্টাইল নাটকীয় কথোপকথন-শিল্পে অপূর্ব। ভাষাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর সত্য প্রকাশের উপযোগী করে তাঁর প্রতিভার বাহনে পরিণত করেছেন। শুধু স্টাইলের দিক দিয়েও ইংরেজি সাহিত্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবেন।

এই প্রবন্ধে বিস্তৃত দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। প্রথমটি[১০] উনত্রিশ

৯ গিলবার্ট কীথ্ চেস্টারটন শ'র দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন নি, কিন্তু শ'র প্রতিভার প্রকৃতি বুঝেছিলেন। এইজন্য আজ পর্যন্ত শ সম্বন্ধে লেখা যত বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে তাঁর বই শ্রেষ্ঠ। তিনি অবশ্য বেশির ভাগ বিষয়ে শ'র সঙ্গে একমত হন নি, কিন্তু তিনি শ'র অতিমাত্রায় সীরিয়স প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো ভুল করেন নি। তাঁর *George Bernard Shaw* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় আছে, 'Most people either say that they agree with Bernard Shaw or that they do not understand him. I am the only person who understands him, and I do not agree with him.' শ তরলচিত্ত ভাঁড় বিশেষ এ ভুল ধারণা শ'র শ্রেষ্ঠ সমালোচক কখনো করেন নি। তিনি শ'কে বুঝবার জন্য তাঁকে তিনটি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন : The Irishman, The Puritan এবং The Progressive।

১০ 'It is the desire of the President that nothing shall be said that might give pain to particular classes. I am about to refer to a modern class, burglars, and if there is a burglar present I beg him to believe that I cast no reflection upon his profession. I am not unmindful of his great skill and enterprise; his risks, so much greater than those of the most speculative capitalist, extending as they do to risk of liberty and life, or of his abstinence; nor do I overlook his value to the community as an employer on a large scale, in view of the criminal lawyers, policemen, turnkeys, gaol-builders and sometimes hangmen that owe their

বৎসর বয়সে Industrial Remuneration Conferenceএ একটি বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এতে মিলবে শ'র বিশেষ প্রকার বাচনভঙ্গি যাতে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা, সমাজব্যবস্থার প্রতি তাঁর মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রাঞ্জল ভাষায় সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয়টি[১১] তাঁর বাষট্টি-চৌষট্টি বৎসর বয়সে লেখা *Back-to Methuselah* নাটক থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে; শেষ অঙ্কের শেষ কয় লাইন। উদ্দেশ্যের মহত্বে, চিত্তের পবিত্রতায়, চিন্তার গভীরতায় এবং নিছক ইংরেজি গদ্য স্টাইলের আদর্শ হিসাবে লিলিথের এই প্রশান্ত গভীর উক্তি অমর হয়ে থাকবে।

৬

শ'র নাট্যরচনা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ভাবে বলা হল। যদিও তাঁর প্রতিভা বহুমুখী এবং তাঁর খ্যাতির হেতু একাধিক, তথাপি বর্তমান লেখকের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যেমন সর্বাগ্রে কবি বার্নার্ড শ'ও তেম্নি সর্বাগ্রে নাট্যকার।

নাটকগুলি প্রকাশিত হবার সময় বিস্তৃত ভূমিকাও তার সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছেন। ভূমিকাসম্বলিত নাটক এই প্রথম নয়, ড্রাইডেনও ইতিপূর্বে এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। রচনার উৎকর্ষ হিসাবে এবং তাঁর বক্তব্য বিষয়ের যৌক্তিকতা এবং প্রাঞ্জলতা লক্ষ্য করে শ'র ভূমিকা সম্বন্ধে বোধ হয় সকলেই একমত হবেন, নাটক সম্বন্ধে যাই হোক। নাটকগুলিকে ভূমিকার নাট্যরূপ বলায় ভুল বুঝবার সম্ভাবনা আছে। এ কথা বলা ভুল হবে যে, নাটকের প্রয়োজনে ভূমিকার কোনো আবশ্যক ছিল। শ'র কাছে তাঁর মতামতের যতই দাম থাক্ না কেন, এ কথা বলা আরও ভুল হবে যে ভূমিকা নাটকের স্থান পূরণ করতে পারে। ভূমিকাতে সোজাসুজি এবং মুখ্যভাবে আছে শ'র বক্তব্য এবং মতামত— শুধু তাঁর বা অন্যের নাটক সম্বন্ধে নয়, সমাজ এবং জীবন সম্বন্ধেও— নাটকে আছে মুখ্যভাবে নাটক। শেক্‌সপীয়ারের নাটক ঘেঁটে তার জীবন-দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর নাটকের প্রকৃত মূল্য নাটক হিসাবেই, দর্শন বা অন্য কিছু গৌণ! শ'র বেলাও এই কথাই সত্য। তাঁর জীবন-দর্শন ভুল হতে পারে, গ্রহণযোগ্য না হতে পারে, তিনি নিজেকে সর্বাগ্রে শিক্ষক মনে করতে পারেন, কিন্তু তাতে তাঁর নাটকের উৎকর্ষ খণ্ডিত হয় না।

শ বারংবার তাঁর মতামতের উপর তাঁর জীবন-দর্শনের উপর জোর দিয়েছেন। জীবনের বেশির

livelihoods to his daring undertakings. . I hope any shareholders and landlords who may be present will accept my assurance that I have no more desire to hurt their feelings than to give pain to burglars : I merely wish to point out that all three inflict on the community an injury of precisely the same nature.'

১১ LILITH . I am Lilith : I brought life into the whirlpool of force, and compelled my enemy, Matter, to obey a living soul. But in enslaving Life's enemy I made him Life's master; for that is the end of all slavery; and now I shall see the slave set free and the enemy reconciled, the whirlpool become all life and no matter. And because these infants that call themselves ancients are reaching out towards that, I will have patience with them still; though I know well that when they attain it they shall become one with me and supersede me, and Lilith will be only a legend and a lay that has lost its meaning. Of Life only is there no end; and though of its million starry mansions many are empty and many still unbuilt, and though its vast domain is as yet unbearably desert, my seed shall one day fill it and master its matter to its uttermost confines. And for what may be beyond, the eyesight of Lilith is too short. It is enough that there is a beyond. (She vanishes).

ভাগ সময়ই তিনি প্রচারকের কাজ করেছেন বক্তৃতায় এবং পুস্তিকায়। নাটকেও তাঁর মতামত এবং জীবন-দর্শনের পরিচয় মেলে। তাঁর ভূয়োদর্শন, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, পরিষ্কার বুদ্ধি এবং মননশীলতার ফলে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেছেন তা স্পষ্টভাষায় প্রচার করে গেছেন। এইজন্য তাঁর চরিত্রে শিক্ষকের প্রচারকের দিকটাও অপ্রধান নয়। তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজসচেতন বুদ্ধি সমাজকে বুদ্ধির পথে, বাঁচবার পথে, উন্নতির পথে চালাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে।

যে-তত্ত্ব তিনি প্রচার করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের চিন্তার ফল নয়। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, পূর্ববর্তী সুধীদের চিন্তাকে তিনি নিজের মত করে গ্রহণ করে, আত্মস্থ করে, প্রয়োজনমত বদলে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে তা প্রকাশ করেছেন। পূর্বগামী যে-যে চিন্তাশীল মনীষীদের নিকট তিনি এইসমস্ত তত্ত্বের জন্য ঋণী তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন স্যামুয়েল বাটলার, কার্ল মার্ক্স, ইব্‌সেন, নীট্‌সে এবং শোপেনহাউয়ার। একদিকে তিনি আদর্শ যুক্তিবাদী, অন্যদিকে যে সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তিবাদের (Creative Evolution) তত্ত্ব তিনি তাঁর রচনায় প্রচার করেছেন তাতে তাঁকে 'মিস্টিক' আখ্যাও দেওয়া চলে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কমেডি *Candida* এবং শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি *Saint Joan*— এই মত পোষণ করেও বলা চলে যে সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তিবাদ তত্ত্বের দিক দিয়ে *Man and Superman* এবং *Back to Methuselah* তাৎপর্যপূর্ণ। এই তত্ত্বের প্রধান অংশ হচ্ছে তাঁর ভাষায় Life Force বা জীবন-বিধাতা, এই জীবনবিধাতা, যদিও আত্মসচেতন নয়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অসম্পূর্ণ আত্মসচেতন মানুষ থেকে Superman বা অতিমানুষ সৃষ্টি করা। আত্মসচেতনতার দিক দিয়ে জীবজন্তু হীন প্রাণী, এই স্তর ছাড়িয়ে আত্মসচেতন মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে, এখন জীবনবিধাতা মানুষ থেকে অতিমানুষ সৃষ্টির জন্য পরীক্ষা চালাচ্ছেন। অভিব্যক্তির কাজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে চলবে, মানুষ তাতে বাধাও দিতে পারবে না, সাহায্যও করতে পারবে না এই মতবাদের তিনি ঘোর বিরোধিতা করেছেন। মানুষ অবস্থার দাস নয়, সে জীবনবিধাতাকে সাহায্য করতে পারে, অবস্থা পরিবর্তনে সে শুধু সক্ষম নয়, অবস্থা-পরিবর্তন-চেষ্টাই তার কর্তব্য।

মানসিক অচেতনতা থেকে সচেতনতার দিকেই জীবনের জয়যাত্রা, যা কিছু এই অভিব্যক্তি, এই অগ্রগতির কাজে সাহায্য করতে পারে তাই মহৎ। এইজন্যই আর্ট মহৎ, কেননা আর্ট সচেতনতার জন্ম দেয়— তাই যুক্তি বুদ্ধি মননশীলতা শ'র কাছে অমূল্য। *Man and Superman* নাটকে Don Juan বলছে, 'To Life, the force behind the Man, intellect is a necessity because without it he blunders into death'. সন্তানপ্রজনন মহৎ কেননা তা অতিমানুষ সৃষ্টির সহায়। এইজন্যই যৌন ব্যাপারকে রোমান্সের মিথ্যা থেকে বাঁচিয়ে তার সত্যকার স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য তিনি জানাতে চেয়েছেন।

সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারে তিনি যে অতিমাত্রায় যুক্তিবাদী এটা তাঁর জীবনবেদের বিরোধী নয় এবং অপ্রাসঙ্গিকও নয়। জীবনবিধাতার পরীক্ষা চলছে নরনারীর সৃষ্টির ভিতর দিয়ে। সৃষ্টির কাজ ব্যাহত হচ্ছে মানুষের মূর্খতা এবং তার দুষ্ট সমাজব্যবস্থার জন্য। সমাজ এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে সৃষ্টির সম্পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে ক্ষতি হচ্ছে জীবনবিধাতার উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে বলে। তাই

শ ভবিষ্যদ্বক্তার বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, যদি মানুষ জীবনবিধাতার কাজে সহযোগিতা না করে, যদি অতিমানুষ সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে নির্দয়ভাবে মানবজাতিকে ধ্বংস করতে জীবনবিধাতার বাধবে না। তিনি চেয়েছেন এমন সমাজব্যবস্থা যার ফলে নরনারী সর্বপ্রকার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতালাভ ক'রে আরও বুদ্ধিমান হয়ে, আরও স্বাভাবিক হয়ে পরস্পর পরস্পরকে বেছে নিতে পারবে এবং জীবনবিধাতার অভিব্যক্তির কাজে অতিমানুষ প্রজননে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। এই হচ্ছে তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথা।

সমাজ এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বিত্তোৎপাদনের উপকরণ সমস্ত সমাজের হাতে থাকবে, কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ তার মালিক হয়ে বসতে পারবে না ; শুধু প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দ্বারাই একটা রাষ্ট্র গণতন্ত্রসম্মত হয় না— তাঁর ভাষায় প্রত্যেক মূর্খকে একটি করে ভোট দেবার অধিকার দিলেই গণতন্ত্র চালু হয় না ; অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে নাগরিককে দাস করে রেখে অন্যব্যাপ'রে ব্যক্তিস্বাধীনতা দেবার কোনো অর্থ হয় না—ইত্যাদি মতবাদ তিনি বক্তৃতায় এবং লেখায় প্রচার করেছেন। এই-জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেয়ে তিনি ক্ষমতাশালী ডিক্টেটর পছন্দ করতেন বেশি, কেননা ডিক্টেটর যা একমাসে করতে পারে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তা দীর্ঘকালেও করতে পারে না।

তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা, বিপুল কল্পনাশক্তি, জীবন সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম অভিজ্ঞতা, জীবনকে কমেডির দৃষ্টিতে দেখবার অসাধারণ ক্ষমতা এবং তাঁর ক্ষুরধার স্টাইল যেমন তাঁকে প্রথমশ্রেণীর নাট্যকারে পরিণত করেছে তেমনি তাঁর যুক্তিবাদ, তাঁর সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তিবাদ, ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁর মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি, দারিদ্র্য সম্বন্ধে তাঁর বাট্‌লারীয় মতবাদ, এইসমস্ত মিলে তাঁর জীবনদর্শন একটা সমগ্রতা লাভ করেছে। যাঁরা তাঁর মধ্যে অসংগতি পেয়েছেন তাঁরা তাঁকে অসম্পূর্ণভাবে জেনেছেন, তাঁদের জন্যেই তাঁর বই 'substantially bound' হয়ে প্রকাশিত হয়েছে যাতে বছরে দুই তিন বার করে অন্ততঃ বছর দশেক পড়া চলে। প্রতিভা সবকালে সমান আত্মসচেতন হয় না। শ'র মত আত্মসচেতন প্রতিভা পৃথিবীতে বিরল। এই আত্মসচেতনতার প্রকাশ দাম্ভিক মনে হলেও, এমনকি শ'র ব্যঙ্গপ্রিয় প্রকৃতি তাকে দাম্ভিক বলে নির্দেশ করলেও, তা দাম্ভিকতা নয়, বিশেষ ভঙ্গিতে সত্যের প্রকাশ মাত্র।

গ্রন্থপরিচয়

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী। সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। শ্রাবণ ১৩৫৭। মূল্য সাড়ে ছয় টাকা।

হিত এবং মনোহারী বাক্যের বক্তা যেমন দুর্লভ, প্রসন্নমনে কোনো শ্রমসাধ্য কাজের অনুরোধ-রক্ষা-কর্তাও তেমনি দুর্লভ। কিন্তু এ স্থলে অনুরোধকর্তা সে অসাধ্য সাধনে সক্ষম হয়েছেন, কেননা শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী সমালোচনার ভার আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি। জানি এ সমালোচনা বাহুল্য, যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শুভবিবাহ' পড়ে বলেছেন, "এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোনো গল্পের বইয়ে আমরা দেখি নাই।" সজীব ও সত্য। যে দুটি বিশেষণ তাঁর লেখা সম্বন্ধে আমার ও সম্ভবতঃ অন্যান্য সমঝদার পাঠকদের মনের কথা, একেবারে টেনে বের করেছে। এত সহজে ও সংক্ষেপে আসল মর্মে পৌঁছে দেবার কি আশ্চর্য ক্ষমতা আছে জাতলেখকদের। তবু যে এই কথাটাই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বলবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছি, তার সাধারণ কারণ তাঁর রচনাবলীর বহুকাল পরে নবকলেবরধারণ, এবং ব্যক্তিগত কারণ তাঁর সঙ্গে আমার বহুকাল আগেকার বন্ধুত্বের স্মৃতিরোমন্থন।

মানুষ একলাই জন্মগ্রহণ করে এবং একলাই মৃত্যুবরণ করে এ শাস্ত্রবাক্য যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে, ইতিমধ্যে সে নানাপ্রকার লোকের সঙ্গে নানা ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করে কতক পৈতৃক কতক স্বোপার্জিত। শরৎকুমারীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ উত্তরাধিকারসূত্রেই প্রাপ্ত বলতে হয়; কারণ খুব ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে আমার বাপের বাড়িতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে যাতায়াত করতে দেখেছি। সেই বয়সে একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম তাঁকে কি বলে ডাকব, ও তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন— বল খুকি। সেই যে 'খুকি' বলে তাঁকে ডাকতে লাগলুম, সে ডাক মরণান্ত কাল পর্যন্ত চলেছিল, এবং আজও অন্য কোনো নামে তাঁকে উল্লেখ করতে বাধে। তাঁকে আমার বাল্যসঙ্গিনী বললে ভুল হবে, কারণ বয়সে বেশ কিছু তফাত ছিল। সন তারিখ ছাড়াও তার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, তাঁদের সর্কুলর রোডের বাড়িতে কতদিন নিয়ে গিয়ে কত যত্নে নিজে নাইয়ে খাইয়ে দিয়েছেন; বিশেষ হাঁসের ডিম ভাতে মাখাটা এখনো মনে পড়ে। তাঁর স্বামী মহাশয় অক্ষয় চৌধুরীর কাছে সেই সময় *Golden Treasury* থেকে কখনো কখনো কবিতাও পড়তুম; বিশেষতঃ 'One more unfortunate' লাইনটা বুঝতে না পেরে মানে জিজ্ঞাসা করেছিলুম বেশ মনে পড়ে। আমার দাদাকে ও আমাকে বহুকাল পরে ওথেলো পড়াতে গিয়ে অক্ষয়বাবু নিজেই কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন, তাও স্মৃতিতে গাঁথা আছে। কেবল কখন অ্যাটর্নিগিরি করতেন সেইটে আজও বুঝতে পারি নি। কিন্তু তাঁর কথা এখানে অবান্তর। কেবল উভয়ের নিকট আমাদের স্নেহঋণ স্বীকার করবার জন্যই এটুকু বলা।

শরৎকুমারী যে ঠাকুরবাড়িতে 'লাহোরিণী' নামে খ্যাত ছিলেন, সে কথা যখন গ্রন্থের ভূমিকাতে উল্লিখিত হয়েইছে, তখন আমি আর একটু হাটে হাঁড়ি ভেঙে বলে দিচ্ছি যে, শুধু 'লাহোরিণী' কেন, স্বর্ণপিসিমার তিনি ছিলেন 'বিহঙ্গিনী', আমার মায়ের 'চাঁদ্‌নি', নতুন-কাকিমার 'খ্যাশেন', এবং আমার 'খুকি'।— সেকালের অন্য অনেক অন্তরঙ্গ ব্যাপারের মত মেয়েদের মধ্যে পাতানো জিনিসটা আমাদের কাল

থেকেই উঠে গেছে, কিন্তু তার অব্যবহিত আগেকার কালেও এই সরল মেয়েলি প্রথাটির বেশ চল ছিল, ও তার রেশ আমাদের কালেও এসে পৌঁছেছে। শেষবয়সের দিক থেকে ধরলে শরৎকুমারী আমার বন্ধুই ছিলেন।

কিন্তু তাঁর মধ্যবয়সের লেখিকাস্বরূপ সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা বা স্মৃতিই নেই। তার এক কারণ পূর্বোক্ত বয়সের পার্থক্য, আর-এক কারণ হতে পারে তাঁর নিজের লেখা জাহির করবার স্বাভাবিক অপ্রবৃত্তি,— যেটা তাঁর প্রকাশকরা উল্লেখ করেছেন। সেইটেই বোধহয় প্রধান, নয় তো ঐ বয়সেই অক্ষয়বাবুকে কবিতায় (? !) পত্র লিখে আমার অকালপক্কতার পরিচয় দিতে বাকি ছিল না। সুতরাং তাঁর আধুনিক পাঠকের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে নবীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এই নবীন রচনাবলীর আলোচনা করতে পারব।

চেহারার সঙ্গে রচনার কোনো যোগ স্বভাবতঃ না থাকলেও আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমেই লেখিকার ছবি দিয়ে প্রকাশকরা ভাল কাজই করেছেন। কারণ অন্ততঃ এ স্থলে সুলেখার সঙ্গে সুচেহারার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে। প্রসঙ্গতঃ বলি, বইখানি আর-একটু বেঁটে ও ফলতঃ আর-একটু মোটা হলে আমার স্বজাতির পক্ষে আর-একটু সুবিধের হত; কারণ তাঁরা বেশির ভাগ দুপুরবেলা শয়ানাবস্থাতেই বই পড়ে থাকেন বলে আমার বিশ্বাস। আর যেমন কোনো কোনো কবিকে 'কবির কবি' বলা হয়ে থাকে, তেমনি এই লেখিকাকে 'পাঠিকার লেখিকা' বলে গণ্য করাই উচিত। এত বেশভূষার বর্ণনা, এত খাবারের গল্প কি পুরুষদের পোষায়?— জানি নে। অথচ আমরা সেগুলি পরম তৃপ্তিসহকারে গিলতে থাকি। অবশ্য বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, প্রকাশভঙ্গির গুণে তা সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে উঠলেই সাহিত্যামোদী মাত্রই রস পাবেন।

বইখানি গোটা পঁচিশেক স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বা গল্পের সমষ্টি। কিন্তু এঁর বিষয়ও বলা যেতে পারে— যেমন আর একজন লেখক সম্বন্ধে সেদিন কে বলেছেন— যে, এঁর প্রবন্ধগুলি গল্পের এবং গল্পগুলি প্রবন্ধের আকার সহজেই ধারণ করে। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ রয়েছে বাঙালি স্ত্রীসমাজের সরস বর্ণনা এবং সুহৃদ্‌সস্মিত সমালোচনা। অথবা কোমর বেঁধে সমালোচনা করতে বসবার আবশ্যকও হয়নি, বর্ণনার সঙ্গেই সমালোচনা নিপুণভাবে ওতপ্রোত। কেবল দুই-চারিটি প্রবন্ধের বিষয় সত্যই স্বতন্ত্র, যথা ত্রিপুরার প্রসঙ্গ। তাও 'ত্রিপুরার গল্প'টি স্ত্রীপ্রধান নয় তো কি? ঐ দুটি পৃষ্ঠার মধ্যে কি সুন্দর একখানি নাটিকা নিহিত রয়েছে, যদি তেমন সিদ্ধহস্তে কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেনা। 'জীবজন্তুর প্রতি অনুরাগ' ও ঐ শ্রেণীর আর-একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। আমি নিজে পড়ে শুনিয়ে পরখ করে দেখেছি আবালবৃদ্ধবনিতা এই সরল সুন্দর বর্ণনায় সমান তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে। কয়টি রচনা সম্বন্ধে এ কথা বলা যেতে পারে? এত জীবন্ত যে সত্য বলেই মনে হয়, অর্থাৎ নিজের জীবনের কাহিনী। কিন্তু সত্যকেও কজন লেখক জীবন্ত করে তুলতে পারেন?— তাহলে তো ইতিহাস মাত্রই উপন্যাস হত।

তৎকালীন, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার, বাঙালি স্ত্রীসমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাতেই যেন শরৎকুমারী নিজের মানসের স্বাভাবিক বিচরণভূমি খুঁজে পান এবং অভ্যস্তহস্তে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্তভাবে নিপুণ তূলিকা সঞ্চালন করেন। আমার বিশ্বাস, তিনি কলকাতার ধনী কায়স্থ সমাজের সঙ্গে নানা আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; তাঁর অধস্তন নিকট-আত্মীয়াদের কাছেও যেন সেইরূপ শুনেছি। যদিও

দুঃখের বিষয়, এখন এ সম্বন্ধে সাক্ষি দেবার মত বড় কেউ ইহলোকে নেই। বর্ণনাগুলি এতই জীবন্ত (আবার সেই এক কথা) যে মনে হয় না কেউ স্বচক্ষে না দেখে এরকম লিখতে পারে। অবশ্য সেকালে গল্প শুনেছি George Eliot (জর্জ এলিয়ট) জীবনে কখনো tavernএর ভিতর না গিয়েও তার নিখুঁত বর্ণনা করেছেন; কিন্তু কথাটা সত্য হলেও মন তা'তে সায় দেয় না। তা ছাড়া একটা tavernএ জীবন হয় না, যেমন এক কোকিলে বসন্ত হয় না। অবশ্য ওমর খইয়ামের মত অন্যরূপ।

আমাদের ঠিক এ সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কোনোকালে ছিল না বলেই তার বর্ণনা পড়তে এত ঔৎসুক্য জাগে এবং কৌতুক লাগে। বেশভূষা, আহার-বিহার ও আচার-ব্যবহারে বঙ্গমহিলাসমাজ গত পঞ্চাশ বৎসরে কি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে তার ইতিহাস ইচ্ছে করলে এই বই থেকে বেশ উদ্ধার করা যায়। 'চায়না কোট' পদার্থটি কি, এবং তা' মেয়েরা কি করে পরত, পরলেই বা কি রকম দেখাত, আধুনিক বিদুষী-মণ্ডলী সে বিষয় গবেষণা করে কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারেন এবং সেকালে জন্মান নি বলে নিজেদের ধন্য মানতে পারেন। বলা যায় না, হয়তো ভবিষ্যতের বাঙালিনী তাঁদের বর্তমান পোশাক নিয়েও ঠাট্টাতামাশা করবেন। অবশ্য কালে কালে রুচি ও বেশের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের আধুনিক নারীবেশ এত সুসংগত, সুপ্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ভবিষ্যতে তাকে সেকেলে মনে হলেও কোনোদিন হাস্যকর মনে হবে, তা তো বোধ হয়না। তবে পরের চোখে নিজেকে দেখবার ক্ষমতা থাকলে 'গোল ত মিটেই যেত'।

গল্প ও প্রবন্ধের মধ্যে যে যোগাযোগের কথা আগে বলেছি, তার যোগসূত্রটি হচ্ছে প্রধানতঃ লেখিকার সুবিবেচক মন, উদার ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সরল সুঠাম বাচনশৈলী। তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, তাঁর গল্পে বৈশিষ্ট্য নেই। সমগ্র বইটির মধ্যে 'শুভবিবাহ' 'যৌতুক' ও 'সোনার ঝিনুক' নামে যে তিনটি বড় গল্প আছে, সেগুলি রীতিমত গল্পই। তার মধ্যে মূল গল্পাংশ, ঘটনাবৈচিত্র্য, চরিত্র-বিশ্লেষণ এবং সংগত গতি ও পরিণতি প্রভৃতি ছোট গল্পের মালমসলা সবই রয়েছে। তবে সকলের ভিতরেই সামাজিক চিত্র আঁকাটাই যেন প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। গল্পের পরিকল্পনাও গতানুগতিক নয়, সবগুলিরই মধ্যে একটু স্বকীয়তা লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে একটি গল্পকথার পরামর্শদাতা বললেও সে স্বকীয়তা খর্ব হয় না। প্রত্যেক গল্পেই নূতনত্ব আছে।

এর মধ্যে একমাত্র প্রথম গল্প 'শুভবিবাহ'ই প্রকাশকরা পুস্তকাকারে পেয়েছেন শুনতে পাই। অন্য রচনাগুলি নানা বিক্ষিপ্ত পত্রিকা থেকে সংকলন করে তাঁরা বঙ্গসাহিত্যের মহৎ উপকার সাধন করেছেন, এবং তাঁদের কষ্ট সার্থক হয়েছে। আমি তো নিজের তরফ থেকে এইটুকু বলতে পারি যে, একটানা পড়ে গিয়ে এমন অনাবিল আনন্দ আমি বহুকাল কোনো বই থেকে পাই নি ও কখনো একঘেয়ে লাগে নি। এবং আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ পাঠিকাই আমার এই রায় সমর্থন করবেন। সকলের পড়বার মতন, সকলকে আনন্দ ও শিক্ষা দেবার মতন, সূক্ষ্ম নজর ও সরস বর্ণনাপূর্ণ সমবেদনা ও সমালোচনা মিশ্রিত এমন সুচিন্তিত ও সুলিখিত সর্বাঙ্গসুন্দর একখানি বই যে আমাদের স্বজাতির হাত থেকে বেরিয়েছে, সেজন্য আমরা বঙ্গনারী মাত্রেই গর্বে উৎফুল্ল বোধ করছি। আশা করি বাংলার ঘরে ঘরে বইখানির বহুল প্রচার হবে।

শ্রীইন্দিরা দেবী

ধর্মবিজয়ী অশোক। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। পূর্বাশা লিমিটেড। ১৩৫৪। মূল্য তিন টাকা।
বৌদ্ধধর্ম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পূর্বাশা লিমিটেড। ১৩৫৫। মূল্য তিন টাকা।
বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম। শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং। ১৩৫৫। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

আলোচ্য তিনখানি বইই বৌদ্ধধর্ম নিয়ে রচিত এবং প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত। বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট আলোচনা হয় নি। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় সে আলোচনা আরও কম। অথচ বাংলা দেশেই বৌদ্ধধর্মের মৌলিক গবেষণা আরম্ভ হয় বিগত শতকের শেষ পাদে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শরৎচন্দ্র দাস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্মের মৌলিক আলোচনায় যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের নাম আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের নানা কাব্যগ্রন্থ ও রচনার মধ্য দিয়েও বৌদ্ধধর্মের নানা ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের বিরাট অবদান বাঙালীর মনে দোলা দিয়েছিল অথচ বাংলা সাহিত্যে সে ধর্ম সম্বন্ধে মৌলিক আলোচনা যথেষ্ট স্থান অধিকার করে নি। আলোচ্য তিনখানি বই সে বিষয়ে পথপ্রদর্শক হবে আশা করা যায়।

প্রবোধবাবু তাঁর বইয়ে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা নিয়ে মৌলিক আলোচনা করেছেন, সে ঘটনা হচ্ছে সম্রাট অশোকের 'ধর্মবিজয়'। এই ঘটনা অবলম্বনে তিনি যেসব বিষয়ের আলোচনা করেছেন সেগুলি হচ্ছে: ভারতবর্ষের ইতিহাসে ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতির স্থান, অহিংসা ও রাজনীতির মধ্যে অশোকের সামঞ্জস্যবিধান, অশোকের ধর্মনীতি এবং তার পরিণাম। প্রবোধবাবুর এইসব আলোচনার মধ্যে তুলনামূলক বিচার রয়েছে। অশোকের পূর্ববর্তী পারস্য সাম্রাজ্যে অনুসৃত রাজনীতি, এবং আলেকজান্দার ও তাঁর পরবর্তী গ্রীকরাজাদের অনুসৃত নীতির সঙ্গে অশোকের অভিনব রাজনীতির তুলনা করে তিনি অশোকের মহত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছেন।

অশোক ইতিহাসে একটি বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী রাজাদের আচরিত প্রথা পরিত্যাগ করে নূতন প্রথার প্রবর্তন ক'রে। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দিকে কলিঙ্গদেশ জয় করতে গিয়ে অশোক দিগ্বিজয়ের বীভৎস রূপ দেখেছিলেন। তাঁর নিজের কথা অতিরঞ্জিত না হলে বিশ্বাস করতে হয় যে এই যুদ্ধে 'দেড় লক্ষ লোক বাস্তুহারা হয়েছিল, এক লক্ষ হয়েছিল নিহত এবং তার বহুগুণ হয়েছিল বিনষ্ট'। যুদ্ধের এই ভীষণ পরিণাম দেখে তিনি অনুতপ্ত হন এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও জীবহিংসা ছেড়ে দেন এবং দিগ্বিজয় ছেড়ে দিয়ে 'ধর্মবিজয়ে' মনোনিবেশ করেন। মৈত্রী ও অহিংসার দ্বারাই তিনি এ নূতন বিজয়ে ব্রতী হন।

যেসব দেশ অশোক মৈত্রী ও ধর্মের দ্বারা জয় করেছিলেন তার তালিকাও তাঁর শিলালিপিতে রয়েছে: সিরিয়া, মিশর, মাকিদোনিয়া, কাইরিনি ও কোরিন্থিয়া। এসব দেশ ছিল গ্রীকরাজাদের অধীন। স্বদেশে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি দক্ষিণের প্রত্যন্তদেশগুলি এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের যবন, কম্বোজ, গন্ধার প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও তিনি ঐ একই সম্বন্ধ স্থাপন করেন। মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ দেশগুলিতে 'তিনি মানুষ ও পশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, মানুষ ও পশুর চিকিৎসার পক্ষে প্রয়োজনীয় ভেষজ লতাগুল্ম এবং ফলমূল যেখানে যা নেই সেখানে তা সংগ্রহ ও রোপণ করিয়েছিলেন, তা ছাড়া মানুষ ও পশুর 'পরিভোগের' জন্য পথে পথে কূপখনন এবং বৃক্ষরোপণাদির ব্যবস্থাও করেছিলেন'।

অশোকের ধর্মবিজয়ের এই ছিল মূলনীতি। এই মূলনীতির দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রবোধবাবু ভারতের এবং সমসাময়িক পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্দেশ করেছেন এবং সে চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন।

অশোক ব্যক্তিগতভাবে বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি সকল ধর্মসম্প্রদায়কেই সম্মান করতেন। প্রজাদের মধ্যে যাতে প্রত্যেকে নিজস্ব ধর্মমত পোষণে কোনো বাধা না পায় সে দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্য তিনি ধর্মমহামাত্রদের উপর আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি শিলালিপিতে যেসব ধর্মনীতি পালন করবার জন্য প্রজাদের নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলি কোনো সম্প্রদায়গত নীতি নয় এ কথা বলাও চলে—'পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও দাসভৃত্যাদির প্রতি সদ্ব্যবহার, প্রাণীর প্রতি অবিহিংসা, পরমধর্ম সহিষ্ণুতা, সংযম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা, দান, দয়া, অনালস্য, সত্যবচন ইত্যাদি'। এইসব সনাতন নীতির প্রচার সত্ত্বেও অশোকের ধর্মবিজয়-নীতির পরিণাম হয়েছিল শোচনীয়। প্রবোধবাবু দেখিয়েছেন যে, দেশে সে নীতি ব্রাহ্মণদের চিত্ত স্পর্শ করতে পারে নি, বরঞ্চ তাদের বিরুদ্ধতাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। ব্রাহ্মণদের এই অসন্তোষই তাঁর সাম্রাজ্যের পতনের একটি প্রধান কারণ।

এ অবস্থায় প্রবোধবাবুর প্রতিপাদ্য কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করা চলে। অশোক যে বৌদ্ধধর্মের দিকে খুব ঝুঁকে পড়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অশোকাবদানের কাহিনী বিশ্বাস করলে স্বীকার করতে হয় যে তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বেশ বাড়াবাড়িই করেছিলেন। সে কথা না বিশ্বাস করলেও এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, অশোকের কোনো কোনো ধর্মমহামাত্র তাঁর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল এবং ব্রাহ্মণদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

এ কথা ঠিক যে অশোক যেসব চারিত্রনীতির অনুসরণ করবার জন্য পুনঃপুনঃ প্রজাদের উপদেশ দিয়েছেন সেগুলি ভারতীয় ধর্মসমূহের সনাতন নীতি। কিন্তু এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, সাধারণের মধ্যে সে নীতিগুলির প্রচারে বৌদ্ধধর্ম ই প্রথম উদ্যোগী হয়, এবং অশোকও বৌদ্ধধর্মের প্রেরণাতেই সে কাজে ব্রতী হন। অশোক তাঁর ভাব্রা অনুশাসনে জোর গলায় এই বৌদ্ধধর্মেরই প্রচার করেছেন—'বিদিতে বে ভংতে আবতকে হমা বুদ্ধস্‌সি ধংমস্‌সি সংঘস্‌সি তি গালবে চ প্রসাদে চ' (বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘে 'আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা সকলেই জানেন)। তার পর তিনি কয়েকখানি বুদ্ধভাষিত গ্রন্থের নাম করেছেন এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের সেগুলি অনুধাবন করতে বলেছেন। তিনি যে 'বিহারযাত্রা' ছেড়ে দিয়ে লুম্বিনী গয়া প্রভৃতি স্থানে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন, তাতেও বোঝা যায় যে বৌদ্ধধর্মে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, এবং সে অনুরাগ তিনি প্রকাশ্যেই (হয়ত প্রজাদের শিক্ষার্থে) দেখাতেন।

আমার বিশ্বাস, অশোক সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধবিরোধী নীতি ও অহিংসনীতি অবলম্বন করেছিলেন। প্রবোধবাবু ত্রয়োদশ শৈললিপির যে অর্থ নির্ধারণ করেছেন তা সর্ববাদীসম্মত নয়। ঐ শৈললিপিতে আছে: 'যো পি চ অপকরেয় তি ছমিতবিয়মতে ব দেবনং প্রিয়স্‌স যং শকো ছমনয়ে য পি চ অটবি(য়ো) দেবনং প্রিয়স্‌স বিজিতে ভোতি ত পি অনুনেতি অনুঝপেতি অনুতপে পি চ প্রভবে· ·দেবনং প্রিয়স্‌স বুচতি তেব কিতি অবত্রপেয়ু ন চ হংঞেয়সু।'—'কেউ যদি অপকার করে তাহলে যতদূর সাধ্য 'দেবানাং-প্রিয়' ততদূর তাকে ক্ষমা করবেন। দেবানাং-প্রিয় অটবির অধিবাসীকেও জয় করেছেন ও (নিজের ধর্মমতের) অনুগামী করেছেন। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে অনুতপ্ত হওয়াই প্রধান(নীতি),

··স্থতরাং তারা যেন অনুতপ্ত হয় ও (জীবদের অথবা নিজেদের) হনন না করে'। অশোকের এই উক্তি থেকে অনুমান করা চলে না যে, অশোক এ কথা বলে শাসিয়েছেন যে 'তাঁরও ধৈর্য এবং ক্ষমার একটি সীমা আছে, ওই সীমা অতিক্রান্ত হলে তিনি অস্ত্রধারণ করে তাদের শাস্তিবিধান করতে কুণ্ঠিত হবেন না'। কৃতকার্যের জন্য অটবিরাজ্যের লোকেরা অনুতপ্ত না হলে অশোক তাদের 'হনন করবেন' এ রকম কথা ওখানে বলা হয় নি। অশোকের উক্তির ও-অর্থ করলে তাঁর ত্রয়োদশ শৈললিপির সমস্ত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়।

প্রবোধবাবু বলেছেন যে, বুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে সমর্থন করতেন, এবং সে সম্পর্কে মহাপরিনির্বাণ সুত্তের প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। অজাতশত্রু বৈশালীর বৃজিদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে মনস্থ করেন, যে সম্বন্ধে বুদ্ধের মতামত জানবার জন্য বর্ষকার নামক এক ব্রাহ্মণকে বুদ্ধদেবের নিকট পাঠান। বুদ্ধ তখন আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, বৃজিদের নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি আছে কি না, এবং তারা সদ্ধর্ম পালন করে কি না। আনন্দের উত্তরে খুশি হয়ে বুদ্ধদেব বর্ষকারকে বললেন যে, বৃজিরা যতদিন ঐভাবে জীবনযাপন করবে ও সদ্ধর্ম পালন করবে ততদিন তাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধিই পাবে। অতঃপর অজাতশত্রু বৃজিদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করে দেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বুদ্ধ বৃজিদের সদ্ধর্ম পালনের উপরই জোর দিয়েছিলেন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বলেন নি। পক্ষান্তরে কোশলের রাজা বিরূঢ়ক যখন কপিলবস্তুর শাক্যদের দ্বারা অপমানিত হয়ে কপিলবস্তু আক্রমণ করেন তখনও বুদ্ধদেব শাক্যদের যুদ্ধ না করতেই বলেছিলেন। শাক্যেরা তাঁর সে পরামর্শ পালন করেছিল। চার জন শাক্যরাজপুত্র বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ না করে যুদ্ধ করেন বলে শাক্যেরা তাঁদের কপিলবস্তু থেকে নির্বাসিত করেন।

অশোকের ধর্মনীতি সম্বন্ধে যে মতদ্বৈধই থাকুন না কেন, সম্রাট হিসাবে তিনি ছিলেন অদ্ভুতকর্মা। তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকলেও কিছু অন্যায় কাজ করেন নি। তাঁর সাম্রাজ্য তাঁর পরেই ধ্বংস হয়েছিল কিন্তু তার দ্বারা তাঁর অবদানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নি। তাঁর চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম অগ্রগতি-সম্পন্ন হয়ে অল্পকালের মধ্যেই একটি মহামানবীয় সভ্যতায় পর্যবসিত হয় এবং সমস্ত এশিয়াকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রবোধবাবু তাঁর বইয়ে এইসব প্রশ্নের বিশদ্ আলোচনা করেছেন। যেসব প্রশ্নের তিনি সমাধান করেছেন তা আমরা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করি, না করি আলোচনা নূতন পথে চালিত করবার জন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি বহুকাল পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলিকে এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করায় প্রভূত উপকার হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন বাংলা ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনার অগ্রদূত। নেপালের রাজকীয় পুঁথিশালায় বহুবার পুঁথির অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের সঙ্গেও যেমন পরিচয় লাভ করেছিলেন, নেপালে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেও তেমনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁর রচনাগুলিতে যেমন শাস্ত্রীয় কথা আছে তেমনি প্রচলিত বৌদ্ধ আচারের কথাও আছে। উপরন্তু তাঁর ভাষা যেমন সরল রচনারীতিও অপূর্ব। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে তাঁর কোনো কোনো সিদ্ধান্ত এখন আর গ্রহণযোগ্য মনে না হতে পারে। ধর্মঠাকুরের পূজা সম্বন্ধে তাঁর মৃত্যুর পর অনেক আলোচনা হয়েছে এবং যাঁরা সে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা মনে করেন যে, ঐ পূজাপদ্ধতির উদ্ভব বৌদ্ধধর্ম থেকে নয়। উড়িষ্যায় অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি পঞ্চসখাদের ধর্মমতের উপর

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তা ছাড়া মহিমাধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যে কোনো যোগ নাই সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। কিন্তু এসকল আলোচনা মোটেই অগ্রগতি লাভ করত না, যদি না শাস্ত্রী মহাশয় সে আলোচনা আরম্ভ করতেন।

গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় প্রবন্ধগুলি আরও ভালোভাবে সাজানো চলত। ঐতিহাসিক ধারা বজায় রাখবার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। ১১, ৬১, ৬৮, ৭১-৭৪ পৃষ্ঠায় যেসব অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলা পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে তার শুদ্ধ পাঠ এখন পাওয়া যায়, সেই শুদ্ধ পাঠগুলি পাদটীকায় কিংবা সংযোজনীতে দিলে পাঠকের উপকার হত।

নলিনীবাবুর বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম নূতন ধরনের বই। তিনি মূলতঃ 'পাথুরে প্রমাণ' অর্থাৎ archaeological evidenceএর সাহায্যে বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লিখবার চেষ্টা করেছেন। এই ইতিহাস তিনি ভাগ করেছেন প্রধানত চারভাগে: আদিযুগ, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ, পালযুগ ও পাল-পর যুগ। বাংলাদেশে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলির ইতিহাস তিনি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিবৃত করেছেন। এ বই বহুপরিমাণে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় বাংলাদেশের যে প্রাচীন ইতিহাস (History of Beangal I) বেরিয়েছে তার নিকট ঋণী, এ ঋণ নলিনীবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সে বই সাধারণ পাঠকের উপযোগী হয় নি। সুতরাং বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্মের এ রকম ধারাবাহিক ও প্রামাণিক ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল, নলিনীবাবু সে অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করেছেন বলে তাঁর নিকট সকলেই কৃতজ্ঞ থাকবেন। বই প্রামাণিক বলেই কয়েকটি ভুলত্রুটির দিকে গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

পৃ ২৪ প্রজ্ঞাপারমিতা নাগার্জুন প্রমুখ আচার্যদের রচনা নয়। নাগার্জুন ঐ গ্রন্থের 'প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র-শাস্ত্র' নামক টীকা রচনা করেন। তা থেকেই বোঝা যায় যে, মূল গ্রন্থ প্রাচীন।

পৃ ৩৪ পো-চি-পো পো-শি-পো হবে। চীনা লো-তো-মো-চি থেকে রক্তভিত্তি হয় না। রক্তমাটি হওয়াই বেশি সম্ভব।

পৃ ৪০ মহাবস্তু ৩০০ খৃস্টাব্দের পরে রচিত হয়েছিল এ অনুমান অসঙ্গত। মহাবস্তু মহাসাংঘিক নিকায়ের লোকোত্তরবাদী সম্প্রদায়ের বিনয়পিটকের প্রথমাংশ, পালী মহাবগ্গের সঙ্গে তুলনীয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিনয়পিটক ৩০০ খৃস্টাব্দের বহু পূর্বেই রূপ নিয়েছিল।

পৃ ৭৬ চীনা নাম দুটির প্রকৃত উচ্চারণ ফু-চি এবং ফো-লি-নাই।

পৃ ৯৮ অসঙ্গের আগেও যে বহু আগম রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ কোথায়?

পৃ ১০০ বুদ্ধের আবির্ভাব-কালে যে যোগপন্থা দু রকমের ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই।

পৃ ১০৭ মৎস্যেন্দ্রনাথ চন্দ্রদ্বীপের ছিলেন বটে কিন্তু সে চন্দ্রদ্বীপ যে বাখরগঞ্জে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

পৃ ১৪৬ উড্ডিয়ান ও সোহোরের অবস্থান সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা হয়েছে। সে দুই স্থানকে বাংলা দেশে টেনে আনবার চেষ্টা করে পুনরায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের জটিলতা না বাড়ালেই ভালো ছিল।

পৃ ১৪৮ সিলভাঁ লেভির মতে 'সাহোর গোটা হিন্দুস্থান'—লেভি এ কথা কোথায় বলেছেন?

তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিত্যের 'তাঞ্জুর' ও 'কাঞ্জুর'কে 'তেঙ্গুর' ও 'কেঙ্গুর' না বলাই ভালো, উচ্চারণের দিক দিয়ে ও-ধরনের বানানের কোনো সমর্থন নেই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

—সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমাদ্রির দক্ষিণে যে বর্ষ অবস্থিত তারই নাম ভারত, এবং তারই সন্তানগণ ভারতী নামে পরিচিত। আসমুদ্রহিমাচল এই ভূখণ্ড যে 'ভারতবর্ষ' নামে ঐতিহাসিক পরিচয় লাভ করেছে, সেটা রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ফল নয়। অতীতের ভারত কোনো নরপাল ও রাজ্যেশ্বরের প্রতাপে বা প্রভাবে কখনো একটি অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে পরিণাম লাভ করে নি। তবুও, নিতান্ত বিস্ময়কর হলেও সত্য এই যে, ভারত নামে একটা অখণ্ড দেশত্ববোধ সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-নর্মদা-গোদাবরী-কাবেরীর সলিলবিধৌত বিভিন্ন উপত্যকাভূমির প্রতি জনপদবাসীর চিত্তে একটা সংস্কার-রূপে গড়ে উঠেছে। সংস্কার হিসাবে, বা ভাব হিসাবে, কিংবা আইডিয়া হিসাবেই হোক, ভারত নামে দেশত্ববোধ যুগ যুগ ধরে সত্য হয়ে আছে এক বহুরাষ্ট্রিক ও বহুভাষিক ভূখণ্ডের অধিবাসীর মনে। আর্যচিন্তার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি বেদ ভারতীয় মনীষাকে সহস্র গৌরব দান করেছে সত্য, কিন্তু ভারতের মানুষকে দেশাত্মবোধ তথা দেশৈক্যবোধ দান করেছে পুরাণ, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দান হল পুরাণ-মহাভারতের। ভারত নামে দেশত্বের বোধ এবং ভারতীয়তা নামে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অভিরুচি যে মূল আইডিয়া থেকে উৎসারিত হয়েছে, সেই আইডিয়ার ধারক বাহক এবং রক্ষক মহাভারত নামে পরিচিত গ্রন্থটি। এই দিক দিয়ে মহাভারতের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো মহাগ্রন্থের তুলনা হয় না। কোনো মহাকাব্য একটা দেশ ও জাতি সৃষ্টি করেছে, তার একমাত্র উদাহরণ হল মহাভারত। বিজ্ঞানীরা বলেন, বাষ্পীয় নীহারিকাপুঞ্জ মহাজাগতিক শক্তির লীলায় কঠিন কায়া লাভ করে গ্রহে পরিণত হয়েছে। তেমনি, যে ভারত পৌরাণিক কবির ভাবলোকে একটা কল্পনা বা আইডিয়া রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল, তাই ঐতিহাসিক ঘটনা সৃষ্টি করে দেশরূপে পরিণাম লাভ করেছে।

মহাভারত বস্তুত ভারত-অভ্যুদয়ের ইতিবৃত্ত। কুরুক্ষেত্র শুধু রণক্ষেত্রই নয়, বিরাট এক ঘটনা-বিপ্লবের যজ্ঞক্ষেত্র। কোথায় পূর্বপ্রান্তের মণিপুর আর পশ্চিমের দ্বারকা, উত্তরের গান্ধার আর দক্ষিণের মদ্র— তবু এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বহুজাতি এবং বহুরাজ্য প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সমন্বয়ের এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে একীভূত হয়ে উঠেছে, মহাভারত সেই ঐক্যবিধায়ক ঘটনার কাহিনী। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্রের নাম ভরত এবং এই নৃপতি ভরতের শাসিত দেশেরই নাম ভারত, পৌরাণিকী উপাখ্যানে এই কথা বলা হয়েছে। কিম্বদন্তীর সেই ক্ষুদ্র ভারত আসমুদ্র-হিমাচল ভারত নামে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় লাভ করেছে মহাভারত-রচয়িতার বর্ণিত জাতীয় সমন্বয়ের কাহিনীতে। এক কথায় বলা যায়, ঐতিহাসিক সন্দর্ভ হিসাবে মহাভারত হল ভারতের প্রথম জাতীয় সংগঠনের ইতিবৃত্ত।

কিন্তু মহাভারত কি নিছক অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কাহিনীবহুল এক মহাকাব্য? যদি তাই হত, তবে মহাভারত গ্রন্থ শুধু ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটা সমাদরের সামগ্রীরূপে পরিগণিত হত। কিন্তু মহাভারত অতীতের একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের বা জাতিগত সমন্বয় ও সংহতির কাহিনী মাত্র নয়। মহাভারত বহু কাহিনীর, বহু বিভিন্ন বিষয়ের ও তত্ত্বের বর্ণনায় পরিপূর্ণ এক মহাগ্রন্থ। কখনো মনে হয়, মহাভারত ভারতের কথাসাহিত্যের এক সংকলন গ্রন্থ। এক যুগের বা দুই যুগের কথাসাহিত্য নয়। অতীতের বহু সহস্র বৎসর ধরে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সমাজ ও গোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষানুক্রমিকভাবে যেসকল রূপকথা ও উপকথা মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছিল, জাতি-স্মৃতির

পা পা II {পা পা পা । পা পা I ধা র্সা র্সা । র্রা র্রা I
ও গো হৃ দ য়ে য বে মো হ ন র বে

I র্রা -র্সা র্রর্মা । র্গা র্রা I -া -া -া । র্সনা র্সা I
বা জ্ বে০ বাঁ শি ০ ০ ০ ত খন্

I র্রা -র্পা র্মা । র্গা র্রা I র্সনা -া র্সা । না র্সা I
আ প্ নি সে ধে ফি০ র্ বে কেঁ দে

I ধা -র্সা ণা । ধা পা I -া -া (-ধণা । ধা পা)} I -া । না না I
প র্ বে ফাঁ সি ০ ০ ০০ ও গো ০ ত খন্

I না -া র্সা । না র্সা I না না র্সা । না র্সা I
ঘু চ্ বে ত্ব রা ঘু রি য়া ম রা

I না র্সা না । র্রর্সা -া I -ণা -া -া । ধা ণা I
হে থা হো থা০ ০ ০ ০ য়্ আ হা

I ধা ধা ণা । ধা ণা I ধা ধর্সা ণা । ধপা মগা I
আ জি সে আঁ খি ব নে০ র পা০ খি০

I মা ধা পা । ধা -া I মা -পা পা । পা -ধা II
ব নে পা লা য়্ হা য়্ রে হা য়্

মা মা II { মা মা -পা । পা পা I পা পা পণা । ধপা মগা I
চে য়ে দে খি স্ না রে হৃ দ য়০ দ্বা০ রে০

I মা ধা পা । ধা -া I -া -া -া । (না না I
কে আ সে যা ০ ০ ০ য়্ তো রা

I না না -র্সা । না র্সা I না না র্সা । না র্সা I
শু নি স্ কা নে বা র তা আ নে

I না র্সা না । র্রর্সা -া I -ণা -া -া । ধা পা)} I পা পা I
দ খি ন বা০ ০ ০ ০ য়্ চে য়ে আ জি

I { পা পা পা । পা পা I ধা র্সা র্সা । র্রা র্রা I
ফু লে র বা সে সু খে র হা সে

I র্রা র্সর্রা -র্গর্মা । র্রর্গা র্রা I -া -া -া । র্পা র্মা I
আ কু° °ল্ গা° নে ° ° ° চি র

I র্গা রা -া । র্স না র্সা I না না র্সা । না র্সা I
ব স ন্ ত যে তো মা রি খোঁ জে

I ধা ধর্সা ণা । ধা পা I (-া -া -ধণা । ধা পা)} I
এ সে° ছে প্রা ণে ° ° °° আ জি

I -া -া -া । না না I না না র্সা । না র্সা I
° ° ° তা রে বা হি রে খুঁ জি

I না না র্সা । না র্সা I না র্সা না । র্রর্সা -া I
ফি রি ছ বু ঝি পা গ ল প্রা° °

I -ণা -া -া । ধা ণা I ধা ধা ণা । -ধা ণা I
° ° য়্ তো মার্ চ প ল আঁ খি

I ধা ধর্সা ণা । ধপা মগা I মা ধা পা । ধা -া I
ব নে° র পা° খি° ব নে পা লা য়্

I মা -পা পা । পা -ধা II II
হা য়্ রে হা য়্

আলোচনা

'রাগতরঙ্গিণী'

বিশ্বভারতী পত্রিকার কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের সমালোচনা-প্রবন্ধে লেখক বলেছেন (পৃ ১৪৮) যে, তাঁর কাছে 'রাগতরঙ্গিণী' বই আছে। সে বই দরভাঙ্গা রাজপ্রেস থেকে প্রকাশিত তাঃ সম্বৎ ১৬৬১ দশহরা। আশ্চর্যের বিষয়, আমার কাছে দুখানি রাগতরঙ্গিণী আছে। তাও দরভাঙ্গা রাজপ্রেসে ছাপা, তবে ১৯৯১ সংবতে (অর্থাৎ ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে)। ১৬৬১ সংবৎ হবে ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দ, তখন কি এদেশে এবং দ্বারভাঙ্গায় মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল ?

অমিয়বাবু রাগতরঙ্গিণীর সম্পাদক পণ্ডিত বলদেব মিশ্রের দোহাই দিয়ে বলেছেন, "গ্রন্থকার লোচন শর্মা, খৃষ্টীয় পনের শতাব্দীর চতুর্থভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।" এ কথা ঠিক নয়। বলদেব মিশ্র লোচনের লেখা নৈষধ পুথির পুষ্পিকা ("উদ্যানগ্রাম বাস্তব একলাঙ্গল বংশীয়ঃ শ্রীলোচন শর্ম্মা শাকে ১৬০৩") উদ্ধৃত করে এই মন্তব্য করেছেন, "এহি সँ বুঝি পড়ৈত অছি জে শাকে ১৫০০ সৈক চতুর্থ ভাগ মেँ কবিবরক ভেল ছলৈন্হি। কারণ জে অন্যথা শাকে ১৬০৭ রাগতরঙ্গিণীক সদৃশ প্রৌঢ় নির্ম্মাণ কোন্ কয়লৈন্হি।" রাজা মহীনাথকে "মহিমানাথ" বলেও অমিয়বাবু ভুল করেছেন।

শ্রীসুকুমার সেন

চিত্রপরিচয়

শিল্পী পিকভ-কৃত বার্নার্ড শ'র যে চিত্রখানি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে উহা তাঁহার SIXTEEN SELF SKETCHES (Constable) গ্রন্থ হইতে প্রকাশক ও বার্নার্ড শ'র সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কদিগের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত। এই ছবিটি অবলম্বনে বার্নার্ড শ একটি কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন; উক্ত গ্রন্থ হইতে তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল :

On Shakespear's portrait Morris ruled
Ben Jonson was by it befooled;
For who of any judgment can
Accept what is not like a man
As like the superhuman bard
Who in our calling runs me hard?
Here is my portrait for your shelf,
More like me than I'm like myself.
Not from the life did Pikov draw me
(To tell the truth he never saw me)
Yet shewed what I would have you see
Of my brief immortality.

G. B. S.

শ্রীঅরবিন্দের যে দুইখানি চিত্র এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে তাহা প্রথমে প্রবাসী পত্রে (১৩১৫ ও ১৩১৬) প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়— তাহার আসন্ন পঞ্চাশদ্‌বর্ষ-পূর্তির উৎসব উপলক্ষ্যে ইহার আদি রূপ ও আদর্শ স্মরণ ও আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে।

সেদিন 'কী ক্ষীণ আরম্ভ, কত তুচ্ছ আয়োজন। সেদিন যে মূর্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারো কল্পনাতেও আসতে পারত না।' 'পাঁচ সাতটি ছেলেকে নিয়ে বিদ্যালয় আরম্ভ করেছিলুম। এটি আমার মনে ছিল যে, যারা আসবে তাদের সঙ্গে আমার দেনাপাওনার সম্পর্ক না থাকে— বিদ্যাদানকে ব্যবসায় করে তুললে শিষ্যদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে অন্তরায় ঘটে; ছাত্র মনে করে আমি কিছু দিচ্ছি তার পরিবর্তে কিছু পাচ্ছি। আমি প্রথম যখন আশ্রম আরম্ভ করেছিলুম তখন ছাত্রদের কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করি নি। আমি তখন একরূপ নিঃস্ব, তার পর প্রভূত ঋণ, তবুও কৃপণতা করি নি— তখনকার ছোটো বিদ্যালয়ের ভার সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করেছিলুম। সর্বদা সেটা সম্ভব হল না, বিদ্যালয়ের প্রকৃতি বদলালো— তবুও গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার আনন্দময় যোগরক্ষা করবার চেষ্টা করেছি। তার পর অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠেছে।'

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরবৎসরেই লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সৌজন্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে; 'রবীন্দ্রজীবনী'কার অনুমান করেন, 'ইহাই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম Constitution বা বিধি'। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—'শান্তিনিকেতনের কাজে ১৯০৮ সালে যোগ দিই। কী আদর্শ লইয়া রবীন্দ্রনাথ এই আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন এবং কিভাবে তিনি ইহার পরিচালনা চাহেন এখানে আসিয়া তাহা জানিতে চাহিলে তিনি একখানি সুদীর্ঘ পত্র আনিয়া আমাকে দেন। পত্রখানি কুড়িপৃষ্ঠাব্যাপী, এবং আগাগোড়া নিজের হাতে লেখা। তাহাতে ছাত্রদের প্রতিদিনকার কর্তব্যগুলি রীতিমত হিসাব করিয়া-করিয়া লেখা। তখন বিদ্যালয়ের একেবারে প্রাথমিক পর্ব। তখনই যে তাঁহার অন্তরে শিক্ষাজীবনের পরিপূর্ণ মূর্তিটি দেখা দিয়াছিল এই পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রখানি লেখা কবিগুরুর পত্নীবিয়োগের মাত্র দিনদশেক পূর্বে, খুব উদ্‌বেগের একটি সময়ে, পত্রশেষে তাহার উল্লেখও করিয়াছেন। তবু এই পত্রে যে সূক্ষ্ম বিচার ও খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি দেখি তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।']

বিনয়সম্ভাষণমেতৎ—

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহাতে আমি বড় আনন্দলাভ করিয়াছি। একান্তমনে কামনা করি ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ— ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে— সংযমের দ্বারা ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা শুচিতাদ্বারা একাগ্র নিষ্ঠাদ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্য্যব্রত।

ইহা ধর্ম্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিষই কেনাবেচার সামগ্রী বটে কিন্তু ধর্ম্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিষ দিতেন যাহা গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত দুরূহ ও দুর্লভ হইবে। এ সব কার্য্য ফরমাসমত চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায় গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এই জন্য যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্য্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়— অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে— তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষাস্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা,/ উপহাস, ঘৃণা— এমনকি, অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনো সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব— নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না— অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্তমাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভাল তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

ব্রহ্মচর্য্যব্রতে ছাত্রদিগকে কাঠিন্য অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে ··র পুত্র ··র সৌখীন দ্রব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে— সেটা দমন করিতে হইবে। বেশভূষা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ দারিদ্র্যকে যেন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও সৌখীনতা দূর করা চাই।

দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া লেখা স্নান আহার ও সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যায় বসনে ও শরীরে কোনপ্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যেখানে কোন ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড়কাচা সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে— ও ব্যবহার্য্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে। এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে অংশ যেন প্রত্যহ যথাসময়ে যথা নিয়মে পরিষ্কার তকতকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভাল হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে নির্দ্ধারিত করা চাই।

তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্ব্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোন মতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোন ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান্ হইতে হইবে। কোন অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষপ্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহারস্থানে হিন্দুআচারবিরুদ্ধ কোন অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।

আহ্নিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যে ভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম :— ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ— এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে— তখনকার মত মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি— আমি এখন কেবলমাত্র কোন বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও

শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্ত্তে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কি সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ— যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্য্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুণ আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি— সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তিদ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতারূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী এ দুইই একই শক্তির বিকাশ— ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সঙ্কীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের— ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে— এইজন্যই আর্য্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ —

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি বনস্পতিতে সর্ব্বত্র আছেন এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্ম্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সকলে সমস্বরে "ওঁ পিতানোঽসি" উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা, এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষ্যমাত্র কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়— সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়— সেইজন্যই ঐ মন্ত্রে আছে

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব!

"হে দেব, হে পিতঃ, আমাদের সমস্ত পাপ দূর কর, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর!"

ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকল প্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্ম্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্বলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—

যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।

বক্তৃতাদিতে অনেক সময়েই চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্মসাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদকসেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্ব্বল্যজনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এই সকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়— ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মত না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপস্থিতি-বশতঃ নূতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোন মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন ত ভালই হয়।

এক্ষণে, আপনার কার্য্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক্।

মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে* লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দ্দেশমতে বিদ্যালয়ের কার্য্যসম্পাদন করিতে থাকিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক আহার পড়া খেলা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্দ্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন— যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

বিদ্যালয়ের ভৃত্যনিয়োগ তাহাদের বেতননির্দ্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসরদান তাঁহাদের পরামর্শমত আপনি করিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্ত্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিষপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিষপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোন জিনিষ নষ্ট হইলে হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ তাহা জমাখরচ করিয়া লইবেন।

আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

---

* সুবোধচন্দ্র মজুমদার

শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্ত্তে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কি সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ— যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্য্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুণ আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি— সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তিদ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতারূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী এ দুইই একই শক্তির বিকাশ— ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সঙ্কীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের— ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে— এইজন্যই আর্য্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ —

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি বনস্পতিতে সর্ব্বত্র আছেন এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্ম্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সকলে সমস্বরে "ওঁ পিতানোঽসি" উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা, এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষ্যমাত্র কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়— সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়— সেইজন্যই ঐ মন্ত্রে আছে

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব!

"হে দেব, হে পিতঃ, আমাদের সমস্ত পাপ দূর কর, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর!"

ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকল প্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্ম্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্বলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—

যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

বক্তৃতাদিতে অনেক সময়েই চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্মসাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদকসেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্ব্বল্যজনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এই সকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়— ইহারা কোথাও সেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মত না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপস্থিতি-বশতঃ নূতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোন মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন ত ভালই হয়।

এক্ষণে, আপনার কার্য্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক্।

মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে* লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দ্দেশমতে বিদ্যালয়ের কার্য্যসম্পাদন করিতে থাকিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক আহার পড়া খেলা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্দ্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন— যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

বিদ্যালয়ের ভৃত্যনিয়োগ তাহাদের বেতননির্দ্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসরদান তাঁহাদের পরামর্শমত আপনি করিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্ত্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিষপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিষপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোন জিনিষ নষ্ট হইলে হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ তাহা জমাখরচ করিয়া লইবেন।

আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

---

* সুবোধচন্দ্র মজুমদার

তাহাদের জিনিষপত্রের পারিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভূষার নির্ম্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে রান্নাঘরে ও তাহার চতুর্দ্দিকে, পায়খানার কাছে কোনরূপ অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

গোশালায় গোরুমহিষ ও তাহাদের খাদ্যের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারীর বাগান আপনার হাতে। সেজন্য বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ, ও মধ্যে মধ্যে ঠিকালোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংস্রব প্রার্থনীয় নহে।[১] জিনিষপত্র ক্রয়, বাজার করা, ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে,— কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেয়।

ঠিকালোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে সর্দ্দারকে বা মালীদিগকে, রবীন্দ্রসিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিবেন। যে যে ঔষধের যখন প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।

শান্তিনিকেতন আশ্রমসম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে— বা সেখানকার ভৃত্যদের কোন দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্ব্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন।

মনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনের অতিথি অভ্যাগতগণ স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

অভিভাবকদের অনুমতিব্যতীত কোন ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না।

বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন— আপনি সমিতিতে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোন আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নির্দ্দিষ্টদিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোষ্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ চিঠি লেখা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

পোষ্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিদ্যালয় সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

কোন বিশেষ ছাত্রসম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্ত্তন করিবেন।

কোন ছাত্রের অভিভাবক কোন বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে অন্য ছাত্রদিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালায় গোরুমহিষ যে দুধ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোন বই পড়িতে লইলে তাহা যথা সময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

মাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটিবাটি প্রভৃতি জিনিষপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাবুর অনুমতি লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

উপস্থিতমত এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশঃ আবশ্যকমত ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইবে।

কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয় চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। স্বতউৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্ব্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোন অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্যকর্ম্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই জানি বিদ্যালয়ের কর্ম্ম যেমন আমার তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম্ম— এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।

আমি যে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকালপূর্ব্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্ম্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্বলাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিতভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা— ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য— অন্যকে সেজন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারো উপর চাপান যায় না— এবং এসকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্ব্বাপেক্ষা হেয়।

আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই— বর্ত্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি— সেইজন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্ত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্ম্মের যথেষ্ট অসঙ্গতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্ত্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধাবিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন তাঁহার উৎসাহ আশা সর্ব্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারো কাছে বেশি কিছু দাবী করি না, সর্ব্বদা আমার উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপূর্ব্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না— কালের উপর, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্য্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায় কতক লজ্জায়, কতক ভাবাবেগে, কতক অনুকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

আমি আশা করিয়া আছি, যে, অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত, অবিচার, অধৈর্য্য, অল্পকারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটখাট অভ্যাসদোষ, এ সমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে— এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্য্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত কার্য্যে যথার্থ গৌরব আছে, অবমান নাই এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সযত্ন ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষরূপে অভ্যাস করানো হয়। বিদ্যালয়ের নিকট কোন আগন্তুক উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শেখে— ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের দ্বারা যত অল্প কাজ করানো যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনি যদি সঙ্গত ও সুবিধাজনক মনে

করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভাল হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখী মাছ ও ছোট জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখী খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্য্যের সহিত মুক্ত পাখীদিগকে বশ করানই ভাল। শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালীদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরি গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা এ সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোন বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোন ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেষণ করে। প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়— যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে— নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমত জল দিয়াছে কিনা পর্য্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনপ্রকার সঙ্কোচ অনুভব করিবে না।

ছাত্ররা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেষণ করিলে ভাল হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেষক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্ত্তব্য হইবে।

রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভাল হয়।

সম্প্রতি নানা উদ্বেগের মধ্যে আছি এজন্য সকল কথা ভালরূপ চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি সেখানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে তখন অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

আপনার প্রতি আমার কোন আদেশ নির্দ্দেশ নাই আপনি সমবেদনার দ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণকামনার দ্বারা কর্ত্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং

যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

ইতি ২৭শে কার্ত্তিক ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রখানি কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়কে লিখিত। 'স্মৃতি' গ্রন্থে মুদ্রিত (পৃ ১১), শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত, সমসাময়িক একটি পত্রে এই চিঠিখানির উল্লেখ আছে—

'কুঞ্জবাবু শীঘ্রই বোলপুরে যাইবেন। আশা করিতেছি তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয়ে সাহায্য পাইবেন। অধ্যাপনা কার্যেও তিনি আপনাদের সহায় হইতে পারিবেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তিনি

এই কার্যে ব্রতী হইতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে যত লোকের নিকট হইতে সন্ধান লইয়াছি সকলেই একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

'বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত করিয়া ইহাকে লিখিয়াছিলাম। এই লেখা আপনারাও পড়িয়া দেখিবেন— যাহাতে তদনুসারে ইনি চলিতে পারেন আপনারা ইহাকে সেইরূপ সাহায্য করিতে পারেন।

'বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার আমি আপনাদের তিন জনের উপর দিলাম— আপনি, জগদানন্দ ও সুবোধ। এই অধ্যক্ষসভার সভাপতি আপনি ও কার্যসম্পাদক কুঞ্জবাবু। হিসাবপত্র তিনি আপনাদের দ্বারা পাশ করাইয়া লইবেন এবং সকল কাজেই আপনাদের নির্দেশমত চলিবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছি আপনারা তাহা দেখিয়া লইবেন।'

১৩১০ সালের ২৬ জ্যৈষ্ঠ তারিখে আলমোড়া হইতে লিখিত একটি পত্রে কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়ের পরিচয়-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

'বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাভার একজন কড়া লোকের হাতে না দিলে ক্রমে বিপদ আসন্ন হইতে পারে। ইহাই অনুভব করিয়া কুঞ্জবাবুর হস্তে ভার সমর্পণ করিয়াছি। তিনি ভাবুক লোক নহেন কাজের লোক — সুতরাং ভাবের দিকে বেশি ঝোঁক না দিয়া তিনি কাজের দিকে কড়াক্কড়ী করেন— তাহাতে তিনি লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়েন কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের পক্ষে এরূপ লোকের প্রয়োজন অনুভব করি। আমার সঙ্গেও তাঁহার স্বভাবের ঐক্য নাই— থাকিলে আনন্দ পাইতাম কাজ পাইতাম না।'

পত্রখানি যে কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহা অনুমান করেন, তিনিই বর্তমান মন্তব্যে সংকলিত পত্র দুইখানির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

---

১ বাংলা ১২৬৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের জমির পাট্টা লইয়াছিলেন ; ১২৯৪ সালে 'নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে' ও তাহার অনুকূল কার্যসম্পাদনার্থে মহর্ষি এই সম্পত্তি ট্রাস্টীদিগের হাতে অর্পণ করেন ও এই আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থে আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া দেন। 'এই ট্রষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারিবেন।' পরে ১৩০৮ সালে মহর্ষির অনুমতিক্রমে তাঁহার ধর্মদীক্ষাবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন ; এ ক্ষেত্রে 'আশ্রম' বলিতে উক্ত ট্রষ্ট অনুযায়ী পূর্বাগত ব্যবস্থা, ও 'বিদ্যালয়' বলিতে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম বুঝিতে হইবে। পরে আশ্রম ও বিদ্যালয় সাধারণত সমার্থক হইয়াছে।— সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা

মহারাষ্ট্রে ধর্মসংস্কার ও সমাজচেতনা

মুসলমান-বিজয় হইতে ছত্রপতি শিবাজী -যুগ পর্যন্ত

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

মহারাষ্ট্রদেশের মধ্যযুগীয় সামাজিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গরূপে আজ পর্যন্ত সংকলিত হয় নাই। মহামতি রানাডে, আচার্য যদুনাথ, রাওবাহাদুর সরদেশাই প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পটভূমি রচনায় প্রসঙ্গক্রমে প্রাক্-শিবাজীকালীন সমাজ-সংহতি এবং জাতীয় জাগরণের উপর ধর্মের প্রভাব, তথা ধর্মসংস্কারক 'সন্ত'গণের মতবাদ সংক্ষেপে সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্যে রাষ্ট্রই মুখ্য, সমাজ এবং ধর্ম গৌণ।

রাষ্ট্র-প্রধান ইতিহাসে যুদ্ধ, কূটনীতি ও শাসনই উপরে ভাসিয়া থাকে, বাদবাকী তলাইয়া যায়। এইজন্য সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ সম্প্রতি ইতিহাসের উপর কিঞ্চিৎ বিরূপ হইয়াছেন, কেননা পূর্বতন ইতিহাসের বিজিগীষা, রণহুংকার, রক্তগঙ্গা, শাঠ্যের ঘাত-প্রতিঘাত, পশুশক্তির স্তুতি, মানবতার অপমান মানুষকে আজ শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। আবহমানকাল হইতে ধর্মই সমাজকে ধারণ করিয়া আছে; অন্যদিক দিয়া বিচার করিলে, রাষ্ট্রই সমাজ ও ধর্মের রক্ষক এবং পরিপোষক। রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হইলে ধর্ম ও সমাজ মৃতপ্রায় হয়—স্থূলদৃষ্টিতে রাষ্ট্রই প্রধান; অথচ রাষ্ট্রের শক্তির মূল উৎস হইল সমাজ। সমাজের রুচি এবং প্রয়োজন ধর্ম ও রাষ্ট্রকে রূপ প্রদান করিয়া থাকে। আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞান ইতিহাসকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া কালোপযোগী করিবার উপদেশ দিতেছেন; এইরূপ ইতিহাস হইবে শাশ্বত মানবের ইতিহাস—দেশ, জাতি কিংবা ধর্মের ইতিহাস নহে। ইহা অতি দুরূহ কার্য, বিরাট প্রতিভা এবং বহুবৎসরের সাধন-সাপেক্ষ। আমাদের পক্ষে ইহা আদা-ব্যাপারীর জাহাজের খবরের জন্য ব্যস্ততার মতই বটে।

মহারাষ্ট্রের সামাজিক ইতিহাসের বহুমূল্য উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন রাজবাড়ে এবং সরদেশাই প্রমুখ মারাঠা ঐতিহাসিকগণ। পেশবাকালীন ধর্ম ও সমাজের জন্য পেশবা-দপ্তর, পেশবা ডায়েরী একেবারে কাঁচামাল।

এই প্রবন্ধে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অধিকারের সময় হইতে ছত্রপতি শিবাজীর 'স্বরাজ' স্থাপন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় ধর্ম ও সমাজের বিবর্তন এবং ধর্মসংস্কারের প্রভাব গৌণভাবে আলোচিত হইতেছে।

২

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত দিল্লীর তুর্কী সাম্রাজ্য আর্যাবর্তেই সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তরভারতে তখন বিধর্মীর অসি ও ধর্মোন্মাদনার তাণ্ডবলীলা; হিন্দুস্বাধীনতা বিন্ধ্য-আরাবলীর গিরিশৃঙ্গ, গভীর অরণ্যানী, রাজপুতানার মরু-প্রান্তর, লাট-গুর্জর ভূমির সমুদ্র-সৈকতে আত্মগোপন করিয়া

ভবিতব্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বিরাট সমাজ-দেহ নর্মদার উত্তরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অপরাধ উদাসীন অন্ধ অথচ জীবনীশক্তির অভাব নাই। হর্ষবর্ধন অপেক্ষা দ্বিগুণ দুর্ধর্ষ শত্রু দাক্ষিণাত্যের দুয়ারে হানা দিবার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু বীর দ্বিতীয়-পুলকেশী নাই, উহাকে রক্ষা করিবে কে? ত্রি-কলিঙ্গের কাকতীয় বংশ, মহারাষ্ট্রের যাদবকুল, দ্বারসমুদ্রের হৈহয়, কুমারিকার পাণ্ড্য ক্ষুদ্র বিজিগীষা এবং আত্ম-কলহে লিপ্ত; সামরিক শক্তি আছে, রাজনৈতিক দৃষ্টি-প্রসার নাই। দক্ষিণাপথের দ্বার-প্রতীহার মহারাষ্ট্র তখন উত্তরদিকে সতর্কদৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া বিপরীতদিকে চাহিয়াই যেন দক্ষিণসমুদ্রের ঢেউ গণিতেছিল। দেবগিরিরাজ রামচন্দ্র দ্বিতীয়-পুলকেশীর ভূমিকায় নামিয়া প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্য সমূহকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিলেন। যাদবংশের চাণক্য-প্রতিম বিচক্ষণ মন্ত্রী সুপণ্ডিত হেমাদ্রি শেষ বয়সে অর্থ ও কাম-কে উপেক্ষা করিয়া ধর্মসংস্কারে মনোযোগী হইলেন। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি পণ্ডিতগণের সাহায্যে 'চতুর্বর্গ চিন্তামণি' নামক বিরাট গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন। তৎকালে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে হেমাদ্রি শংকরাচার্যের ন্যায় অভ্রান্ত শাস্ত্রদ্রষ্টারূপে পুজিত ধর্মসংস্কারক। এই সময়ে তাঁহার প্রতিস্পর্ধী হইয়া আবির্ভূত হইলেন 'মানভব' [সংস্কৃত মহানুভব ?] সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সাধু চক্রধর। চক্রধর আচারমূলক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের প্রথম বিদ্রোহী। সমাজের মধ্য ও নিম্নস্তর সর্বকালে বিদ্রোহীর কর্মক্ষেত্র; মহারাষ্ট্রেও উহাই হইল! চক্রধর শংকরের 'অদ্বৈতবাদ' খণ্ডন করিয়া দ্বৈতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপাস্য-দেবতা শংকরের 'বিষ্ণু' নহেন—ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই পরম ভাগবত ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এবং বেদের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিলেন। বেদের অভ্রান্ততা, বহুদেবতার দেবত্ব, মূর্তিপূজায় ধর্মলাভ, অবতারবাদে বিশ্বাস এই 'মানভব' সম্প্রদায়ের তর্কের আঘাত সহ্য করিতে পারিল না; চাতুর্বর্ণ্য ও জাতিভেদমূলক সমাজব্যবস্থা কাঁপিয়া উঠিল। চক্রধর উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেন মানুষমাত্রই স্রষ্টার দৃষ্টিতে সমান, মানুষের মধ্যে উচ্চবর্ণ হীনবর্ণ নাই, কেহ অপবিত্র অস্পৃশ্য নহে। 'মানভব' সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ কথ্য মারাঠীভাষায় ধর্মশিক্ষা দিতেন। ইঁহারা মারাঠী গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টা। নিরামিষ-ভোজন এবং ইন্দ্রিয়-সংযম 'মানভব'ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসে অধিকার আছে; উপাসনার জন্য সাধু ও গৃহস্থগণ একত্র সমবেত হয়। 'মানভব' সন্ন্যাসীগণ বৌদ্ধদিগের মত পরিব্রজ্যা এবং প্রচারে আগ্রহশীল; সমস্ত ভারতবর্ষ ছিল ইঁহাদের প্রচারের ক্ষেত্র।

ধর্ম ও সমাজে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ চক্রধর কর্তৃক এই অনর্থসৃষ্টি হেমাদ্রি সহ্য করিলেন না; তাঁহার পশ্চাতে ছিল রাজশক্তি। চক্রধর হেমাদ্রির ভয়ে আত্মগোপন করিলেন। হেমাদ্রির চরগণ সন্ধান পাইয়া চক্রধরকে হত্যা করিল (১২৭৬ খ্রীস্টাব্দ) বটে; কিন্তু 'মানভব' ধর্ম আজও মহারাষ্ট্রে বাঁচিয়া আছে। রাজা রামচন্দ্রের অন্তঃপুরবাসিনীগণ চক্রধরের কৃষ্ণপ্রেমে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় দুর্বলচেতা রামচন্দ্র বৃদ্ধ মন্ত্রীকে অপসারিত এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। হেমাদ্রির স্মৃতিবহন করিয়া মহারাষ্ট্রে আজও বাঁচিয়া আছে গরীব মারাঠা এবং তাহার প্রধান খাদ্য বাজ্‌রা—যাহা হেমাদ্রি উত্তরভারত হইতে দক্ষিণে লইয়া গিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রে এই ধর্ম ও সমাজ-বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে ইসলামের প্রচণ্ড আঘাতে যাদবরাজ্য বিধ্বস্ত হইল।

৩

১২৯৪ খ্রীস্টাব্দ অতীত না হইতেই দাক্ষিণাত্য ইসলামের রণহুংকারে কাঁপিয়া উঠে। ছলপরায়ণ তুর্কী অশ্বারোহী কখন নর্মদা অতিক্রম করিল—আলাউদ্দীন খিলজী দ্বারদেশে উপস্থিত হইবার পূর্বে এই সংবাদ রাজা রামচন্দ্র জানিতে পারেন নাই; অথচ, বিন্ধ্যের অপর পারে থাকিতেই আলাউদ্দীন খবর লইয়াছিলেন দেবগিরি অরক্ষিত, কুমার শংকরদেবের অধীনে যাদববাহিনী বহু দূরে দক্ষিণে যুদ্ধে ব্যাপৃত। মূর্খ অন্তত ঠেকিয়া শিখে; কিন্তু যেই জাতি গ্রীক্-আক্রমণ হইতে দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত ঠেকিয়া এবং ঠকিয়াও সতর্ক হইতে পারে নাই তাহাদের ভাগ্যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই বিধিলিপি। ইহলৌকিক ব্যাপারে eternal vigilance বা নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতা মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দুর মধ্যে কেহ দেখে নাই।

যাহা হউক, রাজা রামচন্দ্র দুর্ভেদ্য দেবগিরি দুর্গে কিছুদিন আত্মরক্ষা করিয়া প্রতিবেশী হিন্দুরাজগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। দেবগিরির উপস্থিত সর্বনাশ দেখিয়া তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজের ভাবী পৌষমাসের আশায় বরং উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আসন্ন পরাজয় ও ঘনায়িত মৃত্যুর ছায়ায় রাজপুতের শংকাহীন নির্মম কঠোরতা মারাঠার ছিল না; জোহরে অগ্নিশিখা আকাশে উঠিল না, দেবগিরির দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া কোনো পুরুষ বীরগতি কামনা করিল না। দুর্গের বাহিরে শত্রুর উপর প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর কুমার শংকরদেব আর যুদ্ধ করিলেন না; মহারাষ্ট্র-স্বাধীনতার পরমায়ু ফুরাইয়া আসিল। আলাউদ্দীনের রাজ্যারোহনের পর অর্ধশতাব্দীকাল ইসলামের সাম্রাজ্য-লিপ্সা দক্ষিণাত্যের উপর দিয়া ঘূর্ণীবাত্যার মত বহিয়া গেল, কোনো স্বাধীন হিন্দুরাজ্য অবশিষ্ট রহিল না, ভগ্নমন্দির ও চূর্ণীকৃত পাষাণ-দেবতা হিন্দুর ধর্মকে উপহাস করিতে লাগিল।

৪

দাক্ষিণাত্যের এই সংকটমুহূর্তে মাধব ও সায়নাচার্যের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের বুদ্ধিবল এবং হরিহর বুক্কারায়ের শৌর্যে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতীর হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ভূভাগ ইসলামের কবলমুক্ত হইল। বিজয়নগর প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত প্রথমে বাহামনী এবং পরে আদিলশাহী প্রমুখ মুসলমান রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল; অথচ মহারাষ্ট্র ও তেলিঙ্গনার হিন্দুগণ অসার ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল, ইহার কারণ কি? প্রভূত শক্তির অধিকারী হইয়াও কৃষ্ণদেব রায়ের মত সম্রাট্ কেনই বা দাক্ষিণাত্যের সমস্ত হিন্দুগণকে মুক্ত করিতে পারিলেন না? ইহার মূলগত কারণ হিন্দুধর্ম এবং সমাজের সহিত ইসলাম ও মুসলমান সমাজের মৌলিক পার্থক্য। জাতি, বর্ণ এবং শ্রেণীর দ্বারা বহুধা-খণ্ডিত সমাজ, প্রচার বিমুখ ক্ষীয়মান ধর্ম, রাজতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় চেতনাশূন্য উদাসীন জনসাধারণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইলেও সর্ববিষয়ে সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও ধর্ম, একনায়ক শাসিত সাধারণতন্ত্র, স্বধর্মপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সদা-জাগ্রত আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ইসলামের অভ্যুদয়কাল হইতে ফরাসী-বিপ্লব পর্যন্ত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস ইহার প্রমাণ। ইসলামে মানুষের কিছুই নাই,—রাষ্ট্র, সৈন্য, রাজকোষ সমস্তই আল্লার, খোদা সকল মুসলমানকে সমান অধিকার দিয়াছেন, দুনিয়ার লোভনীয় বস্তু ও ধনদৌলত 'বিশ্বাসী'র ভোগের জন্যই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইসলাম-প্রচার

এবং কাফেরের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য,—সে কালের মোল্লা-নিয়ন্ত্রিত ইসলামের ইহাই ছিল শিক্ষা; রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ক্ষেত্র ও প্রয়োজন অনুসারে উহা ভারতবর্ষে কিঞ্চিৎ উদার হইয়াছিল মাত্র।

শতবর্ষব্যাপী বিজয়নগর-বাহামনী সংঘর্ষ উভয় রাজ্যের প্রত্যন্তবাসী হিন্দুগণের সর্বনাশ ঘটাইয়াছিল। হিন্দু হিন্দুকে লুট করিবে না—এমন কোনো বিধান হিন্দুশাস্ত্রে নাই; সুতরাং কৃষ্ণদেবরায় হইতে শিবাজী-বাজীরাও পর্যন্ত কোনো হিন্দু বিজেতা মুসলমান-রাজ্যের ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য হিন্দুকে রেহাই দেন নাই। বিজয়নগর-সম্রাটগণ রাজনীতির এই স্থূল সত্যটা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অংশে হিন্দু স্বাধীন ও সংহতিবদ্ধ না হইলে একমাত্র হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের পতন সুনিশ্চিত। বাহামনী এবং পরবর্তী শাহী সুলতানগণ তাঁহাদের অধীন হিন্দুগণের কর্মকুশলতা ও বাহুবল বিজয়নগরের বিরুদ্ধে পূর্ণ-ভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। হিন্দুর মজ্জাগত 'স্বামীভক্তি' বা নিমকহালালী কালক্রমে দোষ এবং দুর্বলতায় পরিণত হইয়াছিল। ভীষ্ম পিতামহ অন্নদাতা দুর্যোধন কর্তৃক দ্রৌপদীর অপমান সহ্য করিয়াছিলেন, বিরাটরাজের গোধন হরণ করিতে গিয়াছিলেন, একমাত্র দুর্যোধন প্রদত্ত 'গ্রাস' বা বৃত্তির প্রতিদানে। এই ন্যায়-অন্যায় স্বার্থ-পরার্থ-বিচারশূন্য, ভৃতিভুক্ মনোবৃত্তি হিন্দু স্বাধীনতা ও ধর্মের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুসলমান সুলতানগণ হিন্দুকে কখনও কখনও 'হাতে' মারিতেন, কিন্তু 'ভাতে' মারিতেন না; এই জন্যই অধীন হিন্দু প্রজাগণ 'পেটে খাইলে পিঠে সয়' এই আপদ্ধর্ম মানিয়া লইয়া বিশ্বস্তভাবে মুসলমান-সরকারে চাকুরী করিত, হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত, অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিত। পরবর্তী যুগে ধর্মে পুনরভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া এই জাড্যগ্রস্ত হিন্দু-সমাজে নূতন চিন্তাধারা, কর্মপ্রেরণা আসিয়াছিল।

আমরা সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের সঞ্জীবনীমন্ত্রদাতা 'সন্ত'গণের ধর্মমত এবং সমাজের উপর উহার প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিব।

৫

মহারাষ্ট্রদেশ বাহামনী সাম্রাজ্যের পশ্চিম 'তরফ' বা সুবার অন্তর্গত ছিল; পরে উহা বিজাপুরের আদিলশাহী ও আহ্মদনগরের নিজামশাহী রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। দেবগিরির যাদববংশের পতন এবং ছত্রপতি শিবাজীর আবির্ভাবের মধ্যবর্তী দুইশত পঞ্চাশ বৎসর কালে মারাঠা জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য কোনো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে নাই; কিন্তু এই সময়ে মহারাষ্ট্রে মারাঠী লোক-সাহিত্য এবং ধর্মের নবজাগরণ সমাজের মনকে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করিতেছিল, নেতা তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।

ঐতিহাসিক সরদেশাই লিখিয়াছেন, মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন সন্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষা এবং চিন্তাধারার তিনটি বিশিষ্ট কাল ও মতবাদ দৃষ্ট হয়: জ্ঞানেশ্বর-নামদেব যুগ (ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী), একনাথ-তুকারাম যুগ (পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী), এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিবাজীর গুরু রামদাসের যুগ। এই সময়ে সমাজের নিম্নস্তরে কুম্ভকার মেথর প্রভৃতি শ্রেণী হইতেও সর্বজনপূজিত একাধিক মহাপুরুষের

আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের মোটামুটি বিবরণ সরদেশাই তাঁহার 'মারাঠি-রিয়াসৎ' গ্রন্থের প্রথমভাগে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

উক্ত তিনটি যুগপরম্পরার মধ্যে একটি যোগসূত্র রহিয়াছে। এই যোগসূত্র হইল নাম, ভক্তি, সদাচার এবং কীর্তনের মাহাত্ম্য। এই ভক্তির বন্যা পাণ্ডারপুরের 'বিঠোবা' অর্থাৎ বিষ্ণুকে কেন্দ্র করিয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানেশ্বর-নামদেবের উপর হেমাদ্রি-চক্রধরের প্রভাব বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু উভয়ের মতবাদ এবং শিক্ষার মধ্যে পূর্ববর্তীগণের আত্মঘাতী বিরোধ দেখা যায় না। মহারাষ্ট্র তথা সমগ্র ভারতভূমি শ্রীমদ্‌ভাগবদ্গীতাকেই আশ্রয় করিয়া যুগে যুগে শান্তি এবং কর্মে প্রেরণা পাইয়াছে। গীতার যেই প্রয়োজন ও প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া জ্ঞানদেব গীতার ভাষ্য 'জ্ঞানেশ্বরী' লিখিয়াছিলেন, স্বাধীনতার পূজারী মহামতি তিলক এবং মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ-কৃত ভাষ্যদ্বয়ের মধ্যেও ইতিহাস অনুরূপ প্রয়োজন দেখিতে পায়। জ্ঞানদেবের শিক্ষার মধ্যে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি তিনের সমন্বয় ছিল। নামদেব জ্ঞান ও কর্মের দুরূহ মার্গ ছাড়িয়া একমাত্র ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার উপাস্য দেবতা নাম-রূপ-জ্ঞানের অতীত স্বয়ং 'হরি'। তাঁহার সময় হইতে বৈষ্ণবগণ মহারাষ্ট্রদেশে 'হরিদাস' নামে পরিচিত হইয়া উঠিল। ইসলামের শুদ্ধ একেশ্বরবাদ এবং মূর্তি-পূজার প্রতি বিদ্বেষ মুসলমান রাজত্বে হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করে নাই, এমন কথা বলা যায় না। নামদেব মূর্তিপূজার প্রকাশ্য বিরোধী না হইলেও তিনি 'রূপ' অপেক্ষা 'নাম'-কে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই নাম-মাহাত্ম্য উত্তরভারতে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রের বিঠোবা, শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণ, রামানন্দ-কবীরের রামায়ণ-নিরপেক্ষ রাম এবং গুরু নানকের নিরাকার অলখ্-নিরঞ্জন— ইঁহাদের অড়ালে রহিয়াছেন নামদেব-প্রচারিত ভক্তির দেবতা 'হরি'।

পরবর্তী যুগে মহারাষ্ট্রের ধর্মজাগৃতি, ভাষা ও সমাজের উপর ইসলামের প্রভাব সুপরিস্ফুট। জ্ঞানদেবের গ্রন্থসমূহে বেশি আরবী-ফারশি শব্দের প্রয়োগ নাই; কিন্তু পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যে মারাঠী ভাষায় আরবী-ফারশি শব্দ প্রচুর দেখা যায়। একনাথ-এর ভাষা ও ভাবে মুসলমান-প্রভাব সুস্পষ্ট। পঞ্চদশ শতাব্দীর ফারশি-মিশ্রিত 'প্রাচীন মারাঠী' গদ্যরচনাশৈলী প্রায় তিনশত বৎসর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ছত্রপতি শিবাজীর সময়ে মারাঠী ভাষাকে ম্লেচ্ছ-দোষ মুক্ত করিয়া সংস্কৃত-মূলক করিবার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু মারাঠা সাম্রাজ্য উত্তরভারতে বিস্তারলাভ করিবার দরুণ এই 'শুদ্ধি'প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। একনাথ পাষাণ-দেবতার উপাসনাকে গলায় পাথর বাঁধিয়া সাঁতার দেওয়ার মত মূর্খতা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ভাবে ও ভাষায় একনাথের প্রচারকার্য ছিল কবীরদাসজীর মত আক্রমণাত্মক। একনাথের মূর্তিবিদ্বেষ মহারাষ্ট্রসমাজ গ্রহণ করে নাই; কিন্তু তাঁহার কীর্তনের তরঙ্গে জাতির মন হইতে অস্পৃশ্যতার মিথ্যা সংস্কার ও শুষ্ক আচারের বালুকাস্তূপ ভাসাইয়া লইয়া গেল। তুকারামের শিক্ষা অধিকতর গঠনমূলক। তুকারামের শিক্ষায় এক উদার পরমতসহিষ্ণু হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত সন্তগণ মহারাষ্ট্রে আধ্যাত্মিক-চেতনা স্বধর্মপ্রীতি ও সদাচার পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। শ্রেণী ও বর্ণের মধ্যে মিথ্যা সংস্কার ও সনাতনী আচারের বাধা এবং অস্পৃশ্যতাব্যাধি ইঁহাদের শিক্ষায় বহুলাংশে দূর হইয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর এবং ষোড়শের প্রথমার্ধে উত্তর তথা দক্ষিণভারতে ভক্তি ও কীর্তনের ভরা জোয়ার। এই যুগের সমাজ এবং হিন্দুর রাষ্ট্রীয় চেতনা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে একনাথের হরি-কীর্তন এবং মহাপ্রভুর

নাম-সংকীর্তনের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। নির্জনে একচিত্ত হইয়া গায়ত্রী কিংবা মালাজপ সাধকেরই চতুর্বর্গ সাধনের পন্থা; কীর্তন সমষ্টিগত উপাসনা। আবালবৃদ্ধবনিতা আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল স্ত্রী-শূদ্র-অজ্ঞ সকলেরই চিত্ত কীর্তনের ধ্বনিতে এক সুরে বাজিয়া উঠে। প্রতি কীর্তন-প্রাঙ্গণ একটি ক্ষুদ্র শ্রীক্ষেত্র, উহাতে উচ্ছিষ্ট নাই, স্পর্শদোষ নাই, উচ্চ নীচ নাই; অন্তত সাময়িকভাবে উহা মহামানবের মিলনায়তন। ইতিহাসের দৃষ্টিতে সমাজ-সংস্কার ও জাতিগঠনের পক্ষে কীর্তন, নমাজ বা সমবেত প্রার্থনার তুল্য শক্তি আর নাই। কীর্তনের দ্বারা mass attitude সৃষ্টি হয়, ব্যষ্টি সমষ্টির শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়। ইহা না হইলে সমাজের সংহতি-শক্তিলাভ হয় না, কোনো 'বাণী' কার্যকরী হয় না, ধর্ম মুমূর্ষু সমাজে প্রাণের স্পন্দন আনিতে পারে না। সেকালের নাম-কীর্তন এবং এই যুগের রাজপথে শোভাযাত্রা ও সমবেত চীৎকারের পশ্চাতে রহিয়াছে একই মনস্তত্ত্ব, অর্থাৎ mass attitude সৃষ্টি। 'সন্ত'গণ ধর্মে যে mass attitude সৃষ্টি করেন সুচতুর শিবাজী উহার মোড় ফিরাইয়া রাজনীতির খাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় সৃষ্টি হইল মারাঠা জাতি (Nation), মহারাষ্ট্রের স্বরাজ্য। শিবাজী এই mass attitudeএর মোড় একাকী কিংবা হঠাৎ ফিরাইতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্রে ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে মারাঠী লোকগীতিকার সৃষ্টি হইয়াছিল, যে গান মারাঠা 'গন্ধালী' বা চারণ আজও গাহিয়া বেড়ায়, উহার সুরের মধ্যে ঝংকৃত হইত জাতির মর্মবেদনা, নূতন অবতারের আগমন প্রতীক্ষায় অসহিষ্ণুতা। Mass attitude সৃষ্টি করিতে পারিলে mass action সহজ হইয়া পড়ে। মহারাষ্ট্রের ধর্ম ও সাহিত্য শিবাজীর জন্য mass actionএর ক্ষেত্রে প্রস্তুত করিয়াছিল। এই জন্যই ছত্রপতি শিবাজী পূর্ববর্তী যুগের সৃষ্টি এবং পরবর্তী যুগের স্রষ্টাও বটেন।

৬

মারাঠা সন্তগণের শিক্ষা স্বরাজ্য-স্থাপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল; কিংবা তাঁহারা যুদ্ধপ্রবণ মারাঠা জাতিকে বৈষ্ণবী দীনতা, ভোগের অসারতা নিবৃত্তি-মার্গে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইবার উপদেশ দিয়া দুর্বল, অপমান-সহিষ্ণু, কর্মবিমুখ করিয়াছিলেন—এই মতভেদ অধুনা দেখা দিয়াছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এইপ্রকার শাক্ত-বৈষ্ণব বিরোধ নূতন নহে। ইহার একটা মীমাংসা প্রয়োজন। বৌদ্ধ জৈন ও বৈষ্ণব ধর্মের অহিংসাকে একদল ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের কারণ বলিয়া মনে করেন— স্থূলদৃষ্টিতে ইহা সত্য বলিয়াও মনে হয়; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় প্রকৃত প্রস্তাবে জাতির দোষ-গুণ কোনো ধর্মের উপর আরোপ করা যায় না। আধ্যাত্মিক ও তত্ত্ব হিসাবে সমস্ত ধর্মই মূলত এক, এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; তবে সাধনার পন্থা বিভিন্ন এবং উহা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। বিশুদ্ধ জলের মত ধর্মেরও কোনো বর্ণ নাই। মানবগোষ্ঠীর রঙিন পাত্রে ঢালা হইলেই ধর্ম রূপ-ভ্রান্তি ঘটাইয়া থাকে। খ্রীস্টধর্ম ইসলাম শিখধর্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম আসলে এক; যথা, খ্রীস্টানের justification by faith; ইমাম 'রাজী'র প্রতি যুক্তিনিরপেক্ষ উগ্রবিশ্বাসী মনসুর-বিন্-হাল্লাজের telepathic বাণী—'Say unto the Devil that God exists, and exists without proof'; গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপদেশ— 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'। গুরু নানকের ধর্মও বিশ্বাস এবং ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উল্লিখিত ধর্মচতুষ্টয়ের আর-একটি ভিত্তি—self

surrender—'সর্বং শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণমস্তু'। স্বাধীন যুদ্ধপ্রিয় ইহুদী জাতির মধ্যে আসিয়াছিল তেরীত (Old Testament)। উহার বহু শতাব্দী পরে পরাধীন ও নির্জিত ইহুদীর নিকট যীশু লইয়া আসিলেন ইঞ্জিলের (New Testament) বৈষ্ণবী দীনতা। খ্রীস্টধর্মের 'দশশীল' বর্বর টিউটন-গথ-হূনকে পরাজিত করিয়া পরবর্তী যুগে ইয়োরোপে কি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, সকলেই জানেন। কুলাভিমানী, রক্ত-পিপাসু লুণ্ঠনপ্রিয় আরব-যাযাবরের মধ্যে ইসলামের যেই রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল; উহা Old Testamentএর মত সবল, বিজীগিষু, কুলতন্ত্রাশ্রয়ী ধর্ম। হজরত মহম্মদ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিলে তিনিও একজন মহাপ্রভু হইতেন, কারণ বাঙালী আরব-বেদুইন ছিল না। বাঙালী বৈষ্ণবকে একটা অকালী শিখ করিবার সাধ্য গুরু গোবিন্দ সিংহেরও ছিল কি না সন্দেহ। ধর্মের ব্যাপারে বীজ অপেক্ষা ক্ষেত্রই প্রধান। দেশের মাটি জাতির মনের গড়ন (mental make-up), সভ্যতার স্তর, সমাজব্যবস্থার ধারা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। রাজপুত বৈষ্ণব হইলেও শৌর্যহীন হয় না; মীরাবাঈর ভ্রাতুষ্পুত্র চিতোর-রক্ষক রাঠোর জয়মল 'রণছোড়জী'র মত জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন নাই। ইহা জাতির ধর্ম, বৈষ্ণবের নহে। যাহা হউক, তুকারাম ইত্যাদির শান্তি ও মৈত্রীর বাণী মারাঠা সমাজকে দুর্বল কিংবা যুদ্ধবিমুখ করিবার লক্ষণ আমরা সমসাময়িক মারাঠা ইতিহাসে দেখিতে পাই না। ভূতিভুক্‌ সাহসী যোদ্ধার অভাব মহারাষ্ট্রে কখনও হয় নাই। রামদাসের আবির্ভাব ও রামদাস-শিবাজী সম্বন্ধীয় বহুবিধ অলীক কিম্বদন্তী পূর্ববর্তী সন্তগণের মাহাত্ম্যকে বর্তমানে চাপা দিতে বসিয়াছে। ইতিহাসের শিবাজী, মারাঠী চারণগীতিকা কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'প্রতিনিধি' ঠিক নহেন। স্বরাজ্যস্থাপনা শিবাজীর মৌলিক-কল্পনা, গুরু রামদাসের প্রেরণা নহে।

শিবাজীর জন্ম-তারিখ এখনও অবিসংবাদীভাবে গৃহীত হয় নাই। ১৬২৭-৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার জন্ম। শিবাজীর জন্মের কুড়ি-বাইশ বৎসর পূর্বে রামদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে রামদাস সংসার ত্যাগ করেন। নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ১৬৪৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি মহারাষ্ট্রে ফিরিয়া কৃষ্ণানদীর তীরে আশ্রম স্থাপন করেন এবং এই সময় হইতে তিনি ধর্মশিক্ষাদানে ব্রতী হইলেন। ঐ বৎসর শিবাজী কোণ্ডনা বা সিংহগড় দুর্গ অধিকার করেন। রামদাসের আবির্ভাব এবং শিবাজীর সিংহগড় অধিকার কিন্তু কাকতালীয় ঘটনাও নহে। ১৬৪৪ হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত মহারাষ্ট্রদেশ শিবাজী এবং রামদাসের কীর্তিমুখর কর্মক্ষেত্র; অথচ দিবাকর গোস্বামীর পত্রে পাওয়া যায় ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসেই রামদাস ও শিবাজীর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। ইহার পূর্বে শিবাজী রামদাসের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। উক্ত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে রামদাস তাঁহার অপূর্বগ্রন্থ 'দাস-বোধ' রচনা করিয়াছিলেন; উহা মহারাষ্ট্রের নববিধান (New dispensation) তুল্য। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে, অর্থাৎ রামদাসের মহারাষ্ট্রে আশ্রম স্থাপন করিবার ষোলো বৎসর পরে, মহারাষ্ট্র-কেশরী আফজল খাঁ-বধপর্ব শেষ করিয়া রাহুমুক্ত ভাস্করের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিলেন; মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতের ইহাই সূচনা। ঐতিহাসিক সরদেশাই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে রামদাস শিবাজীকে প্রভাবিত করেন নাই, বরং শূর-নায়ক (hero as a king) শিবাজীর কৃতিত্বই সন্ন্যাসী রামদাসকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই জন্যই রামদাসের দাস-বোধ গ্রন্থে এবং তাঁহার পরবর্তী ধর্মশিক্ষার মধ্যে অজ্ঞাতে ছত্রপতি শিবাজীর ছায়া পড়িয়াছে। দাস-বোধ বর্ণিত 'উত্তমপুরুষ', যিনি বীর,

ধর্মের রক্ষক, সমাজের পরিত্রাতা তিনি শিবাজীর আদর্শে অঙ্কিত হইয়াছেন— এই অনুমান অসংগত নয়। রামদাস অন্যান্য 'সন্ত'গণের ন্যায় আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। বৈষয়িক জীবনে সফলতা অর্জনের উপদেশ তাঁহার শিক্ষার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। রামদাসের গঠনমূলক কার্য সুদূরপ্রসারী ছিল। মহারাষ্ট্রের সর্বত্র তিনি রামদাসী-মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। এইসমস্ত মঠে শরীরচর্চা ধর্মসাধনার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। রামদাসের উপাস্য দেবতা ছিলেন মারুতি হনুমানজী। হনুমানজীর কৃপা ব্যতীত রামভক্তি লাভ হয় না, কেহ দৈহিক বলের অধিকারী হইতে পারে না, সাধনায় সিদ্ধি দুর্বলের জন্য নহে—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। সেই যুগে হনুমানজী ছিলেন কাল ও সমাজ উপযোগী দেবতা, হনুমান না হইলে রাবণবধ হয় না, সীতা-উদ্ধার হয় না।

আধুনিক উৎকট রাজনীতি-ব্যবসায়ীগণ রামদাস কর্তৃক দেশের সর্বত্র মারুতি-মঠ স্থাপনের পশ্চাতে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং শিবাজীর জন্য পররাজ্যে 'পঞ্চমবাহিনী'সৃষ্টির প্রয়াস আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সরদেশাই যথার্থই বলিয়াছেন, এইরূপ অনুমান ভিত্তিহীন; উহা রামদাসীয় ধর্মের নিছক বিংশ-শতাব্দী-কল্পিত রাজনৈতিক ভাষ্য। কর্মক্লান্ত জীবনের অপরাহ্নে ছত্রপতি শিবাজী রামদাসের উপর পাপপুণ্যের বোঝা চাপাইয়া খালাস পাইবার চেষ্টা হয়তো করিয়াছিলেন। জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত-বহুল দীর্ঘসংগ্রামে 'সমর্থ' রামদাসের উপদেশে শিবাজী সামর্থ্য ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালীন পেশবা বাজীরাও-র গুরু ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীব ন্যায় রামদাস কিন্তু শিবাজীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন না, তিনি কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়েন নাই। ঐতিহাসিক চরিত্রদ্বয় হিসাবে শিবাজী ও রামদাস পরস্পরের পরিপূরক (complement), আদর্শ ও প্রতিবিম্ব নহেন; জাতিগঠনকার্যে রামদাসের দান প্রায় শিবাজীর সমতুল্য। শিবাজীর রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর মহারাষ্ট্র-স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রেরণা জোগাইয়াছিল রামদাসের দাস-বোধ। এই জন্যই শিবাজীর পরে দেখা দিয়াছিলেন 'দাস-বোধ'কল্পিত অন্যতম 'উত্তম পুরুষ' পেশবা প্রথম বাজীরাও।

৭

সমসাময়িক মুসলমান ইতিহাস বলিয়া থাকে 'শিবা' দস্যু, পরাস্বপহারী তস্কর। মারাঠা ইতিহাসে দেখা যায় শিবাজী ছিলেন মাতৃভক্ত সন্তান, ভাবপ্রবণ দুঃসাহসী বালক, হরিকীর্তন এবং মহাভারতের কথা— বিশেষতঃ 'যুদ্ধখণ্ড'— শ্রবণই ছিল তাঁহার শিক্ষা। তিনি বুভুক্ষু দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নাই; পিতা শাহাজী আদিলশাহী দরবারে বিশিষ্ট সামন্ত ও জায়গীরদার। হরিকীর্তন কিংবা মহাভারত শুনিয়া কেহ ডাকাত হয় না, ভীষ্ম অভিমন্যু হইতে পারে; মেবারের মহাবীর সত্যাশ্রয়ী পিতৃভক্ত 'চুণ্ডা' এবং চিতোর-রক্ষক কিশোর বালক 'পত্তা' ইহার প্রমাণ। ধর্মের বাণী বিপরীত ফলপ্রসূ হইয়াছে, ইতিহাসে এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই। সরল উগ্রবিশ্বাসী চরম সাম্যবাদী ইসলামের 'খারিজী' সম্প্রদায় কোরাণ শরীফের দোহাই দিয়া সুন্নী মুসলমানের প্রাণনাশ এবং সম্পত্তি লুট করা মহাপুণ্যের কাজ 'জেহাদ' মনে করিত; ক্রমওয়েল 'তৌরীত'এ পাইয়াছিলেন রোমান ক্যাথলিকদের মাথা কাটিবার নজীর। শুনা যায় বাংলাদেশের বিপ্লববাদীগণ বোমা-রিভলবার লইয়া মারাত্মক শেষযাত্রা করিবার পূর্বে 'গীতা'র দ্বিতীয় অধ্যায় নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতেন। ভাবের বীজ ক্ষেত্র এবং সময়ানুসারে বিভিন্ন প্রকার ফল দান করিয়া থাকে।

সরদেশাই লিখিয়াছেন, ইব্রাহিম আদিলশাহ্‌র মৃত্যুর পর ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ আদিলশাহ্‌র ন্যায় সুলতান বিজাপুর-মসনদ কলঙ্কিত না করিলে শিবাজী হয়তো আদৌ স্বাধীন মহারাষ্ট্ররাজ্য স্থাপন করিবার কল্পনা করিতেন না। মহম্মদ আদিলশাহ্‌র পিতা ইব্রাহিম আদিলশাহ্‌ তাঁহার পূর্বতন সুলতানগণের ধর্মান্ধতা এবং পরধর্ম-নির্যাতন নীতি পরিত্যাগ করিয়া মহামতি আকবরের উদার ধর্মনীতি এবং অপক্ষপাত শাসন দাক্ষিণাত্যে প্রবর্তন করিয়া আকবর জাহাঙ্গীরের মত 'জগৎ-গুরু' আখ্যা লাভ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ আদিলশাহ্‌ ছিলেন আলমগীর বাদশাহ্‌র আদি সংস্করণ। হিন্দু সমাজকে দুর্বল এবং ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কখনও লোভ দেখাইয়া কখনও বল-প্রয়োগ করিয়া প্রসিদ্ধ মারাঠা সামন্তবংশের সাহসী সন্তানগণকে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন, এবং ইসলাম পাকাপাকি-ভাবে ইহাদের উপর কায়েম করিবার জন্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানবংশীয়া কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া নিশ্চিত হইতেন। এই ধর্মান্ধতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মহারাষ্ট্রের ধর্ম ও সমাজে গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি করিল; শিবাজীর সমকালীন সাহিত্য ইহার প্রমাণ। হিন্দু বেগতিক দেখিলেই একটা অবতারের আশায় বসিয়া থাকে। এই কারণেই মুসলমান-নিন্দিত 'দস্যু' ও 'তস্কর' শিবাজী মহারাষ্ট্রে নূতন ধর্মরাজ্য স্থাপনা করিয়া 'অবতারত্ব' লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

মহাভারতকার লিখিয়াছেন: 'প্রাকৃত' অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্য 'মধ্য'কে সেবা করিয়া থাকেন; যাঁহারা 'অপ্রাকৃত' তাঁহারা 'অন্ত্য'সেবী। 'অপ্রাকৃত' ব্যক্তির স্থান হয় সকলের নীচে, না হয় সকলের উপরে। 'অপ্রাকৃত' জন অকৃতকার্য হইলে সমাজে পাগল এবং ইতিহাসে বিদ্রোহী ডাকাত-বাটপার হইয়া পড়েন; কিন্তু অভীষ্টলাভ হইলে তিনিই স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষ সর্ববিধ সম্মান ও প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য। শিবাজী প্রাকৃত মানব হইলে বিজাপুরে বাপদাদার জায়গীর কিংবা মোগল দরবারে পাঁচ হাজারী মনসব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। মহারাষ্ট্রের বীর সন্তান 'দাসত্ব হ'তে দস্যুত্ব উত্তম' এই পন্থা অবলম্বন করিয়া জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেই জাতি দাসত্ব অপেক্ষা দস্যুত্বই উত্তম মনে করিয়াছে তাহারাই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছে, বাদবাকী গোলাম হইয়া পড়িয়াছে। চট্টলকবি নবীনচন্দ্র 'দস্যু' শিবাজীর মনস্তত্ব শিবাজীর মুখেই শুনাইয়াছেন—'ভারত দস্যুত্ববলে লভেছে যবন। কি পাপ দস্যুত্বে উহা করিতে হরণ॥' কবি ও ঐতিহাসিক এইক্ষেত্রে একমত।

দস্যু হইয়াও শিবাজী 'রাজধর্ম' পালন করিয়াছিলেন; সুতরাং অতি বাস্তববাদী স্বয়ং বেদব্যাস বাঁচিয়া থাকিলে তিনিও শিবাজীকে 'ইন্দ্রত্ব' গৌরব হইতে বিমুখ করিতেন না— অন্ততঃ মহাভারতে এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শিবাজী দিল্লী-বিজাপুরের শত্রু ছিলেন, ইসলাম ধর্ম কিংবা মুসলমান প্রজা-বিদ্বেষী ছিলেন না। এইরূপ হইলে তাঁহার রাজধানী পুণা নগরীর বুকে শেখ সল্লার 'মজার' বা পীঠস্থান আজ পর্যন্ত মাটির উপরে থাকিত না, পেশবা-আমল পর্যন্ত উহার জন্য 'খয়রাত-খরচ' বরাদ্দ থাকিত না। তিনি কোনো কাজী ফকিরের বৃত্তি বন্ধ কিংবা নিষ্কর ধর্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করেন নাই। সর্বধর্ম-প্রীতি এবং ধর্মের ব্যাপারে সকলের সহিত আপোষ রক্ষা করাই ছিল তাঁহার নীতি। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বিদেশী মুসলমানগণের যে মাতব্বরী ভাব (superiority complex) হিন্দুরা সহ্য করিত শিবাজীর 'স্বরাজ' আমলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছিল মাত্র। তাঁহার দরবারে কোনো উচ্চপদে কিংবা দায়িত্বপূর্ণ কার্যে মুসলমান নিযুক্ত

হইত না অন্য কারণে। তাঁহার সৈন্যদলে, বিশেষতঃ তোপখানা-বিভাগে, মুসলমান গোলন্দাজ সিপাহীর জন্যে সরকার হইতে 'চাঁদরাত্রি-খরচ'[১] বরাদ্দ ছিল। মুসলমানের কোনো ধর্মাচরণ কিংবা তাজিয়া-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না: কিন্তু গো-কোরবানি নিষেধ ছিল, কারণ গোহত্যা মুসলমান ধর্মের অঙ্গ নয়।

শিবাজী ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার নিমিত্ত তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন— ইহাই মারাঠা ঐতিহাসিকগণের মত। আচার্য যদুনাথ বলিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে আলমগীরশাহী আমলে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা যেন জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ কর্তৃক কর্তিত বৃক্ষের মত এবং উত্তপ্ত লৌহকটাহ-দগ্ধ কাণ্ডমূল হইতে অক্ষয়বটের নূতন শাখা-উদ্গমের মত অলৌকিক দৈবঘটনা। শিবাজীর অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছিল; মুসলমান বুঝিতে পারিল, হিন্দুধর্ম মরিয়াও মরিবার নয়। শিবাজীর সভা-কবি ভূষণ তাঁহার 'শিবরাজভূষণ' কাব্যে এই হিন্দু-রাষ্ট্রের স্বরূপ চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

> বেদ রাখে বিদিত পুরাণ রাখে সার জুত
> রাম নাম রাখো অতি রসনা সুঘর মৈঁ।
> হিন্দুন কী চোটী রোটী রাখী হৈঁ সিপাহীন কী
> কাঁধে মৈঁ জনেউ রাখো মালা রাখো গর মৈঁ।
> হিন্দুন কী হদ্দ রাখী তেগ বল সিব-রাজ
> দেব রাখে দেবল স্বধর্ম রাখো ঘর্ মৈঁ॥

অর্থাৎ, শিবরাজ বেদ প্রচলিত, এবং পুরাণ সারযুক্ত রাখিয়াছেন। জিহ্বায় সুমধুর রাম নাম, হিন্দুর মাথায় টিকি, কাঁধে উপবীত, গলায় মালা, যোদ্ধার জীবিকা তিনিই রক্ষা করিয়াছেন। হিন্দুর রাজ্য মন্দিরে দেবমূর্তি, প্রতি ঘরে স্বধর্ম অসি-বলে শিবরাজ স্থাপন করিয়াছেন।

৮

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক রাজনীতি ধর্ম ও সমাজের দৃষ্টিতে এক অপূর্ব মহত্ত্বপূর্ণ বিরাট ব্যাপার: সেই যুগের এক রাজসূয়যজ্ঞ। এই অনুষ্ঠানে কাশী-প্রয়াগ-কাঞ্চী-পুরুষোত্তম(পুরী)-বাসী পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রের 'দেশস্থ' কিংবা 'কোঙ্কণস্থ' ব্রাহ্মণ কেহই বাদ পড়েন নাই। শিবাজীর খ্যাতি, শিবাজীর ঐশ্বর্য, হিন্দুশাসিত হিন্দুরাজ্য, হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান এতদিন পর্যন্ত উত্তরভারতে প্রায় অজ্ঞাত ছিল; যাঁহারা লোকমুখে কিছু শুনিয়াছিলেন এই সাড়ম্বর রাজ্যাভিষেক স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচিয়া গেল। দক্ষিণা ও ভক্তিতে পরিতুষ্ট দূরদেশাগত পণ্ডিত-মণ্ডলী এক নূতন প্রেরণা ও আশার বাণী লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন এবং উহা হিন্দুসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারের প্রচারমূলক মূল্য (propaganda value) শিবাজীর অর্থব্যয় সার্থক করিয়া তুলিল; উত্তরভারতে হিন্দুজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। এই হিসাবে শিবাজী বিজয়নগর সম্রাট্ কৃষ্ণদেব রায় অপেক্ষা অধিক রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

---

[১] [illegible]

মহারাষ্ট্রে এই রাজ্যাভিষেকের শেষ পরিণাম কিন্তু শুভ হয় নাই। এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শিবাজীর কায়স্থ মন্ত্রী চিটনীস। তিনি এই অভিষেকের কথা তুলিবামাত্র মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণগণ ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন, যেহেতু শিবাজী শূদ্র— একমাত্র ক্ষত্রিয়ই রাজ্যাভিষেকের অধিকারী। মহারাষ্ট্র পরশুরামের রাজ্য, যিনি একবিংশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে ক্ষত্রিয় দূরের কথা বৈশ্যবর্ণও লোপ পাইয়াছিল। স্মার্ত রঘুনন্দন-শাসিত বাংলার হিন্দু সমাজের মত মহারাষ্ট্রদেশে তৎকালে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র ব্যতীত তৃতীয় বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইত না। পণ্ডিতগণের বিচারে শিবাজীর ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি প্রমাণাভাবে অগ্রাহ্য হইল। ধূর্ত কায়স্থ চিট্‌নীস সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি শিবাজীর বংশকুলজী আবিষ্কার করিবার জন্য উদয়পুর চলিলেন, এবং এক দলিল আবিষ্কার কিংবা প্রস্তুত করিয়া কাশীধামের পণ্ডিতসমাজের মুখপাত্র গাগা ভাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিবাজীর ক্ষত্রিয়ত্ব দাবির স্বপক্ষে ঐতিহাসিক যুক্তি না থাকিলেও উহার সঙ্গে মোটা রকমেব দক্ষিণা ছিল। মিবাড়ের রাজবংশীয় ভৈরবসিংহ হইতে ভোঁসলা বংশের উৎপত্তি, এই কথা স্বয়ং শিবাজী কিংবা কবি ভূষণ কেহই জানিতেন না। যাহা হউক, গাগা ভাটের ব্যবস্থা ও অভিষেকে পৌরোহিত্য করিবার সম্মতি লইয়া চিটনীস দেশে ফিরিলেন, মহাধুমধামে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজ্যাভিষেকের কিছুদিন পূর্বে মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণের সহিত গাগা ভট্টের বিচার আরম্ভ হইল। দেশস্থ-কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণগণের বিরোধিতায় গাগা ভট্ট স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন ক্ষত্রিয় হইলেও শিবাজী আচারবিহীন হইয়া 'ব্রাত্য' হইয়াছেন; সুতরাং অভিষেকের পূর্বে দেবতা-দর্শন এবং প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক— সর্বপ্রথম ক্ষত্রকুলান্তক পরশুরামের মন্দিরদর্শন, পরে অন্যান্য মন্দিব; ইহার পর, ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত ও যজ্ঞোপবীত-গ্রহণ (২৮ মে, ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দ)। গাগা ভট্ট শিবাজীকে যজ্ঞসূত্র দিলেন; কিন্তু উহার পরে মন্ত্রপাঠ লইয়া বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। শিবাজী দাবি করিলেন দীক্ষা-বিষয়ক সমস্ত বৈদিক মন্ত্র তিনি পরিষ্কারভাবে শুনিতে পারেন এইভাবে পাঠ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা মনে করিয়াছিলেন শুধু ঠোঁট নাড়িয়া এবং রাজাকে 'নমো নমঃ' করিতে বলিযাই কাজ সারিবেন। শিবাজী জিদ্ ছাড়িলেন না, ব্রাহ্মণেরা চীৎকার আরম্ভ করিলেন কলিযুগে কোনো প্রকৃত ক্ষত্রিয় নাই, বেদে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার। গাগা ভট্ট ভড়কাইয়া গেলেন। তিনি মন্ত্রে কোনোরকম গোঁজামিল দিয়া অব্যাহতি পাইলেন; শিবাজীর পরাজয় হইল, দ্বিজত্ব লাভ করিয়াও ব্রাহ্মণের একধাপ নীচে রহিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের খপ্পরে পড়িলে রাজারও নিস্তার নাই; তখন শিবাজীর মানসিক অবস্থা পাণ্ডার কবলগ্রস্ত মুক্তকচ্ছ ভক্তের মত— যত্র তত্র দান ও দণ্ড। মন্ত্রদীক্ষার পরের দিন জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সুবর্ণাদি সপ্তধাতুর 'তুলা-দান'। উহাতেও অব্যাহতি নাই। দুইজন পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন, লুট করিবার এবং শহর পোড়াইবার সময় হয়ত গো-ব্রাহ্মণ নারী-শিশু বধের অনিচ্ছাকৃত পাপ শিবাজী নিশ্চয়ই করিয়াছেন; ইহার জন্য 'দণ্ডদান' আবশ্যক। শিবাজীর মাত্র আট হাজার টাকা 'দণ্ড' সাব্যস্ত হইল। গোরু মারিয়া জুতাদান করিলে পাপমুক্ত হওয়া যায়, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের ইহাই যেন অনুশাসন। শিবাজী এই 'দণ্ড' বিপ্র-সাৎ করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। এইভাবে মহারাষ্ট্রে 'সন্ত'প্রচারিত একতা ও সাম্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিক্রিয়ার স্রোতে ভাসিয়া গেল। এই প্রতিক্রিয়ার ভরা জোয়ার দেখা গিয়াছিল পেশবা কালীন মহারাষ্ট্র সমাজে এবং ধর্মে।

ছত্রপতি শিবাজী ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ [illegible]। তিনি

ঘোষণা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রচর্চা এবং পূজা-অর্চনাই করিবেন, 'রাজ-সেবা' ব্রাহ্মণের ধর্ম নহে। এই ওজুহাতে তিনি শাসন ও সেনাবিভাগের উচ্চপদ হইতে ব্রাহ্মণগণকে অপসারিত করিয়া 'প্রভু' (কায়স্থ) নিযুক্ত করিলেন; ব্রাহ্মণ-সমাজে হাহাকার পড়িয়া গেল। মোরো পন্ত হনুমন্তে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া শিবাজীর ক্রোধ শান্ত করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ-মারাঠা বিবাদ ঘুচিল না। এই সর্বনাশা বিবাদ বিংশ-শতাব্দীতেও শান্ত না হইয়া বরং উৎকট হইয়াছে।

ছত্রপতি শিবাজী দরবারে মুসলমান দরবারী পোশাক নিষিদ্ধ করিয়া ধুতি-চাদর প্রবর্তন করেন নাই। ধর্মে প্রতিক্রিয়ার রাশ তিনি শক্তভাবে টানিয়া না রাখিলে ব্রাহ্মণেরা মনুশাসিত বর্ণ ও সমাজ ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য পেশবা বালাজী বাজীরাও-র সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিত না।

৯

প্রতিক্রিয়া এবং পুনরভ্যুত্থান মানুষকে প্রথম ধাক্কায় সনাতন-পুরাতনের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। এই জন্যই সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে প্রতিক্রিয়া উন্নতির পরিপন্থী হইয়া থাকে, অভ্যুত্থান অধঃপতনের কারণ হইয়া পড়ে। প্রতিক্রিয়ার কতকগুলি সামান্য লক্ষণ আছে, যথা, পুরাতনকে ফিরাইয়া আনিবার উন্মাদনা, প্রতিহিংসার মনোভাব, পরের ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণার ভাব, ক্ষুব্ধ আত্মাভিমান। এই প্রতিক্রিয়া বায়ুর প্রকোপের ন্যায় জাতির সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাইয়া থাকে: যথা, ফরাসী অধীনতামুক্ত ইটালীয়গণ নেপোলিয়ন-কর্তৃক আনীত ফরাসী গাছপালা উদ্যান হইতে উৎপাটন করিয়া মুক্তি-উৎসব উদ্‌যাপন। হালে, স্বাধীনতা লাভের পর দেশ পাগলের হাতে পড়িলে বিশুদ্ধবাদী হিন্দুগণ হয়ত চোগা-চাপকান কোট-পাতলুন ছিঁড়িয়া ফেলিত, চেয়ার টেবিল ভাঙিত।

মারাঠা জাতির পুনরুভ্যুত্থানের এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই সামান্য লক্ষণের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়, ইহার কারণ শিবাজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ছত্রপতি শিবাজীর সর্বাপেক্ষা বড় গুণ ছিল মাত্রাজ্ঞান, যাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ কিংবা জাতির কর্ণধারগণ প্রায়শ হারাইয়া ফেলেন। তিনি যদি 'ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে ধৃত করবাল' কল্কী অবতার সাজিয়া গোলকুণ্ডা-বিজাপুর মুসলমানশূন্য করিবার উদ্যম করিতেন, উহার পরিণাম কি হইত না বলাই ভালো। আফজল খাঁর ভবানী-মন্দির-ধ্বংসের যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মারাঠাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল শিবাজী উহা দ্বারা বিচলিত হইয়া মসজিদ ধ্বংস করিতে থাকিলে পরিণাম শুভ হইত না; তাঁহার স্বধর্মপ্রীতি আওরঙ্গজেবের মত পরধর্ম-নির্যাতনের দ্বারা কলুষিত হয় নাই। মহারাষ্ট্র সমাজের মনের তিক্ততা এবং প্রতিহিংসাবৃত্তিকে ছত্রপতি শিবাজী সুকৌশলে গঠন-মূলক কার্যের খাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের অভ্যুদয়ে ইসলাম বিপন্ন, মুসলমান-প্রাধান্য রাহুগ্রস্ত— মুসলমানের এই আতঙ্কজনিত প্রতিক্রিয়াকে শিবাজী তাঁহার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত হইতে দেন নাই; মালিক অম্বরের মত তিনি মোগলসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-মুসলমানের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহা শিবাজীর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব।

তাঁহার রাজত্বে হিন্দু-প্রতিক্রিয়া অন্যক্ষেত্রে পরিস্ফুট হইয়াছিল। সেই যুগে হিন্দুর মনে স্বাধীনতা, ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং সংস্কৃতভাষা এক সূত্রে গ্রথিত ছিল। ইহার প্রথম উদ্যোগ অষ্ট-প্রধানের শুদ্ধি— ফারশি পদবী পরিত্যাগ এবং প্রাচীন ভারতীয় 'সচিব' 'অমাত্য' 'মন্ত্রী' ইত্যাদি উপাধির প্রবর্তন; ঐ একই

মনস্তত্ত্ব ভারতবর্ষে বর্তমানে 'রাজ্যপাল' 'রাষ্ট্রপাল' সৃষ্টি করিয়াছে। মারাঠী ভাষাকে আরবী-ফারশি বর্জিত করিয়া 'বিশুদ্ধ' করিবার আন্দোলন শিবাজীর সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল। মারাঠী ভাষায় তখন শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহার-উপযোগী শব্দ অতি কম ছিল; অথচ দরবার, শাসন-ব্যবস্থা, পোশাক সবই মুসলমানী। একালের মত সেকালেও সংস্কৃত ব্যতীত শব্দসম্পদ বৃদ্ধির অন্য ভাণ্ডার ছিল না; ছত্রপতি শিবাজী সংস্কৃত-চর্চায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে অমাত্য রঘুনাথপন্ত হনুমন্তে সংস্কৃত ভাষায় তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত আরবী-ফারশি-হিন্দুস্থানী শব্দের এক পরিভাষা লিখিয়াছিলেন— নাম 'রাজব্যবহারকোশঃ'। যাঁহারা হিন্দী পরিভাষা সংকলনে নিযুক্ত আছেন, এই পুস্তক তাঁহাদের কার্যে শ্রম লাঘব করিবে। একটি উদাহরণ—

ধূম্রযন্ত্রং গুড়গুড়ী তমাখু ধূমপত্রকম্
অথোপহার-পাত্রং তু তবকম্[২] পরিকীর্তিতং ॥

ভাষার উপর জবরদস্তী চলে না। চেষ্টা করিয়া কোনো ভাষায় শব্দ-বিতাড়ন সম্ভব হইলে বর্তমান সময় পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে হিন্দুর বংশানুক্রমিক 'পোতদার' 'মজুমদার' পদবী থাকিত না; 'পেশবা' চিরকাল লোকের মুখে 'পেশবা' রহিয়া গেল, 'পন্তপ্রধান' শুধু কাগজপত্রে। যাহা হউক শিবাজীর সময় হইতে ভাষার যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল এখনকার মার্জিত বিশুদ্ধ এবং সংস্কৃতবহুল মারাঠী ভাষা উহার শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

মহারাষ্ট্র-স্বাধীনতায় মহিলার দান কম নহে। শিবাজীর মাতামহ নিজামশাহ কর্তৃক প্রকাশ্যে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন; শিবাজীর 'স্বরাজ্য' প্রতিষ্ঠা শোকসন্তপ্ত মাতার প্রতিহিংসা-তর্পণ। জীজাবাঈ ফাল্টনের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত পরাক্রান্ত নিম্বলকার পরিবারের শুদ্ধিব্যবস্থা করিয়া উহার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। শিবাজীর রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ সেনাপতি নেতাজী পল্‌কর (Palkar) আওরঙ্গজেব কর্তৃক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; পরে অনুতপ্ত হইয়া তিনি জীজাবাঈর আশ্রয় ভিক্ষা করেন। জীজাবাঈ নেতাজীর শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া সমাজে গ্রহণ করেন। এইরূপ রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং নৈতিক সৎসাহসের দৃষ্টান্ত হিন্দু-ইতিহাসে বিরল। জীজাবাঈ যাহা করিয়াছিলেন শুচিবায়ুগ্রস্ত পেশবাগণের উহা করিবার সাহস হয় নাই। তাঁহার দৃষ্টান্তে এইরূপ শুদ্ধি অল্প-বিস্তর চলিয়াছিল।

ছত্রপতি শিবাজী তাঁহার সমসাময়িক হিন্দুজাগৃতিরূপ ঐতিহাসিক 'প্রতিক্রিয়া'র সন্তান; তিনিই আবার যুগস্রষ্টা, ভারতব্যাপী এক বৃহত্তর প্রতিক্রিয়ার মূল উৎস। তাঁহার প্রেরণায় ছত্রসাল বুন্দেলা বুন্দেলখণ্ডে হিন্দু-স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। মারবাড়পতি মহারাজা যশোবন্ত সিংহ শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারই গোপন সহায়তায় শিবাজী পুণা-দুর্গ অধিকার করেন। ইহা যশোবন্তের পক্ষে নিছক বিশ্বাসঘাতকতা নয়, বিবেকের দংশন। এই বিবেকবুদ্ধি শিবাজীর আদর্শই জাগাইয়া তুলিয়াছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্যবধান ঘুচাইয়া ভাব, প্রেরণা ও সংস্কৃতির আদানপ্রদানের মধ্য দিয়া আর্যাবর্তে যে স্বাধীনতার সন্দেশ প্রেরিত হইয়াছিল, সেই 'প্রতিক্রিয়া'র প্রতীক শিবাজী। তাঁহার দূরদৃষ্টি মারাঠার হিন্দুপদ-পাতশাহী-র প্রথম স্বপ্ন দেখিয়াছিল। হিন্দুস্থানকে বন্ধনমুক্ত করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না; কিন্তু যে মৃত্যুঞ্জয়ী মারাঠা জাতি তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই জাতি অর্ধশতাব্দী কাল মধ্যে তাঁহার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়াছিল।

২ হুঁকার কল্‌কে

বাংলার বাউল

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

৩

বৈদিক যুগ ও মধ্যযুগের সাধকদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যুগে যুগে নানা সাধনার মরমী-বাণী দেখা গিয়াছে। এইবার বাংলার বাউলদের আপন কথা বলা যাইতে পারে। বাউলদের ভাবের ও সাধনার পুরাতন স্বরূপের কথা আগেও কিছু কিছু বলা হইয়াছে, এইবার বাউলদের নিজস্ব কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। সকলেই জানেন, বাউলেরা শাস্ত্রাচার ও লোকাচার মানেন না, মানেন শুধু মানুষের মর্মসত্য। পণ্ডিতেরা সত্য খোঁজেন গ্রন্থের মধ্যে, বাউলেরা খোঁজেন মানুষের মধ্যে। তাঁহারা 'মানবজমীন' পতিত রাখেন না।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে'র মধ্যে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই প্রেমরস ও রাগের সন্ধানে স্বাধীন-পথে-চলা কতকগুলি সম্প্রদায়ের নাম করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানী দুই সম্প্রদায়ের ভাবই আছে। বাউলিয়া মতে এই দুইই আছে অথচ তাহা এই দুই হইতেই স্বতন্ত্র। অধিকাংশ বাউলই নিরক্ষর মুসলমান বা হিন্দু নিম্ন জাতির লোক। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে প্রদর্শিত এই কয়টি মতে মুসলমানী বাহ্যরূপ ও প্রকাশভঙ্গি একটু স্পষ্টতর ভাবে দেখা যায় দরবেশী (প্রথম ভাগ, ১৮০ পৃ) মতে। ইহারা উদাসীন হইলেও প্রকৃতি রাখেন। দরবেশীরা বিগ্রহ-সেবা করেন না। তাঁহাদের ভেখ ও ভাখা অনেকটা মুসলমানী ভাবের। তাঁহারা ব্রত উপবাসও করেন না।

সাঁই (প্রথম, ১৮২ পৃ) সম্প্রদায়ও প্রায় সেইরূপই। সামাজিক আচারে সাঁইরা আরও বেশি পরিমাণে মুসলমানী ভাব মানেন। 'ভেখে-ভাখে'ও ইঁহারা বেশি মুসলমানী।

খুশি-বিশ্বাসী (ঐ, ২০৪ পৃ) সাধনা মুসলমানের প্রবর্তিত হইলেও তাহা চৈতন্যমতের সঙ্গে বেশি যুক্ত। কৃষ্ণনগরের নিকটে দেবগ্রামের কাছে ভাগাগ্রামে এই সম্প্রদায়ের মূল স্থান।

চৈতন্যমত ভক্তিপন্থী, কাজেই শাস্ত্রভার হইতে অনেকটা মুক্ত। চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বীরভদ্র নাকি আরও বেশি স্বাধীন ও 'প্রেমানুগা' সাধনা প্রবর্তিত করেন। তাহারই ক্রমবিকাশে ঘোষপাড়ায় রামশরণ পাল কর্তাভজা সম্প্রদায় (ঐ, ১৮৬ পৃ) প্রবর্তিত করেন। এই মতের আদিগুরু আউলচাঁদ। আউলচাঁদের মতকে রামশরণই ভালো করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে আউলচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাইশ জন শিষ্য, সবাই নিম্নজাতীয়। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন রামশরণ। পরে অনেক ভদ্রলোকও রামশরণের শিষ্য হইলেন। ইঁহাদের সম্প্রদায়কে কর্তাভজা বলে। ইঁহারা জাতি-পংক্তি-সম্প্রদায়-ভেদ মানেন না। ইঁহারা মনে করেন আউলচাঁদ চৈতন্যমহাপ্রভুরই অবতার। হিংসা লোভ ও কামকে ইঁহারা নৈতিক পাপ মনে করেন। মন বাক্য ও কার্যে এইসব দুর্নীতি পরিহার করা চাই। নীতিশুদ্ধি হইলেই প্রেমের পথ মুক্ত হয়। তখন প্রেমই সাধককে পথ দেখায়।

সহজ-কর্তাভজা বা আউল নামেও এক সম্প্রদায় আছে (ঐ, ২০৪ পৃ)। আর একদল লোক কর্তাভজা

সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁশবাটিতে রামবল্লভী সম্প্রদায় (ঐ, ২০১ পৃ) স্থাপন করেন। ইহারা সর্বধর্মের শাস্ত্রকে সমান মান্য বলিয়া মানেন। ইঁহাদের সাধনাবেদির নাম সত্য। সাধনাবেদির কাছে থাকিলে ইঁহারা সমাজবিধান অস্বীকার করেন।

কৃষ্ণনগর জেলায় দোগাছিয়া শালিগরাম প্রভৃতি গ্রামে এক উদাসীন-সাধক-প্রবর্তিত সাহেবধনী সম্প্রদায় (ঐ, ২০২ পৃ) চলে। ইঁহারা বিগ্রহ মানেন না। গুরুর আসনকে সম্মুখে রাখিয়া ইঁহারা উপাসনা করেন। বৃহস্পতিবার ইঁহাদের সমবেত উপাসনার দিন।

বলরামী সম্প্রদায়ের (২১৮ পৃ) গুরুর নাম বলরাম। তিনি জাতিতে হাড়ি। ১৭৯৫ খৃস্টাব্দে নদীয়া জেলার মেহেরপুরে মালোপাড়ায় তাঁহার জন্ম হয়। বলরামকে শ্রীরামের অবতার মনে করা হয়। তাঁহার মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইল ভগবানের শরীর। ইঁহারাও জাতিভেদ মানেন না। ইঁহারা বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হন এবং বিশুদ্ধ নৈতিকজীবন যাপন করেন। শাস্ত্র বা বিগ্রহ ইঁহারা মানেন না।

ন্যাড়া সম্প্রদায়ের (১৭৭ পৃ) প্রবর্তক নাকি নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র। ঢাকা ও বীরভূম জেলায় ইঁহাদের স্থান আছে। বাউলদের মত ইঁহাদেরও প্রকৃতিসাধনা আছে। ইঁহারাও বিগ্রহ মানেন না এবং কায়াকর্ষণ করেন না। ইঁহারা কায়াযোগ সাধনাও করেন। বাহ্য ভেখে বৈষ্ণবদের সঙ্গে ইঁহাদের কিছু মিল আছে। ফকিরদের মত স্ফটিকমালাও ইঁহারা ধারণ করেন ও ফকিরী আলখাল্লা পরিধান করেন। ন্যাড়ারা হরিবোল ও বীর-অবধূত ঘোষণা দেন। ইঁহাদের আলখাল্লা নানা বর্ণের বস্ত্রখণ্ডে প্রস্তুত। ঝুলি লাঠি ও কিশ্‌তী (দরিয়াই নারিকেল) লইয়া ইঁহারা ভিক্ষা করেন ও মাথায় টুপি পরেন।

সহজী মতে (১৭৮ পৃ) গুরুই শ্রীকৃষ্ণ। শিষ্যারা রাধিকা। গুরু দ্বিবিধ। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। সহজীমতে নাম-মন্ত্র-ভাব-প্রেম-রস এই পঞ্চবিধ আশ্রয়। প্রেম ও রসের আশ্রয়ই হইল প্রধান পন্থা।

জগমোহনী (২১০ পৃ) সম্প্রদায়ের বিষয়ে অক্ষয়বাবু খুব বেশি খবর দিতে পারেন নাই। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে শ্রদ্ধেয় অচ্যুতচরণ চৌধুরী ও বৈদ্যনাথ দে ইঁহাদের অনেক খবর দিয়াছেন।

প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে বাঘাসুরা গ্রামে জগমোহনের জন্ম হয়। ইঁহাদের আদিস্থান মাছুলিয়া, দ্বিতীয় স্থান জলসুখা, তৃতীয় স্থান বিথঙ্গল, চতুর্থ স্থান ঢাকা ফরিদাবাদ। ইঁহাদের আরও আটটি মঠ আছে। জগমোহনের গুরুর নাম মুরারি। তিনি ছিলেন রামানন্দের ধারার। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রদ্বীপে জগমোহনের জন্ম। শ্রীহট্ট জেলায় এই ধর্মের প্রচার চলে।

ইঁহারা বিগ্রহ মানেন না, গুরু মানেন। ইঁহারা তুলসী ও গোময়কে পবিত্র মনে করেন না। নরসেবাব্রত এবং ব্রহ্মচর্যই ইঁহারা পালন করেন। লোকের সেবাই ইঁহাদের ধর্ম। জগমোহনী সম্প্রদায়ের শান্ত (সন্ত) গোঁসাইয়ের শিষ্য রামকৃষ্ণ ১৫৭৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই জগমোহনী সম্প্রদায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৯২ খৃস্টাব্দে শান্ত (সন্ত) গোঁসাই হইতে রামকৃষ্ণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৬৫২ খৃস্টাব্দে মাঘীপূর্ণিমায় রামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণ গুরুর আজ্ঞায় নানা তীর্থে সাধু-সন্তদের দরশনে বাহির হন। তাহাতে ভক্ত কৃপালদাস তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। কৃপালের কৃপায় তখনকার তীর্থস্থানের অনেক কথা জানা যায়। তখনকার দিনের বহু স্থানের বিবরণ কৃপাল রাখিয়া গিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের কবীর দাস ও লবনী দাস প্রভৃতির লেখাতেও সেই যুগের বহু তথ্য পাওয়া যায়।

কুলহারা নদীতীরে বিথঙ্গল স্থানটি দেখিয়া রামকৃষ্ণ মুগ্ধ হন। বিশাল নদী এবং সীমাহীন প্রান্তরের কাছেই বাউলিয়া মতের বেশি প্রভাব দেখা যায়। বিথঙ্গলে জলদস্যুদের তিনি সুপথে আনেন ও বহু জালিককে দীক্ষা দেন। পরে চারিদিকে জলে বিপন্ন দুর্গতদের রক্ষা করাও তাঁহাদের ধর্ম হয়। ইঁহাদের নির্বাণ সংগীত অসীম অপার পরব্রহ্মেরই মহিমাকীর্তন।

জগমোহন ও রামকৃষ্ণের সাধনায় শ্রীহট্ট এক সাধনাভূমিতে পরিণত হয়। পরে রফিনগরে ভোলাশাহ জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহার সাধনা রাখিয়া যান। করণশীর অন্তর্গত মতির গ্রামে রমজান মণ্ডল বাউলিয়া মতের সাধক ছিলেন। ধোপা জাতীয় রাখালশাহ বাউল-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া শাহ উপাধি লাভ করেন। সুরমানদীর তীরে কানাইঘাটে তাঁহার স্থান ছিল। জগমোহনের সাধনার সঙ্গে ইঁহাদের যোগ আছে বলিয়া ইঁহাদের নাম করা গেল।

বাউলিয়া মতের তত্ত্ব বা দর্শনের দিকটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার Philosophy of Our People[১] এবং *The Religion of Man*এ (Hibbert Lectures) চমৎকার বলিয়াছেন। সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাহা ছাড়া বাউলিয়াতত্ত্ব বিষয়ে আর-কিছু যাহা বলিলে ভালো হয় তাহাই এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে' আছে (১৭১ পৃ) বাউলদের আদিগুরু মহাপ্রভু চৈতন্য। কিন্তু মহাপ্রভুর বহু পূর্বেই বাউলিয়া মত ও বাউল নাম পাই। বাউল মতে দেহেই সর্ব বিশ্ব অবস্থিত। বিশ্বনাথ এই দেহমন্দিরের দেবতা। তাই কথা আছে—

যা আছে ভাণ্ডে
তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।

সর্বতীর্থ সর্বসাধনা এই দেহেরই মধ্যে। এই পথের পথিক লোকসমাজে লোকধর্মকে মানিলেও অন্তরে তাহা মানেন না।

লোকমধ্যে লোকাচার
সদ্‌গুরুমধ্যে একাচার॥

ইঁহারা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই বেশবাস পরিধান করেন। ঝুলি লাঠি ও কিশ্‌তী (দরিয়াই নারিকেলের ভিক্ষাপাত্র) লইয়া বাউলেরা বাহির হন ও সর্বকেশ রক্ষা করেন। বিগ্রহ ইঁহারা মানেন না বা উপবাস ব্রতাদি করেন না এবং পুরাণাদি শাস্ত্রও মানেন না। দেহতত্ত্বের গান ইঁহারা করেন। ইঁহাদের দেহসাধনায় চারি চন্দ্র ভেদ 'অতি গোপনীয় ব্যাপার এবং তাহা অতি বীভৎস'। তাঁহারা বলেন—

কারে বোলবো কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।

কিন্তু এই চারি চন্দ্র ভেদও তো কায়িক ব্যাপার। তাহা হইতেও উচ্চতর ভাবসাধনাওয়ালা বাউলও আছেন। বাউলদের দেহতত্ত্বের গানের কিছু নমুনাও ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে আছে। যথা—

১০ সহজ মানুষ আলেকলতা।
আলেকে বিরাজ করে, বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা।

---

১ ভারতীয় দর্শন-মহাসভার সভাপতির অভিভাষণ। মডার্ন রিভিউ, জানুয়ারি ১৯২৬

আলেকের প্রেমের কোলে পেতেছে বাঁকা নলে
ত্রিবেণীর জল উজান চলে, বহিছে সর্বদা।
আপনি চলে নলের পথে, সে নল কেউ নারে চিন্তে
জগতে করে চিন্তে চিন্তামণি চিন্তাদাতা॥
আলেক দুনিয়ার বীজে, আলেকে সাঁই বিরাজে
আলেকে নিচ্চে খবর, আলেকে কয় কথা।
আলেক গাছে ফুল ফুটেছে, সৌরভে জগৎ মেতেছে
আলেকে হয় গাছের গোড়া, ডাল ছাড়া তায় আছে পাতা॥
আলেক মানুষের রসে, সনাতনে সদা ভাসে,
বাউল তোর লাগলো দিশে, যেতে নারবি তথা।
তুমি সদাই বেড়াও রিপুর ঘোরে
মানুষ চিনবি কেমন করে,
যেদিনে ধরবে তোরে, মুগুর দিয়ে ছেঁচবে মাথা॥

রূপেতে রূপ নেহার করি, রাগ দর্পণ ধরি,
হুতাশনকে শীতল করি, অনলে রেখেছে পারা।
গোসাঁই গুরু চাঁদে বলে, ডুবে যাক মন সিন্ধুজলে,
(কিন্তু) সে জলে পরশ হলে, শুকনোয় ডুবাবি ভরা॥

ন্যাড়া সহজিয়া কর্তাভজা প্রভৃতি সবাই আপনাদের বাউল বলেন। আবার বাউলদের মধ্যেও বহু ভাগ-বিভাগ আছে। তাঁহাদের সবারই আদি বীরভদ্র বা চৈতন্যমহাপ্রভু বলা চলে না। নানা আকারে বাউলমতের অনুরূপ সাধনার ধারা এ দেশে যে চলিয়া আসিতেছে তাহা পূর্বেও দেখানো গিয়াছে। মহাপ্রভু এবং তাঁহার সঙ্গীরা অনেক সময় বাউল বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিয়াছেন। কাজেই বুঝা যায়, বাউলদের তাঁহারাও জানিতেন।

বাউলদের বাহিরেও বহু মত এবং সাধনা বাউলিয়া মতের আছে। তাঁহাদের বাণীতে গানে ও রচনায় তাহা দেখা যায়। আবার বাউলদের মধ্যেও অবাউল অনেক আছেন। বাউল ভাব হইল অন্তরের সত্য। বাহিরের এই ভাগ-বিভাগে ইহার পরিচয় দেওয়া চলে না।

বাউলিয়া প্রেমতত্ত্বের পরিচয় চাহিতে গেলে একবার এক বাউল সাধু বলিয়াছিলেন, "এইসব ব্যাকরণ ও পরখ হইল বাহ্যপন্থীদের, আমাদের ক্ষেত্রে ইহা চলিবে কেন?" তিনি তাই গান করিয়াছিলেন—

ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহরী
নিকষে ঘসয়ে কমল আ মরি মরি।

মিশনারীরা যেমন ভারতীয় ধর্মের মরমসত্য বুঝেনও নাই এবং বুঝাইতেও পারেন নাই, তেমনি গ্রন্থাশ্রয়ী পণ্ডিতের দল ঠিক বাউলিয়া ভাব ও ধর্ম ধরিতেও পারেন নাই এবং তাহার পরিচয়ও দিতে পারেন নাই। যাঁহারা নির্গ্রন্থ তাঁহাদের পরিচয় গ্রন্থে কেমন করিয়া মিলিবে। গ্রন্থী বাউলেরাই নিজেদের পরিচয় গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আসল বাউলের পরিচয় গ্রন্থে দুর্লভ।

তাহা হইলেও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁহার ***Post-Chaitanya Sahajiya Cult of Bengal***

গ্রন্থে যেসব পরিচয় নানা পুঁথিতে পাইয়াছেন তাহা বহু যত্নে সাজাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩০ সালে তাহা বাহির হয়। সহজ মতের গ্রন্থলভ্য পরিচয়ের জন্য এই গ্রন্থখানি সকলকে পড়িতে বলি, ইহাতে বহু খবর মিলিবে।

আসল বাউলেরা নিরক্ষর। পুঁথির ধার তাঁহারা ধারেন না। শিক্ষাব্যবসায় আমরা তো পুঁথিই পড়ি, তাই আমরা পুঁথি-আশ্রয়ী; পুঁথিতে পাইলেই আমাদের সুবিধা হয়। তাহাতে 'পুঁথিয়া' সহজিয়াদের অনেক কথা জানা গেলেও 'অপুঁথিয়া'দের মরম পাওয়া কঠিন। তবে অনেক ক্ষেত্রে পুঁথি দেখিয়াও অনেক কিছু খবর মেলে। আবার পুঁথির বাহিরের খবর খোঁজ করিতে হইলে মানুষের সন্ধানই করিতে হয়।

সহজিয়া ও বাউল মত অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরে যুক্ত। তবে এইসব গ্রন্থে সহজিয়াদের কথা জানিতে সবাই চাহিবেন। কিন্তু এইসব সহজিয়ার পথ বিশুদ্ধ বাউলদের অনেকের মতে নীতিবিগর্হিত। উচ্চভাবের বাউলেরা লোকাচার বেদাচার না মানিলেও মানব-নীতি মানেন।

বাউলিয়া মতেও জীব ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা উপনিষদে বেদান্তেও পাই। বেদান্তজ্ঞান বিনা এই জীব বদ্ধ থাকে, জ্ঞান হইলেই মুক্ত হয়।

বাউলিয়া সাধক স্বর্গের সুখ চাহেন না, চাহেন মুক্তির পরমানন্দ। বাউলেরা বলেন, মুক্তি হইল প্রেমের চিন্ময় প্রকাশ। এই মুক্তি লাভ করিলে ব্রহ্মের সকল ঐশ্বর্য সাধক আপনিই পায়, যদিও কিছুই পাইবার তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই। বাউলেরা মানুষই জানেন, আর চাহেন প্রেমেই মুক্তি। তাঁহাদের মতে স্বর্গের অমৃতের চেয়ে পৃথিবীর এই প্রেমরস মহত্তর। তাই প্রেমামৃতপ্রার্থী দেবতারাও পৃথিবীতে জন্মিয়া মানুষ হইতে চান—

প্রেম আমার পরশমণি তারে ছুঁইলে যে কাম হয় রে সেবা।
তাই গোলোক চায় যে ভুলোক হতে মানুষ হৈতে চায় যে দেবা॥

আমাদের প্রেম সীমাবদ্ধ। ভগবৎপ্রেম বিশ্বব্যাপী। আমাদের প্রেম যখন বিশ্বব্যাপী হইবে তখনই প্রেম হইবে শুদ্ধ ও ভাগবত। তখন সাধকও ভগবানের মতই প্রেমময় হইয়া যাইবেন।

জ্ঞান হইতে প্রেম মহত্তর। তাই শুষ্ক জ্ঞানে ও কর্মে মাতিয়া নারী-বর্জনে লাভ কি? চাই প্রেম। প্রেমহীন শুধু নর বা নারী তো সত্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র। প্রেমে যুক্ত হইলেই নরনারী পূর্ণস্বরূপ হইতে পারে। তবে কামে সেই যোগ ঘটে না। বুভুক্ষিত কাম অন্যকে গ্রাস করিতে চায়।

একে অন্যকে গ্রাস করিলে আর যোগ হইল কৈ? একে অন্যকে যে বিশুদ্ধ প্রেমে পরিপূরণ করিবে তাহা কামের রাজ্যের কথা নহে। তাহার জন্য চাই নরনারী উভয়েরই অন্তরের মুক্ত ভাব। এই মুক্তভাব সমাজের বাহ্য বিধিতে মেলে না, তাই বিধিমার্গে বাউলিয়াদের আস্থা নাই। লোকাচার বা শাস্ত্রাচার কিছুই এই পথে কোনো সাহায্য করিতে অক্ষম।

বেদশাস্ত্র হইতে প্রেম মহত্তর। বেদের পরোয়া বাংলাদেশ কমই করিয়াছে। তাই বাংলার পণ্ডিতের বাণীতেও দেখি, সর্বজনকণ্ঠধৃতা বেদবাণী তো বেশ্যার মত—

কণ্ঠে কেন ধৃতা কস্য ন কুতুকায় বেশ্যাঙ্গনেব শ্রুতিঃ।
— হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব। উপক্রমণিকা

শাস্ত্রের চেয়ে বাউলের নিঃশব্দ মরমকথা মহত্তর। প্রাণহীন শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্ম হইতে মানবীয় প্রেম অনেক বেশি সত্য।

বাউল-মতে তীর্থ-ব্রত বিগ্রহ-মন্দির যাগযজ্ঞ-উপবাস কিছুতেই কিছু হয় না। কায়াকে ক্লেশ দিয়াও লাভ নাই; বরং কায়াকে শ্রদ্ধা করিলেই সর্বসত্যের সাক্ষাৎ মেলে। কায়ার তত্ত্ব শ্রদ্ধাভরে সন্ধান করিতে হয়।

সমাজের নিয়মে নরনারী পরস্পরকে আমরা ব্যবহার করি বটে, কিন্তু কেহ কাহারও 'মর্ম' জানি না। কাজেই সমাজবিধি মানিয়া লাভ নাই। নরনারীর বন্ধনের মধ্যে প্রেমের অধ্যাত্মযোগ ছাড়া আর কোনো বন্ধন থাকিলে তাহা সত্য নহে। সেই অধ্যাত্মযোগেরই প্রকাশ হইল আমাদের প্রেমে।

অধ্যাত্ম সত্যের দীক্ষা মিলিতে পারে সদ্‌গুরুর কাছে। কিন্তু গুরু তো একজন নহেন। চিরদিনই যত জনই যতভাবে আমাদের চেতনা দেন তত জনই গুরু। এক দিনে তো জীবনের দীক্ষা সমাপ্ত হয় না; দিনের পর দিন দীক্ষা চলে। দিনের পর দিন যেমন জীবন অগ্রসর হয় তেমনি দীক্ষাও অগ্রসর হয়। জন্মও চিরন্তন লীলা, তাহা একদিনে সিদ্ধ হয় নাই। অথর্ববেদ বলেন, দিনের পর দিন তোমার জন্মলীলা অগ্রসর হউক—

নবো নবো ভবসি জায়মানঃ।

উচ্চদরের বাউলেরা বলেন, জীবনের সার অমৃত হইল তাহার প্রেম ও প্রেমের ব্যাকুলতা। প্রেম কোনো তত্ত্ববাদ নহে। তাহারই বাহ্য (physical) পথ হইল কায়াসাধন। চারিচন্দ্রের ভেদ প্রভৃতি স্থূল কায়াসাধনও সেই চিন্ময় পথ নহে। আসলে আপনার মধ্যে বিশ্বের পরিচয় এবং যোগও এক চিন্ময় ব্যাপার। ইহাকে বাহ্য রূপে পরিণত করিতে গেলেই বিপদ। চারিচন্দ্রের ভেদ হইল তন্ত্রের ও যোগশাস্ত্রের দাসত্ব। তাহাতে অনুরাগ-পথের কি আছে?

যখন সত্য পথ পাওয়া যাইবে তখন সর্ব জাতি সর্ব সম্প্রদায়কে ডাক দিতে পারা যাইবে। তখন হিন্দু-মুসলমান কাহারও কোনো বাধা থাকিবে না। ভক্তি স্নেহ প্রেম অনুরাগ তো সবাই বুঝে। ইহা তো শাস্ত্র বা লোকাচারের পথ নয়, তাই সকল সম্প্রদায়কেই বাউলেরা গ্রহণ করেন। এই পথে হিন্দুর শিষ্য মুসলমান ও মুসলমানের শিষ্য হিন্দু বিস্তর আছেন। প্রচার ইঁহারা মানেন না। কূপে যতক্ষণ জল না ওঠে তখন বৃথা অন্যকে ডাকাডাকি করিয়া লাভ কি? জল যখন উঠিবে তখন সেই জলই সকলকে ডাক দিয়া আনিবে।

চৈতন্যচরিতামৃত ভক্তিকে বৈধী ও রাগানুগা এই দুই ভাগ করিয়াছেন (মধ্য, ২২ অধ্যায়)। ভক্তির এইরূপ শাস্ত্রীয় ভাগও 'ফুলের বনে জহরী'র পরখের মত। প্রেমের ক্ষেত্রেও বরবধূর সঙ্গে বা মধ্যে আর কেহ ব্যবধান হইয়া থাকিতে পারে না। বাসরঘরে সখীদেরও প্রবেশ নাই।

নদীর যেমন তিন রূপ: প্রথম হইল পর্বতে পার্বতী, দ্বিতীয় হইল সমতলে গঙ্গা, তৃতীয় হইল সাগরে সম্মিলিতা; তেমনি সাধনার প্রথমে প্রবর্ত, দ্বিতীয়ে সাধক, তৃতীয়ে সিদ্ধ। ইঁহাদের আশ্রয়ও ত্রিবিধ: প্রথম অবস্থায় নাম-মন্ত্র, দ্বিতীয় অবস্থায় ভাব-প্রেম, তৃতীয় অবস্থায় মুক্ত রস।

ভক্তিকে বুঝাইতে গিয়া ভারতীয় সাধনা যে পথ ধরিয়াছেন তাহাতে অতিশয় সাহসের পরিচয় পাই। ভগবানকে পাইতে হইলে তাঁহার কোনো না কোনো স্বরূপ তো মনের মধ্যে আনা চাই। তাঁহাকে আমরা কখনো প্রভু ভাবে, কখনো পিতামাতা ভাবে, কখনো বন্ধু ভাবে বা প্রিয় ভাবে বুঝিতে পারি।

মানবীকরণ বা Anthropomorphism বলিয়া পণ্ডিতেরা ভয় দেখাইলেও তাঁহারা সাহসের সহিত বলিবেন, এইসব মানবীয় ভাবে ছাড়া তাঁহাকে আর ভাবিব কোন্ ভাবে ?

ভগবানের হয়তো অনন্ত ঐশ্বর্য ও স্বরূপ। কিন্তু আমাদের তো পাঁচটি মাত্র ইন্দ্রিয়। তাই হয় তাঁহাকে চক্ষু দিয়া, না হয় কর্ণ দিয়া, নয় তো নাসা দিয়া, নয় তো ত্বক্ দিয়া, নহিলে রসনা দিয়া নানাভাবে তাঁহাকে পাইতে হয়। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-রূপে ছাড়া আর তো অনুভবের কোনো পথ নাই। ভগবানকেও ঠিক তেমনই শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই পঞ্চ ভাবে ছাড়া পাই কেমনে? মানবীকরণ বা Anthropomorphismএর ভয় না করিয়া এই কথা ভারতীয় সাধনা সাহসের সহিত বলিয়াছে। তবে সর্ব ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ ভাব হইল মধুর ভাব।

মধুর বা প্রেমের ভাবেও মিলন হইতে বিরহেই চিন্ময় ভাবের বেশি প্রকাশ হয়। কারণ সম্মুখে থাকিলে আমরা অনেক সময় কাহারও মর্ম বুঝি না, ইহাতে অথর্বের সেই কথা মনে পড়ে—

অংতি সন্তং ন জহাতি অংতি সন্তং ন পশ্যতি।

অর্থাৎ যতক্ষণ নিকটের রতন না হারাই ততক্ষণ তাহাকে অনুভব করা বা 'দেখা' যায় না। বুঝিতে হইলে একটু দূরত্ব দরকার। তাই পূর্ণব্রহ্ম আপনার মধ্যে আপনি পূর্ণ হইলেও আত্মপরিচয় পান নাই। ভগবান আপনাকেও সৃষ্টির পূর্বে আপনি যথার্থভাবে পান নাই। নিজেকে নিজে পাওয়া যায় না। আপনাকে একবার পর বা বাহ্য করিয়া (objective) আবার 'আপন' করিতে হয়। তাই একতত্ত্বকে বাধ্য হইয়াই প্রথমে দুই হইতে হয়। পরে সাধনায় সেই দুইকে যুক্ত করিয়া এক করিতে হয়। ইহাতেই কেহ দেখেন অদ্বৈত, কেহ দেখেন দ্বৈত। জ্ঞানে এই দ্বৈতাদ্বৈতবিরোধ ঘোচে না, ঘোচে প্রেমে। কারণ প্রেমে দুইকেই চায় এবং দুইকে এক করে।

বাউলেরাও বলেন—

নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য প্রেম তার নাম।

এইজন্যই প্রেমেই ভগবান আমাকে রূপ দিলেন কারণ প্রেমেই সেই অরূপ ডুবিয়া ধন্য হইবে সর্ব রূপের মধ্যে।

পরকে আপন করিতে পারে এবং ভেদের মধ্যে মধুর অভেদকে সাধনা করে বলিয়াই প্রেমের মহত্ত্ব। আপন হইতে ভিন্নকে স্বীকার করিবার শক্তি একমাত্র আছে প্রেমের। যেখানে পূর্বেই লৌকিক অধিকার আছে সেখানে স্বীকার করার মধ্যে প্রেমের মহত্ব কিছুই বুঝা যায় না। যে 'আমার' নয় তাহাকে 'আমার' বা আপন করিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেই তো প্রেমের প্রেমত্ব। এই কারণেই সমাজ যাহাকে আমার নিজস্ব অধিকার (possession) করিয়া দিয়াছিল তাহাকে গ্রহণ করার মধ্যে প্রেমের গৌরব কি? যে-জন আমার নয়, সমাজবিধি অনুসারে যাহাকে দাবি করিতে পারি না, তাহাকে পাইতে পারিলেই প্রেম। সেইরূপ আমার অধিকারের বাহিরে অথচ আমার প্রার্থনীয়াই হইল পরকীয়া। সে আমার অধিকারের বিষয় (possession) নয় বলিয়াই সাধনা দিয়া তাহাকে পাইতে হয়। নামে সহজ হইলেও সেই সাধনা সহজ নয়।

আসলে সমাজের সহিত বিরোধ-ঘোষণার জন্য বা সমাজনীতিকে দলনের জন্য বাউলদের 'পরকীয়া'কে প্রার্থনা করা নহে। তাহাকে চাওয়া হয় শুধু প্রেমের মহত্ব বুঝিতে। আপনার বস্তুকে আপন করার মধ্যে

প্রেমত্ব কৈ ? সোনাকে নহে, লোহাকে সোনা করিলেই তবে পরশমণি। পরকে আপন করিতে পারিলেই তবে প্রেম। প্রেমের বৃহত্বের প্রমাণ করিতে হইলেই চাই 'পরকীয়া'। স্বকীয়ার উপর তো অধিকারই আছে। প্রেমের সেখানে আর কি রহিল করিবার ? সমাজবিধান অনুসারেই সে আমার অধিকৃতা (possession) ; আমার কাছে ধরা দিতে সে বাধ্য। ঘরের পাখি শিকার করিয়া যেমন শিকার (sport) হয় না, তেমনি লৌকিকতাবদ্ধকে গ্রহণ করিয়া প্রেমের প্রেমত্ব প্রকাশ হয় না।

প্রেম হইবে দুই জনের মধ্যে। এই উভয়ের মধ্যে সখ্য এবং সমান মুক্ত ভাব চাই। তাই প্রেমের মধ্যে উভয় পক্ষের স্বাধীনতা দরকার। মুসলমান বাদশাহদেরও নিয়ম ছিল দাস-তরুণীকে প্রেম করিলেও সে তৎক্ষণাৎ দাস্য হইতে মুক্ত হইত, তাহার পর সে স্বাধীনভাবে প্রেমে সাড়া দিত বা না দিত। দাসীকে প্রেম করার অর্থ কিছু নাই। সমাজের বিধির উপরে প্রেমের মহত্ত্ব তো তাহাতে বুঝা যায় না। দাসত্বের মধ্যে প্রেম (?) তো একটা জুলুম মাত্র। তাই ভগবান প্রেমের ক্ষেত্রে মানবকে অপার মুক্তি দিয়েছেন। এইখানেই মানবের free-willএর সার্থকতা।

প্রেমের অপরূপত্বই হইল তাহার অনিশ্চয়তা। পাইব কি না পাইব এই হৃদয়-দোলা না থাকিলে আর পাইয়া আনন্দ কিসের ? করতলগত বস্তু পাইয়া তো আনন্দ নাই। অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রেমের পাওয়াই পরম মাধুর্য। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে দেখি—

স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।—আদ্য, চতুর্থ

সেই প্রেমের ক্ষেত্রে নর-নারী সবাই সমান। ভগবানও সেখানে আমার চেয়ে বড় নহেন। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যের বা ঈশ্বরত্বের সর্বশক্তিমত্তার জুলুম চলে না। ঈশ্বরত্বের অর্থাৎ অধিকারের জুলুম থাকিলেই প্রেমের সব মহত্ত্ব গেল। তাই ভগবান বলেন—

ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত। ঐ

প্রেমরসিকরূপে তিনি বলেন, "আমার ঈশ্বরত্বই যে মানে সে তো আমার স্বকীয়া। তাহাকে আর পাইব কি ? যে আমার ঈশ্বরত্ব ও প্রভুত্ব এখনও স্বীকার করে নাই, প্রেমের দ্বারা আমি তাহাকেই চাই। তাহার প্রেমই আমার কাম্য"—

আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন। ঐ

ভগবান বলেন, যে আমার অধীন তাহাকে পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে তফাত কি ? যদি সে মুক্তবুদ্ধিতে আমাকে স্বীকার করে তবেই তো সেই পাওয়া হইল পাওয়া। শক্তির ক্ষেত্রে আমি উচ্চ বা ঈশ্বর হইলেও প্রেমের ক্ষেত্রে সে আমারই সমান বা আমা হইতেও উচ্চ। সেখানে আমি তো তাহার অপেক্ষা বড় নহি, হয়তো বা হীনই হইব, তবেই তো প্রেম। এখানে বাউল-সাধকদের সাহসের অন্ত নাই। বাউলদের গানে তাই প্রেমের এত জোর। চৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

আপনাকে বড় মানে, আমাকে সম, হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন। ঐ

স্বকীয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তাভয়-জনিত প্রেমের সার্থকতা নাই। সেই সার্থকতা আছে পরকীয়ার ক্ষেত্রে। ধর্ম ও সমাজ তো অনিশ্চয়তার স্থান রাখে নাই, তাই প্রেমের সব সম্ভাবনা সে চুকাইয়া দিয়াছে।—

কর্ম ছাড়ি রাগে দোহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের লিখন॥ ঐ

তাই পরকীয়া না হইলে প্রেমের কোনো অর্থই থাকে না। যেখানে সমাজবিধির সঙ্গে প্রেমসাধনার একটা বড় বিরোধ আছে, বাউলেরা সেখানে প্রেমের দায়ই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ ধর্ম ও সমাজবিধি না থাকিলে গার্হস্থ্য চলে না।

সাধারণতঃ ফকীর হইলেও বহু বাউল-গৃহস্থও আছেন। সমাজবিধি না মানিলে গৃহস্থনীতি কেমনভাবে চলে? তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "তোমরা তখন কর কি?" বাউল-গৃহস্থ বলেন, "বিধি বা মন্ত্রের দ্বারা আমরা মরমের অধিকার সাব্যস্ত করি না। বিধিকে সাময়িকভাবে স্বীকার করিয়া আমরা দেহের কাছে দেহ রাখিয়া সংসারযাত্রা চালাইয়া যাই। তার পর যদি কখনও ভগবানের কৃপায় তাহাকে প্রেমেতেও পাই তবেই জীবনকে ধন্য মনে করি। সে সৌভাগ্য মন্ত্রের জোরে বা সমাজবিধিতে হয় না। ভগবানের বিশেষ কৃপা থাকিলে সে সৌভাগ্য ঘটে— হয়তো সারাজীবন তাহা না ঘটিতেও পারে। তখন মনে করিতে হইবে জীবন বৃথাই গেল।"—

কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের লিখন॥ ঐ

'স্বকীয়া' অর্থাৎ বিধিধর্মে পাওয়া স্ত্রীকেও প্রেমে আপন করা গেলে তাহাতেও পরকীয়া-সাধনা সিদ্ধ হয়। কারণ এতদিন সে তো ভিন্নই ছিল। এইখানেই বাউলদের এক বড় তত্ত্বের কথা বলা গেল। আর-এক তত্ত্ব হইল তাহাদের প্রকৃতি-ভাবে, সখী-ভাবে আরাধনা।

প্রকৃতি-ভাবের অর্থ কি? জ্ঞান কর্ম ও প্রেম এই তিন পথে সাধনা। জ্ঞান ও কর্মে আবার দিনের পরে দিনে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে শিক্ষা পাই এবং স্বীকার্যকে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া স্বীকার করি, অর্থাৎ ইহা গৌণপন্থা। প্রেমে হঠাৎ একদিনে একেবারে স্বীকার করিতে হয়। যখন অন্তরাত্মা জাগে তখন একদিনে আপনাকে উৎসর্গ (surrender) করিতে হয়। পুরুষের পথ জ্ঞানে ও কর্মে এইরূপ 'ক্রমে ক্রমে'। নারীর পথ প্রেমের; তাহাতে 'ক্রম' নাই— একেবারে তৎক্ষণাৎ (immediate)। পুরুষ বিবাহ করিয়া ক্রমে স্ত্রীকে চেনে। নারীকে বিবাহের সঙ্গেসঙ্গেই সব ছাড়িয়া পতির নূতন সংসারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়। পিতা সন্তানকে ক্রমে ভালবাসিলেও ক্ষতি নাই; ছয় মাসও তিনি প্রতীক্ষা করিতেও পারেন। কিন্তু মা তাঁহার সন্তানকে জন্মমাত্রে স্বীকার না করিলে সৃষ্টি অচল হয়। জীবধর্মে (biologically) নারীকে সবুর করিবার সময় বিধাতা দেন নাই। তাই নারীদের এই 'বেসবুরী'র মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। তবুও নারীর এর 'বেসবুরী'কে না মানিয়া লইলে চলিবে কেন? ইহাই যে তাহার জীবধর্ম (biological fact)।

পুরুষ যখন তাহার জ্ঞানে ও কর্মে 'ক্রমে ক্রমে' অনন্ত অসীমের দিকে অগ্রসর হয় তখন পরদা সরাইতে সরাইতে হয়তো তাহার মানবজন্মই শেষ হইয়া যায়। পরদার তবু আর শেষই হয় না। ইহাই কার্লাইল দেখাইয়াছেন তাঁহার *Sartor Resartus* গ্রন্থে। অনন্ত অসীমের কত পরদা সরাইয়া তাঁহার স্বরূপ পাইবে? তাই আজ সাধক অবশেষে নারীর মতই প্রেমে সহজে এক মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে চায়।

তাহা সম্ভব হয় শুধু প্রেমে। নারীর হইল সেই প্রেমের ধর্ম। তাই মহাপ্রভুর মত লোকও আপনার এইখানেও অপার জ্ঞানে অকৃতার্থ ও হয়রান হইয়া সখী-ভাবে নারী-ভাবে প্রকৃতি-ভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। বাউলদের একটা বড় তত্ত্ব।

বাউলদের মধ্যে পুথ্যা (পুঁথিয়া) ও তথ্যা (real) এই দুই রকম সাধনা আছে। পূর্বেই পুঁথিয়া বাউলতত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছি *Post-Chaitanya Sahajiya Cult* পুস্তকে। আর অপুঁথিয়া বাউলদের সবচেয়ে ভালো পরিচয় দিয়াছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন মহাসভায় (১৮ ডিসেম্বর ১৯২৫) অভিভাষণের এবং হিবার্ট বক্তৃতার (১৯৩০) কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

এই বক্তৃতায় তিনি সবচেয়ে বেশি বাণী ব্যবহার করিয়াছিলেন শ্রীহট্টের বাউলকবি হাসন রজা চৌধুরীর গান। হাসন রজার জন্ম লক্ষ্মণশ্রীর দেওয়ান-বংশে। ইঁহার পিতার নাম আলি রজা চৌধুরী। আলি রজার পূর্বপুরুষ কায়স্থ ছিলেন। হাসন রজার পুত্র প্রখ্যাত একলামুর রজার কাছে শুনিয়াছি ইঁহারা ভরদ্বাজগোত্রীয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তরুণ বয়সেই বাউলদের সঙ্গে পরিচিত হন; তাঁহার লেখা 'বোষ্টমী'র কথা যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই ইহা জানেন। তাঁহার জমিদারি শিলাইদহ পরগণার কাছেই লালন ফকীরের স্থান। লালনের অদ্ভুত একটি প্রতিভা ছিল। তাঁহাদেরই শিষ্য কাঙাল হরিনাথ মজুমদার বা ফকিরচাঁদ বাউল। হরিনাথের শিষ্যেরা সকলে বাউল না হইলেও সবাই কৃতী, তাঁহাদের মধ্যে রাজসাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের নাম সুপরিজ্ঞাত। যে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের তন্ত্রতত্ত্ব অনুবাদ করিয়া আর্থার এভেলান ধন্য হইলেন, সেই বিদ্যার্ণবও হরিনাথের অনুরাগী। বাংলাদেশে সংবাদপত্র-গুরুস্থানীয় জলধর সেনও হরিনাথেরই আপন জন।

লালনের শিষ্যধারার একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে এক ডাকহরকরা। তাঁহার নাম ছিল গগন। তাঁহার গান রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হিবার্ট বক্তৃতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন—

আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে।..

লালনের স্থান ছিল কুষ্টিয়ার নিকট। তিনি জন্মতঃ ছিলেন হিন্দু, পরে দেখা যায় সিরাজ সাঁই নামে মুসলমান ফকীরের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তাঁহার সাধনাতে দুই ধর্মেরই যোগ দেখা যায়। এই ধারার সঙ্গেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল।

কুষ্টিয়ার কাছে ঐ দিকেই পাঁচু ফকীরও একজন বাউল ছিলেন। তাঁহার সীমা ছাড়াইয়া আরও পূর্বদিকে গেলে রাজবাড়ীর কাছে মোছল চাঁদ ফকীরের গানের প্রচলন। তাহার পর ঢাকা জেলায় ছিলেন শাহনাল ফকীর। ধামরাই টাঙাইল প্রভৃতি স্থানে পাগল চাঁদের গান চলে। পাগল চাঁদ একজন সমর্থ বাউল ছিলেন।

আমি নিজে প্রথম বাউল দেখি কাশীতে নিতাই বাউলকে। তাঁহার বাড়ি বাঁকুড়া বা তাহারও পশ্চিমে ছিল। দেশে আসিবার পর ঢাকা জেলার রাজাবাড়ীর আখড়ায় দাশু বাউলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাঁহার আখড়ায় দুর্লভ ও বল্লভের সঙ্গে পরিচয় হইলে দেখা গেল তাঁহারা আরও গভীর ভাবের বাউল। তাঁহাদের কাছেই আমি বড় বড় দুইটি বাউল-ধারা ও বহু গানের সন্ধান পাই। সেই ধারা ধরিয়া বহু প্রাচীন যুগে উপস্থিত হওয়া যায়।

বাংলাভাষার আরম্ভ হইতেই বাউলের পরিচয় মেলে। তবে একবার খোঁজ করিয়া (১৮৯৮ সাল) বারো-তেরো পুরুষ পর্যন্ত কোনোমতে পাইয়াছিলাম।

এক ধারাতে মদন বাউল জন্মতঃ ছিলেন মুসলমান। তাঁহার গুরু ছিলেন ঈশান, জাতিতে যুগী। ঈশানের গুরু দীনা বা দীননাথ জাতিতে ছিলেন নর বা বাদ্যকর। দীনার গুরু নমঃশূদ্রবংশীয় হারাই। হারাইর গুরু কালাচাঁদ ছিলেন জাতিতে বাড়ই বা সূত্রধর, নমঃশূদ্র-সূত্রধরই হইবার কথা। কালাচাঁদের গুরু নিত্যনাথ; নিত্যনাথের গুরু মূলনাথ; মূলনাথের গুরু আদিনাথ। নিত্যনাথের বন্ধু ও গুরুভাই ছিলেন মনাই ফকীর। মনাই জন্মতঃ মুসলমান। এই তিন তিন জন 'নাথ' বাউল নাম দেখিয়া নাথ-পন্থের সঙ্গে বাউল মতের প্রাচীন যোগের কথা মনে আসে।

নিত্যনাথের এক শিষ্য কালাচাঁদ, সেই ধারাতে মদন। মদনের বন্ধু ছিলেন গঙ্গারাম, জাতিতে নমঃশূদ্র। গঙ্গারাম মদনের বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও বন্ধুতা খুব গাঢ় ছিল। গঙ্গারামের গুরু ছিলেন কৈবত জগাইর শিষ্য মাধা। নিত্যনাথের আর-এক শিষ্য ছিলেন বলা বা বলরাম। তিনিও জাতিতে কৈবর্ত। বলাকে নিত্যনাথ নাকি দীক্ষা দেন নাই। দীক্ষা তাঁহার একটি ঘটনা হইতে ঘটে। ঘটনাটি বলা যাউক।

বলা ছিলেন কৈবর্তদের মধ্যে রাজার মত। সমস্ত মেঘনার উপর ছিল তাঁহার এলাকা। মারকুলির কাছাকাছি তাঁহার জলকর ছিল। তাঁহার প্রথম যৌবনেই স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। উদাসমনে তিনি একদিন নৌকায় যাইতেছেন এমন সময় বিবাহান্তে এক কন্যাকে মাতা বিদায় দিতেছেন সেই দৃশ্য দেখেন। কন্যার নৌকা সরিয়া গেলে কন্যা দাঁড়িমাঝিদের অনুনয় করিতেছেন, বাদ্যকরদের অনুনয় করিতেছেন নিঃশব্দ হইতে, কারণ মা রহিয়াছেন ঘাটে পড়িয়া, তাঁর কান্নার শব্দ শোনা যাইতেছে বাদ্যভাণ্ডের গোলমালে, ক্রমে মায়ের কান্নার শব্দ চাপা পড়িয়া আসিতেছে—

থামাইও রে ঢোল ঢুলী ভাই কাঁসির ঝন্‌ঝনি।
ধীরে ধীরে বাইও রে মাঝি যেন মায়ের কাঁদন শুনি॥

তাঁহার মনে হইল তিনিও যেন জগজ্জননীর নিকট হইতে এইভাবেই দিনের পর দিন দূরে সরিয়া যাইতেছেন। যেন এইজন্য চলিয়াছে বিশ্বচরাচরে মায়ের কান্না। দূর হইতে তবু সে কান্না শোনা যাইত। কিন্তু সংসারের নানা কোলাহলে আমরাই প্রতিদিন সেই কান্না চাপা দিতে চাই। আমাদের মনের মধ্যে ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্যই মায়ের কান্নার সুর। তাহাকে প্রতিদিন আমরা কত ভাবেই চাপা দিয়া রাখিতে পারি?

এই অন্তরবেদনার মর্ম বুঝিতে সাধক নিত্যনাথের কাছে বলা গেলেন এবং দীক্ষা চাহিলেন। সব শুনিয়া নিত্যনাথ বলিলেন, "তোমাকে আর দীক্ষা কি দিব? জগজ্জননী আপনিই সেই মাতৃবিচ্ছেদ-ব্যাকুলা কন্যারূপে আসিয়া তোমায় দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তোমার অন্তরের বেদনাই সেই দীক্ষার মন্ত্র।"

তবু বলরাম বা বলা নিত্যনাথের 'অনুরাগী' হইয়া রহিলেন এবং পরে খুব বড় সাধক হইলেন। কাজেই বলার গুরু একহিসাবে নিত্যনাথ আর-এক হিসাবে সেই কন্যা।

বাউলেরা নানা স্থানেই গুরুকে পান এবং নানাভাবেই গুরুর দীক্ষা নেন। আমার পূর্ব-কথিত ঢাকা-[illegible] বাউল দাশুর শিষ্য বল্লভ ও দুর্লভের কথা বলিয়াছি। দুর্লভ ছিলেন অতিশয় মরমী ভাবের

লোক। দুর্লভের যখন অল্প বয়স তখন তাঁহার আট-নয় বছরের এক কন্যা পৃথিবী হইতে বিদায় নিলেন। এই বিদায় নিবার সময় সেই কন্যাই যেন পরকালের দ্বার খুলিয়া পিতাকে চিন্ময় আলোক দেখাইয়া গেলেন। তাই দুর্লভ যখন দাগু বাউলের কাছে দীক্ষা চাহেন তখন দাগু বলেন, "তোমার কন্যাই তোমার গুরু। তুমি ধন্য। তুমি দীক্ষিত। বরং তুমিই আমার কাছে থাকিয়া আমাকে সেই পথ দেখাও।"

কাশীর নিতাই বাউল বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষাতেই তাঁহার বিষয়ে বলা যাউক— "দেহের কাছে দেহ রাখিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহাকে পাই নাই। মধ্যে কামনার বাধা ছিল কি না! এমনভাবে বারো-তেরো বৎসর গেল, পাওয়া হইল না। তাহার পর তিনি আমাদের ছাড়িয়া পরলোকে গেলেন। তখন ভগবানকে কহিলাম, 'এইবার তো কামনা আর নাই। এইবার তাঁহাকে পাইতে দাও।' এমন ভাবেও বারো-তেরো বছর যায়। একদিন হঠাৎ অর্ধদণ্ডের জন্য তাঁহাকে পাইলাম; আমার সব দীপ্ত হইয়া গেল।" তাই বাউলদের গানে আছে—

গুরু ব'লে কারে প্রণাম করবি মন?
তোর অথিক গুরু পথিক গুরু, গুরু অগণন।
গুরু যে তোমার বরণডালা, গুরু যে তোর মরণজ্বালা
গুরু যে তোর হৃদয়ব্যথা, (যে) ঝরায় দু'নয়ন।
কারে প্রণাম করবি মন?

যাক আবার বলরামের বাউল-ধারার কথায় ফিরিয়া আশা যাউক। বলার শিষ্য বিশা, জাতিতে ভুঞিমালী। তাঁহার শিষ্য জগা কৈবর্ত, তাঁহার শিষ্য মাধা বা মাধব পাটিয়াল বা পাটি-নির্মাতা; কেহ কেহ বলেন, বলা কাপালী। কাপালীরা চট বুনিয়া জীবিকানির্বাহ করেন। মাধার শিষ্য গঙ্গারাম নমঃশূদ্র।

ইঁহারা সবাই নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোক। কিন্তু দৃষ্টির গভীরতায় ও প্রকাশের অপূর্বতায় অতুলনীয় ইঁহাদের শক্তি। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ইঁহাদের গান দেখিয়া বলেন, "এমন সহজ, এমন গভীর, এমন সোজাসুজি সত্য এত অল্পকথায় এমন অপূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদেরও নাই। আমার তো ইঁহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমত হিংসা হয়।" তিনি নিঃসংকোচে ইঁহাদের গান তাঁহার দর্শন-সভার অভিভাষণে এবং অক্সফোর্ডের হিবার্ট-বক্তৃতায় ব্যবহার করিয়াছেন এবং নম্রভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। নানা স্থানে নানাভাবে এইসব বাউলের প্রতি তিনি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা সর্বদা প্রকাশ করিয়াছেন। গুণীদের কদর করিতে তাঁহার মত লোক জীবনে দেখি নাই।

এই গঙ্গারামের বাড়ি ছিল বিক্রমপুরের মধ্যে বাইনখাড়া গ্রামের কাছে। এখন সেইসব স্থান পদ্মাগর্ভে। ইনি আমার সমবয়সী সব বাউল হইতে পাঁচ 'পিঢ়ী' বা গুরুপরম্পরা উপরে। কাজেই ইনি প্রায় দুই শত বছরের পূর্বেকার, কারণ এই হিসাবও প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে করা। মদন বাউল ছিলেন গঙ্গারামের অতিশয় প্রিয়জন। মদনের গুরু ছিলেন গঙ্গারামের বন্ধু, যদিও বয়সে একটু বড়। গুরু ঈশান এবং শিষ্য মদন উভয়েই গঙ্গারামের বন্ধু ছিলেন।

সেই সময়ে বিক্রমপুরের ধলছত্র, রূপঠা, ধামারণ, রাজাবাড়ি প্রভৃতি স্থানে বাউলদের খুব বড় বড়

আড্ডা ছিল। ধলছত্র হইতে এক শাখা পরে আবতুলাপুরে, আর-এক শাখা দক্ষিণ সাহাবাজপুরে গিয়া আখড়া করে।

শ্রীহট্টে বিথঙ্গলের জগমোহিনী সাধনার প্রভাবে ও বলার প্রভাবে মেঘনার তীরে বহু বাউল-আখড়া জমিয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে ডিল্লী ভয়রা প্রভৃতি মঠকে অষ্টগ্রামী সমাজ বলে। এই সমাজেরই এক শাখা পরে স্থান করে ঢাকা জেলার পাঁচদোনার নিকটে নরসিংদী গ্রামে। বিশাল মেঘনা নদীর তীরে এই নরসিংদী আখড়ায় প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে নদেরচাঁদ নামে এক বাউল আসেন; তিনি খুব সমর্থ সাধক ছিলেন। তাঁহার শিষ্য বেঙ্‌গা বাউল ও বেঙ্‌গার শিষ্য যতীন বাউলকে আমি জানি। নদের চাঁদের কথাও আমি শুনিয়াছি। নদীর তীরে ও বিশাল মাঠের পারেই বাউলিয়া ভাব জমে। সেখানে প্রকৃতিও ইহাদের উদার ও উদাস করে।

উত্তরবঙ্গে নীলফামারীর কাছে কমলকুমারী মাঝবাড়ী মধ্যমা প্রভৃতি কয়েকটি বাউল-সম্প্রদায় আছে। গোঁড়া মুসলমানদের উৎপীড়নে তাঁহাদের অনেককে পরে সম্প্রদায়ী মুসলমান করা হইয়াছে। উৎপীড়ন যে কিরূপ তাহা 'বাউল বিধ্বংস ফতোয়া' দেখিলেই বুঝা যায়। তবু উত্তরবঙ্গের বাউলদের অনেক খবর আমি নীলফামারীর কবিরাজ বসন্তকুমার লাহিড়ীর কাছে পাইয়াছি। তিনি যদি এখনও জীবিত থাকেন তবে কিছু খবর দিতে পারেন।

বাউল সমাজের প্রভাবে মেঘনার তীরে ত্রিপুরা জেলায় ওরাইলের আখড়ার কাছে রাণীদিয়া গ্রামে আম্বর আলি প্রভৃতি সমর্থ বাউল সাধকের অভ্যুদয় ঘটে। আম্বর আলির উপরও বহু অত্যাচার গিয়াছে। কিন্তু তিনি নির্ভীক পুরুষ। তাঁহার শিষ্য হইতে হইলে সব সম্পত্তি বিতরণ করিয়া আসিতে হইত। মুসলমান সাধনার্থীকে দীক্ষার পূর্বে সাতদিন নিজ গ্রামের জুম্মা-মসজিদে, সাতদিন গ্রামের হাটে, সাতদিন গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া ঘোষণা করিতে হইত 'আমি সরা (মুসলমান শাস্ত্রবিধি) মানি না'। এমনভাবে বাছাই-করা নির্যাতনে-অটল সাধনার্থী না হইলে তিনি সাধনা দিতেন না।

এইসব অত্যাচার সাধকদের উপরে ঘটে বলিয়াই আমি এতকাল বাউলদের স্থান ও আখড়ার খবর সকলকে দিতে পারি নাই। আমি এই বাউলদের খবর কোথাও কোথাও বলার পরে ইহাদের উপরে অনেক অত্যাচারও গিয়াছে। তবু কেহ কেহ যে কয়টি বাউল-স্থানের সন্ধান দিয়াছেন, সবই আমার দেওয়া খবর হইতে। কারণ না বুঝিয়া ঘটনাক্রমে পূর্বে কিছু কিছু খবর আমি দিয়াছিলাম।

আর-একটি বিপদও আছে। বীরভূম জেলার কেন্দুলী এতকাল বাউলদের একটি মিলনের স্থান ছিল। এখানে পৌষসংক্রান্তিতে জয়দেবের স্মরণার্থ এক মেলা বসে, তাহাতে বহু বাউল আসিতেন। তাঁহারা কেন্দুলীতে মন্দির বা তীর্থস্থানে স্নান-পূজা করেন না, তবে নিজেরা মিলিয়া খুব উৎসব করেন। সেখানে নিত্যানন্দ দাস নামে এক বাউল আসিতেন। তাঁহার সহিত আমার খুব প্রীতি ছিল। তাঁহার গুরু ছিলেন মণিমোহন। মণিমোহনের আখড়া ছিল খানা জংসনের নিকট কেতনা গ্রামে। এইরূপে দাঁইহাটে গোপীনাথের মেলাতেও বহু বাউল একত্র হইতেন। বাঁকুড়া সোনামুখী এবং মানভূমের ধাতরা প্রভৃতি স্থানেরও বাউল-সমাজ আছে। এইসব 'আস্থানা' পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের। উত্তরবঙ্গে রাজসাহীর নিকট প্রেমতলী বা খেতুরের বার্ষিক মহোৎসব-মেলাতেও বহু বাউলের সমাগম ঘটে।

এইসব স্থানের খবর পাইয়া বহু 'গবেষণা'-রত বিদ্বজ্জনের সেখানে ভীষণ সমাগম ঘটে। তাঁহাদের

পেন্সিল-খাতার অত্যাচারে অনেক বাউল বিব্রত হইয়াছেন। কেন্দুলীর নিত্যানন্দ দাস তো একদিন আমাকে বলেন, "বাবা, বৎসরান্তে এখানে আসিতাম। কিন্তু তোমাদের পিস্তলের মত পেন্সিল উঁচানো দেখিয়া স্থানটা ছাড়িতে হইল।" আসলে ধীরভাবে ইঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া ইঁহাদের জীবন ও বাণী নিঃশব্দে সংগ্রহ করাই আমাদের উচিত। আমরা চাই সব সংক্ষেপে সারিতে, এইজন্য অত সময় দিতে আমরা নারাজ। তাই আমরা হঠাৎ হুড়মুড় করিয়া পড়ি, প্রশ্নে-প্রশ্নে তাঁহাদের ব্যাকুল করি। তাহাতে সাধকদের সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে।

এই প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দিয়া লই। আমার সংগৃহীত বাউল-বাণী আমি প্রকাশ করি নাই, ইহা লইয়া অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন। আমারও কিছু বলিবার আছে। আমি তো সাহিত্যিক হিসাবে এই বাউলগান-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই নাই। আমার প্রধান প্রয়োজন ছিল আমার নিজের অধ্যাত্ম অভাব ও ক্ষুধা। এই সংগ্রহের কাজে আমি কোনো সাহিত্যিক বা বিদ্বৎসমাজের কোনো সহায়তাও লই নাই, তাই আমার সেই দিক হইতে দায়িত্বও কম। আমি যেসব সাধকদের কাছে সংগ্রহ করি তাঁহারাও চাহেন এইসব বাণী লইয়া সাধকের সাধনাই চলে। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচার তাঁহারাও চাহেন না। আমি একজন বাউলকে তাঁহাদের এই গোপনতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "বাছা, ইহা তো সাহিত্য নয়, ইহা আমাদের অন্তরঙ্গ প্রাণবস্তু, আপন আত্মজা। যদি কেহ আমার কন্যাকে এই বলিয়া প্রার্থনা করেন যে 'তাঁহাকে লইয়া আমি গৃহী হইব', তবে সে ক্ষেত্রে আমার দেওয়াই উচিত। সেই দেওয়াতে আমি ধন্য, তিনি ধন্য, আমার আত্মজাও ধন্য। কিন্তু কোনো লোক শুধু ক্ষণিক রসাস্বাদন-সুখের জন্য যদি আমার আত্মজাকে চাখিয়া দেখিতে চাহে তবে প্রার্থয়িতাও অধন্য, আমিও অধন্য, আত্মজাও অধন্য। এইসব বাণী সাহিত্যরসের আস্বাদনের জন্য নহে। ইহা সাধনার জন্য। হয়তো ইহাতে সাহিত্যরসও আছে, কিন্তু তাহা তো মুখ্য লক্ষ্য নহে। তাই ইহা আমরা প্রচার করি না। তবে সাধনার্থী জন সাধনার জন্য চাহিলে কখনো প্রত্যাখ্যান করি না। কিন্তু দেখিয়া লই যে ইঁহার এই প্রার্থনা সাচ্চা কি না।"

এইসব কারণে বহু স্থানে সংগ্রহ করিলেও আমার গুরুস্থানীয় বাউল সাধকদের কাছে আমি বাণীগুলি প্রকাশের অনুমতি পাই নাই। তবু যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল তখন বন্ধুবর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমার এইসব সংগ্রহের খবর কবিগুরুকে দিলেন। তিনি সাগ্রহে ধরিলে তাঁহাকে দেখাইলাম। তিনি সব দেখিয়া অনেকদিন ধরিয়া নানাভাবে ভাবিয়া দেখিলেন, পরে আমাকে বলিলেন, "দেখুন, যেগুলি প্রকাশে বাধা নাই অন্ততঃ সেগুলি আগে বাহির করুন। পরে অন্যগুলির জন্য প্রকাশের অনুমতি লইবার চেষ্টা করিবেন।"

প্রবাসীতে 'হারামণি' নামে দুই-একটি করিয়া গান তখন (১৩২২ সাল) হইতে বাহির হইতে লাগিল। হঠাৎ শুনিলাম কেহ কেহ বলিতেছেন, এইগুলি এত ভালো যে তাহা নিরক্ষরদের রচনা হইতে পারে না। ইহা এখনকার শিক্ষিত লোকের রচনা। রবীন্দ্রনাথ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "শিক্ষিত লোকের ক্ষমতা তো আমার অজানা নাই। এইসব জিনিস যে তাঁহাদের রচনার শক্তির বাহিরে তাহা আমি খুবই বুঝি। একটা গান পাইলে হয়তো তাঁহারা কতক অনুরূপ আর-একটা নকল করিতে পারেন; কিন্তু মূলটা রচনা করা কোনো শিক্ষিত লোকের কর্ম নয়। অন্ততঃ আমার তো তাহার কাছাকাছি শক্তিও নাই।"

ইহার পর আমি নিজে আর বাউল বাণী বাহির করি নাই, যদিও তাহা সাজাইয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রায় চল্লিশ বৎসর এগুলি শুধু নিজের কাছেই রাখিয়া নিজেই আলোচনা করিয়াছি, কখনো বন্ধুবান্ধবদের দেখাইয়াছি এবং আমার অন্তরের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছি, যে জন্য আমার এই সংগ্রহ। পরে রবীন্দ্রনাথ ও চারুচন্দ্রকে তাঁহাদের দায়িত্বে দুই-একটি বাণী প্রকাশ করিবার জন্য আমার খাতাগুলি দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ দর্শন-সভায় তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে (Philosophy of Our People) তাহা ব্যবহার করিয়াছেন। চারুচন্দ্র তাঁহার বঙ্গবীণাতে[২] আমার সংগ্রহ হইতে কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ধন্য আমি বাঁশিতে তোর আমার মুখের ফুঁক (৭৮নং); নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজ্‌বি আগুনে (১২৩নং); আমি মজেছি মনে (১৩১নং); পরাণ আমার সোতের দীয়া (১৩২নং); আমি মেলুম না নয়ন (১৩৬নং); তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে (১৩৮নং); চোখে দেখে গায়ে ঠেকে (১৩৯নং); আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে (১৪২নং); হৃদয়কমল চল্‌তেছে ফুটে (১৪৪নং)।

এই নয়টি গানের মধ্যে বঙ্গবীণার 'আমি মেলুম না নয়ন' গানটি আমার খাতায় যাহা আছে তাহা হইতে একটু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। ইহার মূল-গানটি নমঃশূদ্র গঙ্গারামের এক শিষ্যের রচনা। হয়তো রচয়িতা কৃষ্ণকান্ত পাঠক। কৃষ্ণকান্ত মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং কথক ছিলেন। গঙ্গারামের কাছেই অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য পাইয়া কথকতাতে তিনি মহাশক্তিশালী হইয়া ওঠেন। কৃষ্ণকান্তের শিষ্য গুরুনাথ ও চন্দ্রকুমারও কথক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যেও বাউলিয়া ভাবের সম্পদ ছিল। গঙ্গারামের প্রভাবে পরে রাধানাথ ধোপা মস্ত কীর্তনীয়া হন। তাঁহারই প্রভাবে গোবিন্দ কীর্তনীয়াও কীর্তনে গভীর শক্তিলাভ করেন। শুনিয়াছি লালনের প্রভাবেই নাকি কীর্তনীয়া শিবুরও এত শক্তি হইয়াছিল।

নিম্নজাতির বাউলদের দুই-একজন ব্রাহ্মণ শিষ্যও দেখা দিয়াছে। কাশীতে ছকু ঠাকুর নামে একজনকে দেখিয়াছি, তিনি যেসব গান করিতেন তাহার কিছু অনুবাদ হিবার্ট-লেকচারে গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ছকু ঠাকুরের গানের অতিশয় সমাদর করিতেন।

বঙ্গবীণার 'ধন্য আমি বাঁশীতে' (৭৮নং) এবং 'আমি মজেছি মনে' (১৩১নং) ঈশান যুগীর রচনা। তিনিই মদন বাউলের গুরু। জাতিতে ঈশান ছিলেন যুগী। 'নিঠুর গরজী' (১২৩নং) ও 'তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে' (১৩৮নং) গান দুইটি মদনের। অপূর্ব তাঁহার রচনা।

মদনের জন্ম মুসলমান বংশে। ঈশানের তিনি শিষ্য, নমঃশূদ্র গঙ্গারামের তিনি বন্ধু। 'পরান আমার' (১৩২নং), 'চোখে দেখে গায়ে ঠেকে' (১৩৯নং) এই গান দুইটি গঙ্গারামের রচনা। গঙ্গারাম নমঃশূদ্র জাতীয় অতি সমর্থ সাধক ছিলেন। 'আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে' (১৪২নং) গানটি কেঁদুলীতে পাওয়া। গায়ক বাউলটি ছিলেন মেদিনীপুরের; পদটি পদ্মলোচনের। পদ্মলোচন ছিলেন নরহরি বা গোসাঞিদাসের শিষ্য। 'হৃদয়কমল চল্‌তেছে ফুটে' (১৪৪নং), ঢাকা জেলার রাজাবাড়ির দাণ্ড বাউলের আখড়ায় দুর্লভ হইতে পাওয়া: ইহার রচয়িতা বিশা ভুঁইমালী; বিশা হইলেন কৈবর্ত বলরাম বাউলের শিষ্য।

প্রচারের জন্য বাউলদেরও কোনো আগ্রহ নাই। তাহার কিছু কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। এইসব

---

২ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১৯৩৪

পদ সাধনার জন্য, সাহিত্যের জন্য নয়। সাহিত্য অর্থই পুরাতন সব সংগ্রহ। এই সংগ্রহের উৎসাহ বাউলদের নাই। পুরাতনের সংগ্রহ পুঁথির চেয়ে নূতন জীবন্ত সত্যকে বাউলেরা বিশ্বাস করেন। তাই তাঁহারা শাস্ত্রাদির সংগ্রহকে মান্য করেন না। তাঁহারা বলেন, "পুরাতন যেসব উৎসব গিয়াছে এইসব শাস্ত্র তো তাহার উচ্ছিষ্ট মাত্র। আমরা কি কুকুর, যে এই এঁটো পাতা চাটিব? প্রয়োজন হয় নূতন নূতন উৎসব করিব। ভগবানের কৃপায় নূতন নূতন অন্ন আসিবে।" সত্য সত্যই তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যতদিন বাণীর প্রয়োজন ততদিনই জগতে নব নব বাণী আসিবে, অভাব হইবে না। এই বিশ্বাস হারাইয়াই মানুষ কুকুরের মত এঁটো পাতা সংগ্রহ করিয়া রাখে। কুকুরেরাও পুরাতন পাতা একদিন-না-একদিন ছাড়ে। মানুষ আরও অধম। এঁটো পাতার কোন্‌টা কত পুরাতন তাই দেখাইয়াই তাহাদের গর্ব। বাউলদের গানে আছে— 'বাসি মিছা হয় না সাচা'।

বাউলদের কাছে কোনো প্রশ্ন করিলে তাঁহারা সাদা কথায় বড় একটা উত্তর দেন না। উত্তর দেন গানে। কত গানের ভাণ্ডারই যে তাঁদের আছে! আর ঠিক-মত তাহা তাঁহাদের মনেও আসে। গান কেন করেন, কথায় কেন বলেন না জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—

> আমরা পাখীর জাত।
> আমরা হেঁটে চলার ভাও জানি না, আমাদের উড়ে চলার ধাত।

এইসব বহু গানে ভণিতা পাই। অনেক রচয়িতার নামও জানা নাই। একবার আমি এক বৃদ্ধ বাউলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এরূপ ভাবে রচয়িতাদের ভুলিয়া যাওয়া কি ভালো?"

তিনি তখন কিছু বলিলেন না। একটু পরে খাল ও নদীর দিকে দেখাইলেন। তখন ভাঁটা। খালে জল ছিল কম, কাদায় সব নৌকা ঠেকিয়া আছে। দুই একখানা ঠেকা-নাও ঠেলিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। অথচ তখন পদ্মার বুক দিয়া ভরাজলে ভরাপালে নৌকা চলিয়াছে।

আমাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে নদীর নাও ভরাপালে চলিয়াছে, ইহাদের কি পথচিহ্ন কিছু আছে? আর ঐ ঠেকা-নাওয়ের পথই কাদায় কাদায় আঁকা রহিল। ইহার কোনটি সহজ ও স্বাভাবিক? আমরা সহজ পথের পথিক, আমরা এই কৃত্রিম পথচিহ্ন রাখিয়া যাওয়াকে বড় মনে করি না।"

ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের ইতিহাসই বা কি? মানবসমাজ-রচয়িতাদের আমরা জানি না, জানি বড় বড় নরহন্তাদের পরিচয়। আমাদের শাস্ত্র ও জ্ঞান সবই কৃত্রিম, সহজ সত্য তাহাতে ধরা পড়িবে কেন?

সহজের কথা বলিতে বলিতেই বাউলদের বিষয়ে আলোচনা এখনকার মত সমাপ্ত হউক। বাউল-তত্ত্বের বড় বড় মর্ম হইল, কায়াযোগ শূন্যযোগ অনুরাগতত্ত্ব সহজতত্ত্ব প্রভৃতি। তাহার মধ্যে সহজের কথা প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তৃতায় কিছু কিছু বলিয়াছি। এই বক্তৃতায়ও কিছু বলা গেল। তবু আরও দুই-একটা কথা বলা দরকার।

বাউলেরা মনে করেন সহজই হইল শান্ত ও স্বাভাবিক। ঝড় উঠিলে কতক্ষণ প্রকৃতি তাহা সহিতে পারে? সহজ শান্ত ও সর্বগত শক্তিই শাশ্বত। কাম হইল কৃত্রিম ও অশান্ত, তাই ক্ষণিক। সহজই হইল নিষ্কাম শান্ত ও চিরন্তন। ভগবান সহজ তাই তাঁহার শব্দ নাই প্রকাশ নাই।

বৃদ্ধ ঈশান বাউলকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কি ? ঈশান গাহিলেন—

আমার সাঁই নয়তো ভাঙ্গা চাকা যে বলবে ক্ষণে ক্ষণে।· ·
বল নীরব গুরু সাঁই, কোন সাধনে বাহির হলে ব্রহ্ম কমল পাই ?
(চলে) চন্দ্রতারা, নিত্যধারা, কোনো শব্দ নাই।· ·

বিশ্বজগতের বিরাট আকাশে গ্রহচন্দ্রতারায় প্রতিক্ষণের যাত্রায় কোথাও শব্দ নাই, ঘোষণা নাই। অথচ গো-গাড়ির 'ভাঙা-চাকা' বলে ক্ষণে ক্ষণে। বিশাল প্রকৃতির এই নীরবতাই ইহার স্বাস্থ্য ও সহজ শক্তির পরিচয়। দেহের মধ্যে প্রাণও তেমনি সহজ, তাহার কোনো ঘোষণা বা বেদনা নাই। বেদনার অর্থ প্রকাশ, প্রকাশ মাত্রেই কৃত্রিম, তাই বেদনায় বা যন্ত্রণায় ভরা। দেহের মধ্যেও প্রাণ হইল সহজ, তাহার কোথাও বেদনা নাই। বেদনা হইলেই অস্বাস্থ্য সূচিত হয়। তাহা সহজ নহে।

এই সহজ বুঝিতে পারি না বলিয়া ইহার মূল্য কম নহে। নিদ্রা বা সুষুপ্তিও তো আমরা বুঝিতেই পারি না, অথচ তাহাই আমাদের বাঁচাইয়া রাখে। আমার সুষুপ্তিরই মতো আমার সহজও চিরদিনই আমার জ্ঞানের অতীত, অথচ তাহাই আমার নিত্য ও শাশ্বত জীবনের অমৃতরস। এই রসই সহজের, এই শাশ্বত অমৃতই বাউলের সাধনার ধন।

[সমাপ্ত

পরান আমার সোতের দীয়া— আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে।
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার আন্ধার নিশুইত ঢালা—
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা গো।
তার তলেতে কেবল চলে নিশুইত রাতের ধারা ;
সাথের সাথী চলে বাতি নাই গো কূল-কিনারা।—
দিবারাতি চলে গো— বাতি জ্বলে সাথে সাথে গো।
দরিয়ার সাগর ওগো অকূলের কূল-সখা
আর কয় বাঁকে, কেমন ডাকে, পাইমু গো দেখা।
তোমার কোলে লইবা তুলে জুড়াইমু জ্বালা।
তোমার বুকে নিবুম সুখে জুড়াইমু জ্বালা।

—বাউল গঙ্গারাম

বাল্মীকি ও কালিদাস

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

পূর্ব এক প্রবন্ধে[১] কালিদাসের উপমার সহিত মহর্ষি বাল্মীকির উপমার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু শুধু উপমার জন্যই কালিদাস বাল্মীকির নিকট ঋণী নহেন। বর্ণনা এবং ভাব— এই উভয়ের জন্যও কালিদাস বাল্মীকির রামায়ণের নিকট কি পরিমাণে ঋণী ছিলেন, তাহা একটু তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। আমরা প্রধানতঃ মেঘদূতের বিষয়েই আলোচনা করিব।

১

মেঘদূত কালিদাসের এক অপূর্ব সৃষ্টি— ইহা বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলীই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কালিদাসের পূর্বে, জড়প্রকৃতির নিকট দৌত্যের আবেদন লইয়া যে কোনও সচেতন প্রাণী উপস্থিত হইতে পারে, এবং সেই দৌত্য লইয়া যে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা যাইতে পারে— ইহা হয়তো কোনও কবির কল্পনায় উদিত হয় নাই। কালিদাসই 'দূতকাব্যে'র অন্যতম প্রাথমিক আবিষ্কর্তা এবং বহু খ্যাতনামা কবি, যদিও তাঁহারই প্রদর্শিত সরণি অনুসরণ করিয়া শত শত দূতকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তথাপি কালিদাসের 'মেঘদূতে'র কাব্যসুষমা ও রসসম্ভার আজও পর্যন্ত অতুলনীয় আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু কালিদাস যে পরোক্ষভাবে এই দৌত্যের পরিকল্পনা 'রামায়ণ' হইতেই পাইয়াছিলেন, তাহা দক্ষিণাবর্তনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সকল টীকাকারই উল্লেখ করিয়াছেন।[২] এমন কি, দক্ষিণা-বর্তনাথ এই ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে বিরহী যক্ষ এবং অলকাবাসিনী যক্ষপত্নী রামচন্দ্র এবং সীতাদেবীরই কবিকল্পিত প্রতিনিধি!—

> ইহ খলু কবিঃ সীতাং প্রতি হনুমতা হারিতং সন্দেশং হৃদয়েন
> সমুদ্বহন্ তৎস্থানীয়নায়কাদ্যুৎপাদনেন সন্দেশং করোতি।[৩] —মেঘদূত-টীকা ১.১

মেঘদূতের পরিবেশটি কেমন? প্রথমেই দেখি, বিরহী যক্ষ রামগিরি পর্বতের শৃঙ্গদেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বর্ষাকাল সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, উপরে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাজি গিরিসানুদেশে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে, মনে হইতেছে যেন মদমত্ত হস্তী বপ্রক্রীড়ায় মাতিয়াছে। শিখরের চতুষ্পার্শ্বে কুটজ-বৃক্ষ পুষ্পসম্ভারে

---

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

২ তুলনীয়: 'সীতাং প্রতি রামস্য হনুমৎসন্দেশং মনসি নিধায় মেঘসন্দেশং কবিঃ কৃতবান্—ইত্যাহুঃ।' —মল্লিনাথ. টীকা. ১.১। কালিদাস স্বয়ং হনুমৎসন্দেশের উল্লেখ করিয়াছেন—"ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা"—ইত্যাদি।

৩ পরবর্তী টীকাকার পূর্ণসরস্বতী তাঁহার 'বিদ্যুল্লতা' টীকায় দক্ষিণাবর্তনাথের এই অভিমতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন— "কবের্যক্ষবৃত্তান্তে সীতারামবৃত্তান্তসমাধিরস্তীতি কেচিৎ, তন্ন সহৃদয়-হৃদয়সংবাদায় প্রয়োজনাভাবাৎ; কবিনৈব 'জনকতনয়াস্নান—' ইতি 'রঘুপতিপদৈঃ—' ইতি চ অত্যন্ততটস্থতয়া প্রতিপাদিতত্বাৎ, উপরি চ 'ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা' ইত্যত্র উপমানতয়া প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ, উপমেয়স্যার্থস্য অর্থভেদঃ কণ্ঠোক্ত ইতি।' —পৃ. ৭ (বাণীবিলাস প্রেস সংস্করণ)।

সম্বন্ধ। যক্ষ একাকী সেই প্রত্যগ্র পুষ্পরাজি চয়ন করিয়া মেঘের প্রতি অঞ্জলি নিবদ্ধ করিয়া তাহার কাছে দৌত্য প্রার্থনা করিতেছে। পরিবেশটি কালিদাসের প্রতিভারই অনুরূপ সৃষ্টি।—

স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার॥

কিন্তু রামায়ণে কি আমরা অনুরূপ চিত্রই দেখিতে পাই না? বালিবধের পর রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে পর্বতগুহায় কালযাপন করিতেছেন, শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—কখনও প্রস্রবণগিরির শিখরে, কখনও বা মাল্যবান্ পর্বতের সানুদেশে। বর্ষাকাল সমাগত, চতুর্দিকে কুটজকুসুম প্রস্ফুটিত, ককুভতরুপংক্তি পর্বতশিখর মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

কচিদ্ বাষ্পাভিসংরুদ্ধান্ বর্ষাগমসমুৎসুকান্।
কুটজান্ পশ্য সৌমিত্রে! পুষ্পিতান্ গিরিসানুষু॥
মম শোকাভিভূতস্য কামসন্দীপনান্ স্থিতান্॥[৪]
—কিষ্কিন্ধ্যা ২৮. ১৪

পশ্য চন্দনবৃক্ষাণাং পংক্তীঃ সুরুচিরা ইব।
ককুভানাঞ্চ দৃশ্যন্তে মনসৈবোদিতাঃ সমম্॥[৫]
—কিষ্কিন্ধ্যা ২৭. ২৪

রামচন্দ্র বলিতেছেন—"লক্ষ্মণ! দেখ দেখ! বর্ষার নববারিধারা-সম্পর্ক বশতঃ নিদাঘসন্তপ্তা ভূমি উষ্ণবাষ্প ত্যাগ করিতেছে"—

এষা ঘর্ম-পরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি।—কি°. ২৮. ৭

মেঘদূতেও যক্ষ মেঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তি-শ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্॥[৬]

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—"দেখ দেখ! মানসবাসলুব্ধ চক্রবাকসমূহ প্রিয়াসমভিব্যাহারে উড়িয়া চলিয়াছে!"—

সম্প্রস্থিতা মানসবাসলুব্ধাঃ প্রিয়ান্বিতাঃ সম্প্রতি চক্রবাকাঃ॥ —কি°. ২৮. ১৬

মেঘদুতে যক্ষও বলিতেছে—"হে মেঘ! মানসোৎক রাজহংসমালা গগনপথে তোমার সহায় হইবে"—

তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ।
আকৈলাসাদ্ বিসকিশলয়চ্ছেদসম্পর্করম্যাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ॥
—পূর্বঃ ১১

---

৪ আবার: "শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপানপংক্তিভিঃ।
কুটজার্জুনমালাভি-রলঙ্কর্তুং দিবাকরঃ॥" —কিষ্কিন্ধ্যা. ২৮. ৪

৫ 'মেঘদূতে' ও সেই ককুভতরুরাজি—উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে। —পূর্বমেঘ ২২

৬ কুমারসম্ভবের ৫ম সর্গে পার্বতীর তপস্যার বর্ণনায়ও এই ভাবটির পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই—
নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্নিনা নভশ্চরেণেন্ধনসম্ভৃতেন সা।
তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতা নবৈ-র্ভুবা সহোষ্মাণমমুঞ্চদূর্ধ্বগম্॥

আবার, রামায়ণে রামচন্দ্র বলিতেছেন—"মেঘসমূহ সলিলাতিভারবশতঃ যেন পরিশ্রান্ত হইয়া গর্জন করতঃ পর্বতের শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে লগ্ন হইয়া বিশ্রাম করিতে করিতে আকাশপথ অতিক্রম করিতেছে"—

সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং
বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং
বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি॥ —কি°. ২৮. ২২

কালিদাস 'মেঘদূতে' রামায়ণশ্লোকের ভাবটুকু হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন—

খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র।— পূর্বঃ ১৩

আবার—

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং[৭] সাধু মূর্দ্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ॥ — পূর্ব° ১৭

'ককুভসুরভি' প্রত্যেক পর্বতশৃঙ্গে মেঘের কালক্ষেপ হইবে—

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে।— পূর্ব° ২২

'নীচাখ্য' গিরিকূটে মেঘ বিশ্রাম লাভ করিবে—

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রান্তিহেতোঃ—পূর্ব°. ২৫

মেঘদূতে যক্ষ মেঘকে বলিতেছে : "গগনপথে তুমি যখন অলকাভিমুখে যাত্রা করিবে, তখন বলাকাপংক্তি আবদ্ধমালা হইয়া তোমার সহিত গমন করিবে"—

গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥ —পূর্ব°. ৯

রামায়ণে ইহারই অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই—

মেঘাভিকামা পরিসম্পতন্তী
সম্মোদিতা ভাতি বলাকপংক্তিঃ।
বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী
লম্বেব মালা রুচিরাম্বরস্য॥

উভয় বর্ণনাই হুবহু এক !

ঋতুসংহারে বর্ষাপ্রকৃতির বর্ণনার সহিত পূর্বমেঘের বর্ণনার যদি তুলনা করা হয়, তবে একটি বিষয় নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয়। উভয় বর্ণনাই রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষাসমাগমে বিরহখিন্ন রামচন্দ্রের বিলাপকে উপজীব্য করিয়া রচিত হইয়াছে। তবে ঋতুসংহারের কবি এখনও নবীন, এখনও 'পরিণতপ্রাজ্ঞ' হইয়া উঠেন নাই, তাই রামায়ণের ভাব, ভাষা এবং ছন্দঃ পর্যন্ত[৯] অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন; কোনও কোনও স্থলে শ্লোকগুলিও প্রায়ই অভিন্ন, দুই একটি পদের পরিবৃত্তিসাধন করা হইয়াছে মাত্র। পূর্বমেঘের কবির শিল্পপ্রতিভা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাই রামায়ণের বর্ণনাকে তিনি স্বকীয় প্রতিভার স্পর্শে রূপান্তরিত করিয়াছেন, তাঁহার সমকালীন আর্যাবর্তভূভাগের বাস্তবজীবনের বিচিত্র

৭ রামায়ণেও দেখিতে পাই মেঘরাজি নববারিধারাবর্ষণে দাবাগ্নিদগ্ধ পর্বতশিখরসমূহ সিক্ত করিতেছে—"নীলেষু নীলা নববারিপূর্ণাঃ। মেঘেষু মেঘাঃ প্রতিভান্তি সক্তাঃ। দবাগ্নিদগ্ধেষু দবাগ্নিদগ্ধাঃ। শৈলেষু শৈলা ইব বদ্ধমূলাঃ॥" —কি°, ২৮. ৪০.

৮ তুলনীয় : ঋতুসংহার. ২. ২১

৯ বংশস্থবিলবৃত্ত।

অভিজ্ঞতার সহিত মেঘের কাল্পনিক দৌত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পূর্বমেঘকে কল্পনা ও বাস্তবের এক অপূর্ব লীলাভূমিতে পরিণত করিয়াছেন।

দক্ষিণাবর্তনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া মল্লিনাথ প্রভৃতি পরবর্তী টীকাকারগণ পূর্বমেঘের দ্বিতীয় শ্লোকের 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' পাঠটি লইয়া বহু গবেষণা ও বৈতণ্ডিকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তারিখ লইয়া বিবাদ করিতে গিয়া কালিদাসের মূল উপজীব্য অর্থ টুকুই বিস্মৃত হইয়াছেন। দশ দিন বেশী হইল, কি কুড়ি দিন কম হইল, ইহা লইয়া কালিদাস যে খুব বেশী বিব্রত ছিলেন, তাহা তো মনে হয় না।[১০] টীকাকারগণের এই শূন্যগর্ভ বিবাদ দেখিয়া মল্লিনাথের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

ইত্যাহো মূলচ্ছেদী পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষঃ।

তবে, কালিদাস যক্ষের এই 'বর্ষভোগ্য' শাপের অবশিষ্ট চারি মাসের কথা কেন তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করিতে গেলেন, এবং আষাঢ়ের 'প্রথম' দিবসেই বা কেন যক্ষ মেঘের প্রতি তাহার সন্দেশ নিবেদন করিতে গেল? এই প্রশ্নের উত্তর রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রের বিলাপোক্তিতে পাওয়া যাইবে।

বালিবধের পর রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহায়তায় সীতান্বেষণের জন্য, রাবণবধের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আকুল হইলে কি হয়? বর্ষাকাল আগত, বর্ষাকালে যুদ্ধযাত্রা অসম্ভব, আবার শরৎকাল যতক্ষণ না ফিরিয়া আসিতেছে, ততক্ষণ তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবেই। তাই দেখি, বালিবধের পর রামচন্দ্র হনুমান্‌কে বলিতেছেন—

পূর্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ॥
নায়মুদ্যোগসময়ঃ প্রবিশ ত্বং পুরীং শুভাম্।
অস্মিন্ বৎস্যাম্যহং সৌম্য পর্বতে সহলক্ষ্মণঃ॥
ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা।
প্রভূতসলিলা সৌম্য প্রভূতকমলোৎপলা॥
কার্ত্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং রাবণবধে যত।
এষ নঃ সময়ঃ সৌম্য প্রবিশ ত্বং স্বমালয়ম্॥ —কি°. ২৬. ১৪-১৭

আবার, রামচন্দ্র যখন সীতাদেবীর কথা স্মরণ করিয়া, উদীয়মান চন্দ্রবিম্বের দর্শনে পীড়িত হইয়া বীতনিদ্র অবস্থায় বর্ষারজনী অতিবাহিত করিতেছেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিতেছেন—

শরৎকালং প্রতীক্ষস্ব প্রাবৃট্‌কালোঽয়মাগতঃ।
ততঃ স্বরাষ্ট্রং সগণং রাবণং ত্বং বধিষ্যসি॥—কি° ২৭-৩৯
নিয়ম্য কোপং পরিপাল্যতাং শরৎ।
ক্ষমস্ব মাসাংশ্চতুরো ময়া সহ॥ —কি° ২৭-৪৮

---

১০ বল্লভ তাঁহার টীকায় 'প্রশমদিবসে' এই পাঠটি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে 'প্রশমদিবসে' পাঠটির উদ্ভবের মূলে আছে 'থ'-কার ও 'শ'-কারের লিপিসাদৃশ্য! তুলনীয়: "কেচিত্তু শকার-থকারয়ো-লিপিসারূপ্যমোহাৎ 'প্রথম'-ইত্যূচুঃ। কথং কথমপি চৈতমেবার্থং প্রতিপন্নাঃ। বর্ষাকালস্য প্রস্তুতত্বাৎ আদিদিনম্—ইত্যেতত্তু অতীব বিরুদ্ধম্।" মল্লিনাথ 'প্রশমদিবসে' পাঠের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইতেছেন: "কথং তর্হি 'শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ'—ইত্যাদিনা ভগবৎ প্রবোধাবধিকস্য শাপস্য মাসচতুষ্টয়াবশিষ্টস্য উক্তিঃ। দশদিবসাধিক্যাদিতি চেৎ। স্বপক্ষেঽপি কথং সা বিংশতি-দিবসৈ-র্ন্যূনত্বাদ্ ইতি সন্তোষ্টব্যম্। তস্মাদীষদ্‌বৈষম্যমবিবক্ষিতম্ ইতি সুষ্ঠূক্তং 'প্রথমদিবসে' ইতি॥"—পরবর্তী টীকাকার পূর্ণসরস্বতী তারিখগণনা লইয়া কোনও বিবাদের অবতারণা না করিয়া নিজের সূক্ষ্ম রসবোধেরই পরিচয় দিয়াছেন। টীকাশেষে পূর্বগামী টীকাকারগণের প্রতি পূর্ণসরস্বতীর বিদ্রূপপূর্ণ শ্লোকটি উদ্ধার করিবার যোগ্য—"শুকবিবচসি পাঠানন্যথাকৃত্য মোহাদ্। রসগতিমবধূয় প্রৌঢ়মর্থং বিহায়। বিবুধবরসমাজে ব্যাক্রিয়াকামুকানাং। গুরুকুলবিমুখানাং ধৃষ্টতায়ৈ নমোঽস্তু॥"—পৃ. ১৭৩

লক্ষ্মণের বাক্যে রামচন্দ্র আশ্বস্ত হইয়া বলিতেছেন—

> এষ শোকঃ পরিত্যক্তঃ সর্বকার্য্যাবসাদকঃ ॥ শরৎকালং প্রতীক্ষিষ্যে স্থিতোঽস্মি বচনে তব ।
> বিক্রমেষ্বপ্রতিহতং তেজঃ প্রোৎসাহয়াম্যহম্ ॥ —কি° ২৭-৪৩-৪৪

"এই আমি শোক পরিত্যাগ করতঃ বিক্রম অবলম্বন করিলাম ; তোমার কথামত আমি শরৎকালেরই প্রতীক্ষা করিব।"

কিছু পরেই, আবার রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

> মাসি প্রৌষ্ঠপদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং বিবক্ষতাম্ । নির্বৃত্তকর্মায়তনো নূনং সঞ্চিতসঞ্চয়ঃ ।
> অয়মধ্যায়সময়ঃ সামগানামুপস্থিতঃ ॥ আষাঢ়ীমভ্যুপগতো ভরতঃ কোশলাধিপঃ ॥ —কি° ২৮-৫৫

"প্রৌষ্ঠপদমাসে (ভাদ্রমাসে) বেদাধ্যয়নেচ্ছু সামগব্রাহ্মণগণের অধ্যয়ন সময় আগত প্রায়।[১১] মনে হয়, কোশলাধিপতি ভরতও তাঁহার সকল রাজকর্ম সম্পূর্ণ করিয়া, রাজস্ব সংগ্রহ করতঃ 'আষাঢ়ী' অনুষ্ঠান করিয়াছেন।"

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, রামচন্দ্র একই উক্তিতে কি করিয়া 'শ্রাবণমাস' ('পূর্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ') এবং 'আষাঢ়ী'র সমন্বয় স্থাপন করিলেন? এই প্রশ্নের সমাধানের উপরই মেঘদূতের শ্লোকের প্রকৃত পাঠনির্ধারণ নির্ভর করিতেছে—কেননা, মেঘদূতেও সেই অসামঞ্জস্যই আপাতদৃষ্টিতে প্রকট হইয়া ওঠে—'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' এবং 'প্রত্যাসন্নে নভসি' এই উক্তিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ এবং অসামঞ্জস্য মল্লিনাথের যুক্তিপরম্পরাসত্ত্বেও আজও পর্যন্ত অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে। ইহার মীমাংসা কি?

রামায়ণের উদ্ধৃত শ্লোকে—"আষাঢ়ীমভ্যুপগতো ভরতঃ কোশলাধিপঃ" এই পংক্তিটির প্রকৃত তাৎপর্য-নির্ণয় প্রথমে কর্তব্য। 'আষাঢ়ী' এই শব্দটির অর্থ 'আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী', এবং এই 'আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী'-যুক্ত মাসকে "আষাঢ়মাস" বলা হইয়া থাকে।[১২] এক্ষণে, একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—তাহা হইতেছে, মাসগণনার বিভিন্ন পদ্ধতি। প্রাচীন ভারতে পক্ষ, মাস, ঋতু এবং বর্ষগণনা বিভিন্ন ধরনের ছিল, এবং যুগপৎ বিভিন্ন পদ্ধতিতে কালবিভাগ করা হইত।[১৩] সৌর, পিত্র্য (বা মুখ্য চান্দ্রমস) এবং গৌণ চান্দ্রমস—কালবিভাগের এই তিনটি মুখ্য পদ্ধতির প্রচলন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। খৃঃ ১১শ শতকের খ্যাতনামা কবি ও আলঙ্কারিক রাজশেখর তাঁহার 'কাব্য-

---

১১ দ্রষ্টব্য : মনুসংহিতাঃ অধ্যায় ৪, শ্লোক ৯৫

১২ তুলনীয় : পুষ্যযুক্তা পৌর্ণমাসী পৌষী মাসে তু যত্র সা।
নাম্না স পৌষো মাঘাদ্যাশ্চৈবমেকাদশাপরে ॥—অমরকোষ, ১.৩.১৪

"অষাঢ়া নক্ষত্রের সহিত যুক্ত রাত্রি (পৌর্ণমাসী)" এই অর্থে 'নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ' (পা° সূ° ৪.২.৩) সূত্রানুসারে 'অষাঢ়া' শব্দের উত্তর 'অণ্' প্রত্যয় যোগে 'আষাঢ়ী' ('পৌর্ণমাসী রাত্রিঃ') পদ হইবে এবং 'আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী যে মাসে' এই অর্থে পুনরায় 'সাঽস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞায়াম্' (পা. সূ. ৪.২.২১) সূত্রানুসারে 'আষাঢ়ী' শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় যোগে মাসবাচী 'আষাঢ়' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'কাশিকাবৃত্তি' দ্রষ্টব্য।

১৩ এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ৺বালগঙ্গাধর তিলক প্রণীত *The Orion* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় (*Agrahāyaṇa*) দ্রষ্টব্য।

মীমাংসা' গ্রন্থের ১৮শ অধ্যায়ে 'কালবিভাগ' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।[১৪] নিম্নে উপরি-উক্ত ত্রিবিধ কালবিভাগ সম্বন্ধে রাজশেখরের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

রাশিতো রাশ্যন্তরসংক্রমণমুষ্ণভাসো মাসঃ, বর্ষাদি দক্ষিণায়নম্, শিশিরাদিরুত্তরায়ণং, দ্ব্যয়নঃ সংবৎসরঃ—ইতি সৌরং মানম্। পঞ্চদশাহোরাত্রঃ পক্ষঃ। বর্দ্ধমানসোমশুক্লিমা শুক্লঃ, বর্দ্ধমানসোমকৃষ্ণিমা কৃষ্ণ ইতি পিত্র্যং মাসমানম্। অমুনা চ বেদোদিতঃ কৃৎস্নোঽপি ক্রিয়াকলাপঃ। পিত্র্যমেব ব্যত্যয়িতপক্ষং চান্দ্রমসম্। ইদমার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনশ্চ কবয়শ্চ মানমাশ্রিতাঃ। এবং চ দ্বৌ পক্ষৌ মাসঃ। দ্বৌ মাসৌ ঋতুঃ। ষণ্ণামৃতূনাং পরিবর্ত্তঃ সংবৎসরঃ। স চ চৈত্রাদিরিতি দৈবজ্ঞাঃ, শ্রাবণাদিরিতি লোকযাত্রাবিদঃ। তত্র নভা নভস্যশ্চ বর্ষাঃ, ইষ উর্জশ্চ শরৎ, সহঃ সহস্যশ্চ হেমন্তঃ, তপস্তপস্যশ্চ শিশিরঃ, মধু-মাধবশ্চ বসন্তঃ, শুক্রঃ শুচিশ্চ গ্রীষ্মঃ। [১৫]

অর্থাৎ সূর্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণের মধ্যবর্তী কালব্যবধানকে মাস বলা হয়। বর্ষা ঋতু হইতে দক্ষিণায়নের আরম্ভ, এবং শিশির ঋতু (শীত ঋতু) হইতে উত্তরায়ণের প্রবৃত্তি। দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ উভয়ের সম্মিলিত পরিমাণ 'সংবৎসর'। ইহাকে সৌর মান বলা হইয়া থাকে। পঞ্চদশ অহোরাত্রের সমষ্টি একটি পক্ষ। চন্দ্রের শুক্লিমা যে পক্ষে বৃদ্ধি পায় তাহা শুক্লপক্ষ; এবং চন্দ্রের কৃষ্ণিমা যে পক্ষে বৃদ্ধি পায় তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ কহে। এই উভয়পক্ষ মিলিয়া একমাস হইয়া থাকে। ইহাই পিত্র্য মানের পরিমাণ। এবং এই পিত্র্যমানানুসারেই সকল বৈদিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পিত্র্যমাসমানের পক্ষদ্বয়ের ক্রম বিপরীত হইলে (অর্থাৎ মাসগণনা যদি কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ হইয়া শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে শেষ হয়) তাহা (গৌণ) চান্দ্রমস মানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। আর্যাবর্ত জনপদের অধিবাসিগণ এবং কবিসম্প্রদায় এই (গৌণ চান্দ্রমস) মানই আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপে দুই পক্ষ মিলিয়া মাস। দুই মাস মিলিয়া এক ঋতু। ছয়টি ঋতু মিলিয়া সংবৎসর গণনা করা হইয়া থাকে। দৈবজ্ঞগণের (অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্‌গণের) মতে চৈত্রমাস হইতে সংবৎসরের আরম্ভ। কিন্তু লোকব্যবহারে শ্রাবণ হইতে সংবৎসর গণনা করা হয়। এই মতে নভঃ (শ্রাবণ) এবং নভস্য (ভাদ্র) এই দুইমাস লইয়া বর্ষা ঋতু, ইষ (আশ্বিন) এবং উর্জ (কার্তিক); শরৎ, সহঃ (অগ্রহায়ণ) এবং সহস্য (পৌষ)—হেমন্ত, তপঃ (মাঘ) এবং তপস্য (ফাল্গুন)—শিশির, মধু (চৈত্র) এবং মাধব (বৈশাখ)—বসন্ত, শুক্র (জ্যৈষ্ঠ) এবং শুচি (আষাঢ়)—গ্রীষ্ম।

কাব্যমীমাংসার উপরি-উদ্ধৃত সন্দর্ভ হইতে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে এবং তাহা এই যে আর্যাবর্তনিবাসিগণ লোকব্যবহারে এবং কবিসম্প্রদায় তাঁহাদের কাব্যে গৌণ চান্দ্র মাস এবং শ্রাবণাদিসংবৎসরই আশ্রয় করিয়া থাকেন। সুতরাং এই মতানুসারে 'আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী'র পরবর্তী 'শ্রাবণী কৃষ্ণা প্রতিপৎ' হইতে আরম্ভ হইয়া 'আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী' তিথিতে বর্ষশেষ হইত—ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সিদ্ধ হইতেছে। অতএব রামায়ণে 'আষাঢ়ী' শব্দের দ্বারা যে গৌণ চান্দ্র সংবৎসরের অন্ত্যদিবস আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহাতে কোনও সংশয়ই থাকিতে পারে না। তাহার পর দিবস হইতেই গৌণ চান্দ্র শ্রাবণ মাসের সূচনা। অতএব

১৪ অধ্যায়শেষে তিনি বলিতেছেন : ইতি কালবিভাগস্য দর্শিতা বৃত্তিরীদৃশী।
কবেরিহ মহান্ মোহ ইহ সিদ্ধো মহাকবিঃ ॥—পৃ. ১১২ (GOS. Edn.)

১৫ কাব্যমীমাংসা. পৃ ৯৮—৯৯। তুলনীয়ঃ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ২.২০.৩৯ (পৃ. ১০৮-১০৯)। মহীশূর সংস্করণ।

রামায়ণে 'পূর্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ' এই উক্তির দ্বারা রামচন্দ্র নববর্ষারম্ভে গৌণ চান্দ্র শ্রাবণ মাসেরই সূচনার কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন, ইহা তো যুক্তিযুক্তই বটে!

রামায়ণশ্লোকে রামচন্দ্র বলিতেছেন— "মনে হয়, কোশলাধিপ ভরতও তাঁহার সকল রাজকর্ম সম্পূর্ণ করিয়া রাজস্বসংগ্রহ করতঃ 'আষাঢ়ী' (পৌর্ণমাসী) অনুষ্ঠান করিতেছেন।"— এখন প্রশ্ন হইতে পারে, রাজস্বসংগ্রহের সহিত আষাঢ়ী অনুষ্ঠানের সম্বন্ধ কি? পূর্বেই দেখানো হইয়াছে যে গৌণ চান্দ্র সংবৎসর শেষ হইত 'আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী' তিথিতে। সুতরাং আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীই ছিল গৌণ চান্দ্রসংবৎসরের অন্তিমদিবস। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' দেখিতে পাই— সেই দিন গাণনিকবৃন্দ (accountants) রাষ্ট্রের বার্ষিক আয়ব্যয়ের আখেরী হিসাব মিটাইয়া দিতেন। কৌটিল্য বলিতেছেন—

গাণনিক্যানি আষাঢ়ীমাগচ্ছেয়ুঃ—অর্থশাস্ত্র. ২য় অধিকরণ. ৭ম অধ্যায়.
২৫শ প্রকরণ ("অক্ষপটলে গাণনিক্যাধিকরণ")

ডাঃ শ্যামশাস্ত্রী ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

Accounts shall be submitted at the close of the month of Āsāḍha.[১৬]

ইহার পর দিন, অর্থাৎ নববর্ষের আদিদিবস শ্রাবণী কৃষ্ণা প্রতিপৎ 'ব্যুষ্ট' এই নামে পরিচিত। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য 'ব্যুষ্ট' এই শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—

রাজবর্ষং মাসঃ পক্ষো দিবসশ্চ ব্যুষ্টম্ ·ইতি কালঃ।—অর্থশাস্ত্র ২. ৬. ২৪

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের যে বর্ষাবর্ণনা আছে, গৌণ চান্দ্র শ্রাবণ হইতেই তাহার আরম্ভ। অতএব শ্রাবণী কৃষ্ণা প্রতিপৎ হইতে চারি মাস গণনা করিলে 'কার্তিকী পৌর্ণমাসী' তিথিতেই তাহার অবসান হয়। তাই রামায়ণে দেখি, বর্ষাঋতুর চাতুর্মাস্য অতীত হইলে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"চত্বারো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ।
মম শোকাভিভূতস্য তথা সীতামপশ্যতঃ॥"—কি°. ৩০. ৬৪

এক্ষণে, মেঘদূতে আমরা কি দেখি? মেঘদূতেও যক্ষ প্রিয়াকে সান্ত্বনা দিতেছে—

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগুণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু॥

কালিদাস এই চাতুর্মাস্যের কল্পনা যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রের বিলাপ হইতেই পাইয়াছিলেন, তাহাতে

---

১৬ Kauṭilya's *Arthaśāstra* (Translation, Third Edn, 1929) p. 63, পাদটীকায় ডাঃ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন: "*I. e.* the end of the year. On Vyuṣṭa, the new year's day, the first day of Śrāvaṇa, the examination of accounts begins." অর্থশাস্ত্রের টীকাকার ম. ম. গণপতি শাস্ত্রিমহাশয় 'আষাঢ়ী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন "আষাঢ়মাসি" (দ্রষ্টব্যঃ অর্থশাস্ত্র. ১ম ভাগ. পৃ. ১০৭. ত্রিবান্দ্রম্ সংস্করণ)। কিন্তু ইহা ভুল। কেননা, 'আষাঢ়ী' শব্দ 'আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী' অর্থেই প্রযুক্ত হয়, এবং পূর্বোদ্ধৃত পাণিনীয় সূত্রানুসারেও এই প্রয়োগই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অপিচ "ত্রিশতং চতুঃপঞ্চাশৎ চাহোরাত্রাণাং কর্মসংবৎসরঃ। তমাষাঢ়ীপর্য্যবসানমূনং পূর্ণং বা দদ্যাৎ।"—অর্থশাস্ত্র. পৃ ৬৩। এখানেও ডাঃ শাস্ত্রী 'আষাঢ়ীপর্য্যবসানম্' এই পদের অনুবাদ করিয়াছেন: "at the end of the month Āshāḍha".

কোনও সন্দেহই নাই। এবং রামায়ণে মহাকবি বাল্মীকি যেমন শ্রাবণী কৃষ্ণা প্রতিপৎ হইতে (অর্থাৎ নববর্ষ হইতে) কার্তিকী পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত চাতুর্মাস্য বর্ষাকাল গণনা করিয়াছেন, কালিদাসও সেইরূপ করিয়াছেন। সুতরাং, মেঘদূতের প্রথম শ্লোকে 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' পাঠ অপেক্ষা 'আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে'— এই পাঠই চাতুর্মাস্য গণনার দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত, এবং পরবর্তী শ্লোকের 'প্রত্যাসন্নে নভসি' এই উক্তির সহিতও বিরোধশূন্য। যক্ষের 'বর্ষভোগ্য' বিরহের অবসান কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী তিথিতে—

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ।

অতএব আষাঢ়ী শুক্লৈকাদশী তিথিতে চাতুর্মাস্যের প্রথমদিন পড়ে। যক্ষ 'আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী'তে ('আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে') মেঘের প্রতি সন্দেশ নিবেদন করিতেছে। অতএব তাহার চাতুর্মাস্যের চারিদিন অতীতই হইয়াছে।[১৭] কার্তিকী শুক্লৈকাদশীতে যক্ষের বিরহের অবসান; সুতরাং শুক্লপক্ষের অবশিষ্ট চারিটি রজনীর (দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী এবং পূর্ণিমা) জন্য যক্ষ উৎকণ্ঠাভরে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে—

পশ্চাদাবাং বিরহগুণিতং তং তমাত্মাভিলাষং নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু॥

—উত্তর মেঘ°, ১১৬

মেঘদূতের এই উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও মল্লিনাথ অনাবশ্যক বিবাদের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

অত্র কৈশ্চিৎ 'নভো-নভস্যয়োরেব বার্ষিকত্বাৎ কথমাষাঢ়াদিচতুষ্টয়স্য বার্ষিকত্বমুক্তমিতি' চোদয়িত্বা ঋতুত্রয়পক্ষাশ্রয়ণাদবিরোধ ইতি পর্য্যহারি। তৎসর্বমসংগতম্। অত্র গতশেষাশ্চত্বারো মাসা ইত্যুক্তং কবিনা, নতু তে বার্ষিকা ইতি। তস্মাদনুক্তোপালম্ভ এব। যচ্চ নাথেনোক্তম্ 'কথমাষাঢ়াদিচতুষ্টয়াৎ পরং শরৎকালঃ' ইতি তত্রাপি আকার্ত্তিক-সমাপ্তেঃ শরৎকালানুবৃত্তেঃ পরিণত-শরচ্চন্দ্রিকাসু ইত্যুক্তম্। নতু তদৈব শরৎপ্রাদুর্ভাব উক্ত ইত্যবিরোধ এব॥

কিন্তু মল্লিনাথের এই যুক্তি কি নিঃসার নহে? মল্লিনাথ যেভাবে 'প্রশমদিবসে' এবং 'প্রথমদিবসে' এই উভয়বিধ পাঠের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অন্যতর পাঠ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনও হেতুই নাই। উভয় পক্ষেই সমান দোষ, পরিহারও সমান—সুতরাং 'প্রশমদিবসে' পাঠ ত্যাগ করিয়া 'প্রথমদিবসে' পাঠ গ্রহণ করিবার পক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে?[১৮] কিন্তু রামায়ণ; কৌটিলীয় 'অর্থশাস্ত্র,' পাণিনীয় 'অষ্টাধ্যায়ী' এবং রাজশেখরকৃত 'কাব্যমীমাংসা' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যে সকল সাক্ষ্য আমরা সঙ্কলিত করিলাম তাহাতে ইহাই নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয়, যে কালিদাস তাঁহার 'মেঘদূতের' চাতুর্মাস্য পরিকল্পনার জন্য রামায়ণের নিকট ঋণী, এবং রামায়ণের ন্যায় গৌণচান্দ্রমাস-গণনানুযায়ী গৌণ চান্দ্র শ্রাবণের প্রথমদিবস হইতেই চাতুর্মাস্যগণনা করিতে হইবে। মল্লিনাথ সৌরমাস-গণনা অনুসারে 'প্রশমদিবসে' পাঠের বিপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অনবধানতামূলক।

---

১৭ মল্লিনাথ মেঘদর্শন দিন অর্থাৎ সৌর আষাঢ়ের প্রথম দিন হইতে চাতুর্মাস্য গণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই মতে যে অসামঞ্জস্য, অর্থাৎ দশ দিনের আধিক্য, লক্ষিত হয়, তাহা তিনি কোনও যুক্তি না দেখাইয়া উড়াইয়া দিয়াছেন: "শেষান-বশিষ্টান্ চতুরো মাসান্। মেঘদর্শনপ্রভৃতি-হরিবোধনদিনান্তানিত্যর্থঃ। দশদিবসাধিক্যং ত্বত্র ন বিবক্ষিতমিত্যুক্তমেব।"—মেঘদূত, (K. B. Pathak's Edition)

১৮ তুলনীয়: যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ।
নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থবিচারণে॥

কিন্তু চাতুর্মাস্য-পরিকল্পনার কথা (এবং পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে আলোচিত উপমার কথা) ছাড়িয়া দিলেও, মেঘদূতের বিষয়বস্তু বহুলপরিমাণে রামায়ণ হইতেই সমাহৃত। কালিদাস পূর্বমেঘে অলকাভিমুখী মেঘের উত্তরবাহী গতিপথ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের জনপদ, গিরি-নদী-উপত্যকা, গ্রাম-নগর-দেবায়তন, অরণ্য ও প্রান্তর, রাজপ্রাসাদ ও উদয়নকথা-কোবিদ গ্রামবৃদ্ধগণের গোষ্ঠীচত্বর,—পূর্বমেঘে কালিদাস যেভাবে এইসকল বস্তুর সমাবেশ ও বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সত্যই অলৌকিক কবিত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই উত্তরগামী পথের সন্ধান কালিদাস কোথা হইতে পাইলেন? বর্ষাকালীন মেঘের স্বাভাবিক গতিপথের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষা করিয়া কালিদাস যেভাবে মেঘের অলকাভিমুখী দৌত্যের সংযোগ ঘটাইয়াছেন—শুধু সেইটুকুই কালিদাসের প্রতিভার অনন্যসাধারণত্বের নিদর্শনরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য।[১৯] কিন্তু, এই পরিকল্পনার মূল অনুসন্ধান করিলে, আমরা 'রামায়ণী কথা'য় গিয়াই পৌঁছিব।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রের আদেশে সুগ্রীব সীতান্বেষণের জন্য অনন্ত বানর-অক্ষৌহিণী সমাবেশ করিয়াছেন। সেই বিশাল বানরসেনাকে সুগ্রীব চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর—এই চতুর্দিকে প্রেরণ করিতেছেন। যথাক্রমে, বিনত, অঙ্গদ, সুষেণ, এবং শতবল নামক যূথপতি সীতাপরিমার্গণোৎসুক চতুর্ধাবিভক্ত সেই বানরসেনার নেতৃত্বে নিয়োজিত হইয়াছেন। সুগ্রীব এক একজন যূথপতিকে এক এক দিকে প্রেরণ করিতেছেন, এবং সেই সেই দিকে অবস্থিত বিভিন্ন সমুদ্দেশের বর্ণনা করিতেছেন—

যে কেচন সমুদ্দেশাস্তস্যাং দিশি সুদুর্গমাঃ। কপীশঃ কপিমুখ্যানাং স তেষাং সমুদাহরৎ ॥ কি ৪১.৭[২০]

পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে অবস্থিত গিরি-নদী-জনপদ-অরণ্যানী একে একে সুগ্রীব বর্ণনা করিতে লাগিলেন—প্রাচীন ভারতের একখানি সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ ভৌগোলিক চিত্র![২১] পূর্বে উদয়পর্বত, দক্ষিণে ঋষভপর্বত, পশ্চিমে অস্তাচল মেরু, উত্তরে সোমগিরি—এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত গিরি-নদী-সমন্বিত জনপদের একখানি আলেখ্য সুগ্রীবের বর্ণনার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালিদাস তাঁহার পূর্বমেঘে মেঘের গতিপথ অনুসরণ করিয়া প্রাচীন ভারতের যে সংক্ষিপ্ত জনপদ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা রামায়ণীয় বর্ণনা হইতে বহুগুণে চমৎকারী ও কবিত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্বমেঘে যক্ষকর্তৃক এই জনপদ-পরিচয় যে রামায়ণে বানরসেনার প্রতি সুগ্রীবের নির্দেশবাণীর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সংশয়ের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। রামায়ণে দক্ষিণাপথের বর্ণনার মধ্যে প্রথমেই বিন্ধ্য, নর্মদা, গোদাবরী, দশার্ণ জনপদ এবং অবন্তীনগরীর উল্লেখ দেখিতে পাই।[২২] রামগিরি হইতে

১৯ এই বিষয়ে ডাঃ এস্, এন্, সেন লিখিত 'মেঘদূতে আবহতত্ত্ব' শীর্ষক সুচিন্তিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য: ভারতবর্ষ. ১৩৪২, আষাঢ়

২০ তুলনীয়: "মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্ ॥"- মেঘদূত. ১৩

২১ রাজসূয়যজ্ঞের প্রাক্‌কালে অর্জুন, ভীমসেন, সহদেব এবং নকুল কর্তৃক যথাক্রমে উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম-ভারতীয় জনপদ-বিজয় এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। দ্রষ্টব্য: মহাভারত, সভাপর্ব. ২য় অধ্যায়. শ্লো. ২৬-৩২।—অপিচ

২২ কিষ্কিন্ধ্যা. ৪১. ৮-১০

উত্তরাভিমুখী মেঘের যাত্রাপথের বর্ণনায় কালিদাস এইসকল গিরি-নদী-জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। সুগ্রীব উত্তরাপথগামী বানরযূথকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

ক্রৌঞ্চঞ্চ গিরিমাসাদ্য বিলং তস্য সুদুর্গমম্।
অপ্রমত্তৈঃ প্রবেষ্টব্যং দুষ্প্রবেশং হি তৎ স্মৃতম্॥—কি° ৪৩. ২৫

দিশং ধনপতে-রিষ্টামজয়ৎ পাকশাসনিঃ।
ভীমসেনস্তথা প্রাচীং সহদেবস্তু দক্ষিণাম্॥
প্রতীচীং নকুলো রাজন্ দিশং ব্যজয়তাস্ত্রবিৎ।
খাণ্ডবপ্রস্থমধ্যস্থো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
আসীৎ পরময়া লক্ষ্ম্যা সুহৃদ্‌গণবৃতঃ প্রভুঃ॥
—সভা. ২৫. ৯-১১ (বঙ্গবাসী সংস্করণ),

পূর্বমেঘেও সেই ক্রৌঞ্চরন্ধ্র—তাহারই মধ্য দিয়া মেঘকে অলকায় পৌঁছিতে হইবে—

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্য্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ॥ —পূর্বমেঘ. ৬০.

তারপর, মেঘদূতের কবি অলকার যে কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে অক্ষয় সম্পৎস্বরূপ। কুবেরনগরীর রমণীগণের দেহযষ্টি বিচিত্র পুষ্পসম্ভারের দ্বারা অলঙ্কৃত—সেখানে সর্বকালে সর্বঋতুর যুগপৎ সমবায়; অলকায় বৃক্ষসমূহ নিত্যপুষ্পিত, সরোবররাজি নিত্যপ্রস্ফুটিত পদ্মবনের দ্বারা শোভিত, প্রদোষসমূহ নিত্যজ্যোৎস্নাসমুজ্জ্বল। সেখানে শুধু আনন্দজনিত অশ্রু, অনুরাগজনিত সন্তাব, প্রণয়কলহজনিত বিরহ, এবং যৌবনই একমাত্র বয়স। সেখানে বিচিত্রবাস, চিত্ত-বিভ্রমকারী মদিরা, চরণের অলক্তকরাগ—সকলই কল্পবৃক্ষ প্রসব করিয়া থাকে। যক্ষের প্রাসাদমধ্যস্থ সরোবরে স্নিগ্ধবৈদূর্যনালসমন্বিত হৈমকমল সর্বদাই প্রস্ফুটিত। কালিদাস পার্বতীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে কুমার-সম্ভবে একটি শ্লোকে বলিয়াছিলেন—

সর্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন। সা নির্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্যদিদৃক্ষয়েব॥

—বিধাতা যেন বিশ্বের সর্ববিধ সৌন্দর্য একত্র দর্শনের লালসায় সর্ববিধ উপমা দ্রব্যের সংগ্রহ করিয়া তাহাদের যথাযথ বিন্যাস পূর্বক পার্বতীর দেহযষ্টি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

অলকার বর্ণনাপ্রসঙ্গেও আমরা সেই একই কথা বলিতে পারি। অলকা যেন সর্বজাতীয় ঐশ্বর্য, সর্বজাতীয় সৌন্দর্যের সমবায়-ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

এইমত মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি।

এইস্থলে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের পরপারবর্তী 'উত্তরকুরু' জনপদের বর্ণনার তুলনা করিলে, কালিদাসের অলকাবর্ণনার মূল প্রেরণার সন্ধান আমরা পাইব। সুগ্রীব উত্তরাপথ যাত্রী শতবল-নামক বানরাধিপতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥
ততঃ কাঞ্চনপদ্মাভিঃ পদ্মিনীভিঃ কৃতোদকাঃ।
নীলবৈদূর্য্যপত্রাঢ্যা নদ্যস্তত্র সহস্রশঃ॥
নিত্যপুষ্পফলাস্তত্র নগাঃ পত্ররথাকুলাঃ॥
দিব্যগন্ধরসস্পর্শাঃ সর্বকামান্ স্রবন্তি চ।
নানাকারাণি বাসাংসি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ॥

তরুণাদিত্যসঙ্কাশা ভান্তি তত্র জলাশয়াঃ।
মহার্হমণিরত্নৈশ্চ কাঞ্চনপ্রভকেশরৈঃ॥
নীলোৎপলবনৈশ্চিত্রৈঃ স দেশঃ সর্বতো বৃতঃ।
নিস্তলাভিশ্চ মুক্তাভির্মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ॥
উদ্ধূতপুলিনাস্তত্র জাতরূপৈশ্চ নিম্নগাঃ।
সর্বরত্নময়ৈশ্চিত্রৈরবগাঢ়া নগোত্তমৈঃ॥
জাতরূপময়ৈশ্চাপি হুতাশনসমপ্রভৈঃ।

মুক্তাবৈদূর্য্যচিত্রাণি ভূষণানি তথৈব চ।
স্ত্রীণাং যান্যনুরূপাণি পুরুষাণাং তথৈব চ॥
সর্বর্তুসুখসেব্যানি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ।
মহার্হমণিচিত্রাণি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ॥
শয়নানি প্রসূয়ন্তে চিত্রাস্তরণবন্তি চ।
মনঃকান্তানি মাল্যানি ফলন্ত্যত্রাপরে দ্রুমাঃ॥ [২৩]

অলকার জ্যোৎস্নালোকিত হর্ম্যচূড়ায় রমণীসহিত যক্ষগণ মধুপানমত্ত হইয়া যখন পুষ্করে আঘাত করিতে থাকে, তখন মেঘনির্ঘোষসদৃশ গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে—

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু॥—মেঘদূত

রামায়ণে ইহারই অনুরূপ চিত্র দেখিতে পাই—

গন্ধর্বাঃ কিন্নরাঃ সিদ্ধা নাগবিদ্যাধরাস্তথা।
রমন্তে সহিতাস্তত্র নারীভি-র্ভাস্বরপ্রভাঃ॥
সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে রতিপরায়ণাঃ।
সর্বে কামার্থসহিতা বসন্তি সহযোষিতঃ॥
গীতবাদিত্রনির্ঘোষঃ সোৎকৃষ্টহসিতস্বনৈঃ।
শ্রূয়তে সততং তত্র সর্বভূতমনোরমঃ॥ —কি°. ৪৩. ৫০-৫২

উত্তরমেঘে বর্ণিত কুবেরপুরীর অনুপম দৃশ্যের পাশাপাশি রামায়ণে 'উত্তরকুরু'র চিত্রটি সহৃদয়ের চিত্তে ভাসিয়া উঠে। একটি যেন আর একটির প্রতিবিম্ব। কিন্তু প্রতিবিম্ব হইলেও কত চমৎকারী!

শুধু অলকার বর্ণনার জন্যই নহে, বিরহিণী যক্ষপত্নীর যে চিত্র কালিদাস উত্তরমেঘে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মূল প্রেরণার জন্যও মেঘদূতের কবি রামায়ণের নিকট ঋণী। অশোকবনে রাক্ষসী পরিবৃতা সীতাদেবীর বিরহম্লান দেহযষ্টির যে অনুপম চিত্র রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে (অ° ১৫) আদিকবি নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কালিদাসের কবিচিত্তে অবিস্মরণীয়রূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, তাই বিরহিণী যক্ষপত্নীর বর্ণনায় কবিচিত্ত আপনার অজ্ঞাতসারেই যেন উহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল—

পূর্ণচন্দ্রাননাং সুভ্রূং চারুবৃত্তপয়োধরাম্।
তাং নীলকণ্ঠীং বিম্বোষ্ঠীং সুমধ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতাম্।
কুর্বন্তীং প্রভয়া দেবীং সর্বা বিতিমিরা দিশঃ॥
সীতাং পদ্মপলাশাক্ষীং মন্মথস্য রতিং যথা॥—সু° ১৫. ২৮-৩০.

এই রামায়ণীয় শ্লোকদ্বয়ই কি মেঘদূতের 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী' এই শ্লোকটির মূল প্রেরণা জোগায় নাই?

২

মোটকথা, মেঘদূতের সমগ্র প্রেরণা মহাকবি পাইয়াছিলেন বাল্মীকীয় রামায়ণ হইতে। কালিদাসের সমকালীন কোনও কোনও আচার্য এই ঋণের উল্লেখ করিয়া কালিদাসের কবিত্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ

২৩ কিষ্কিন্ধ্যা° ৪৩. ৩৮-৪৮। রামায়ণের বহুস্থলেই এইরূপ চিত্রের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—সুন্দরকাণ্ড. অ° ১৪-১৫। তুলনীয়: 'হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্য্যনালৈঃ' 'বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়ো-র্বিভ্রমাদেশদক্ষম্' ইত্যাদি—মেঘদূত।

করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সেই জন্যই কি মহাকবি তাঁহার মেঘদূতকে দিঙ্‌নাগের 'স্থূলহস্তাবলেপ' পরিহার করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন ?—

স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্‌মুখঃ খং দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্‌ স্থূলহস্তাবলেপান্‌॥—মেঘ°. ১৪

—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন—

অত্রেদমপ্যর্থান্তরং ধ্বনয়তি—রসিকো নিচুলো নাম মহাকবিঃ কালিদাসস্য সহাধ্যায়ঃ পরাপাদিতানাং কালিদাসপ্রবন্ধদূষণানাং পরিহর্তা যস্মিন্‌ স্থানে, তস্মাৎ স্থানাদ্‌ উদঙ্‌মুখঃ নির্দোষত্বাদুন্নতমুখঃ সন্‌ পথি সারস্বতমার্গে। দিঙ্‌নাগানাং—পূজায়াং বহুবচনম্‌। দিঙ্‌নাগাচার্য্যস্য কালিদাসপ্রতিপক্ষস্য হস্তাবলেপান্‌ হস্তবিন্যাস-পূর্বকাণি দূষণানি পরিহরন্‌।·খমুৎপত উচ্চৈর্ভবেতি স্বপ্রবন্ধমাত্মানং বা প্রতি কবেরুক্তিরিতি॥

মল্লিনাথের মতে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী দিঙ্‌নাগাচার্য মেঘদূতের নানাপ্রকার (সাহিত্যিক) দোষ উদ্‌ভাবন করিতেন। তাই, কালিদাস উপরি-উক্ত শ্লোকে ব্যঞ্জনার সাহায্যে মেঘদূতকে দিঙ্‌নাগের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য বলিতেছেন।

কিন্তু মল্লিনাথের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না। বহু প্রথিতযশাঃ আলংকারিক কালিদাসের মেঘদূত কাব্য হইতে উদাহরণস্বরূপ বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যিক দূষণ উদ্ভাবনের কোনও চেষ্টাই করেন নাই। 'মেঘদূত' কালিদাসের কবিপ্রতিভার চরম উৎকর্ষের পরিণত ফলস্বরূপ—ইহার প্রতিটি শ্লোক হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, সাহিত্যিক দূষণের অবসর কোথায় ? তবে দিঙ্‌নাগাচার্যের এই দূষণপ্রচেষ্টার হেতু কি ? মল্লিনাথের ব্যাখ্যা কি তবে নিতান্তই অমূলক, স্বকপোল-কল্পিত ?—তাহাও মনে হয় না। মল্লিনাথ তাঁহার কালিদাসকাব্যের টীকারচনায় যে পূর্ববর্তী টীকাকারগণের ব্যাখ্যাকেই বহুলপরিমাণে অবলম্বন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আজ আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রাচীন বহু টীকা আজ প্রকাশিত হইয়াছে। মল্লিনাথের টীকার সহিত উহাদের তুলনা করিলেই প্রাচীনের নিকট মল্লিনাথের অপরিশোধনীয় ঋণ ধরা পড়িবে। মল্লিনাথও তাঁহার 'সঞ্জীবনী' টীকার অবতরণিকাশ্লোকে প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণের নিকট তাঁহার অধমর্ণত্ব স্বীকার করিয়াছেন—

তথাপি দক্ষিণাবর্তনাথাদ্যৈঃ ক্ষুণ্ণবর্ত্মনি। বয়ং চ কালিদাসোক্তিষ্ববকাশং লভেমহি॥

দক্ষিণাবর্ত-রচিত 'মেঘসন্দেশের' টীকা আজ প্রকাশিত হইয়াছে।[২৪] মল্লিনাথের ব্যাখ্যা তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। পূর্বমেঘের 'দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্‌ স্থূলহস্তাবলেপান্‌' এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় দক্ষিণাবর্তনাথ যে প্রাচীন কিংবদন্তী উল্লেখ করিয়াছেন, মল্লিনাথ উহাই হুবহু উদ্ধার করিয়াছেন—শুধু যেটুকু অংশে দিঙ্‌নাগাচার্যের দূষণোদ্‌ভাবনের প্রকৃত কারণটির উল্লেখ আছে, মল্লিনাথ সেই অংশটুকুই বাদ দিয়াছেন ! নিম্নে 'মেঘসন্দেশে'র দক্ষিণাবর্তনাথের ব্যাখ্যা হইতে প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত হইল—

অয়মভিপ্রায়ঃ—দিঙ্‌নাগ ইতি কোঽপি আচার্যঃ কালিদাসপ্রবন্ধান্‌ 'অন্যত্র উক্তোঽয়মর্থঃ'—ইতি স্থূলহস্তাভিনয়ৈ-র্দূষয়তি। তমাচার্য্যং স্বপ্রবন্ধস্য অপূর্বার্থাভিধায়িত্বমাশ্রিত্য মেঘোপদেশব্যাজেন কবিরুপালভতে॥

মল্লিনাথের উদ্ধৃত ব্যাখ্যার সহিত দক্ষিণাবর্তনাথের এই উক্তির তুলনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যায়

২৪ ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত সীরিজ্‌।

যে, মল্লিনাথ দিঙ্‌নাগাচার্য সম্বন্ধে যে কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মূল দক্ষিণাবর্তনাথের টীকা। দক্ষিণাবর্তনাথও যে সম্প্রদায়ক্রমেই এই কিংবদন্তীর সন্ধান পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। কিন্তু এখানে দিঙ্‌নাগের কালিদাসকাব্যের দূষণোদ্‌ভাবনের কারণ অন্যরূপ—

অন্যত্র উক্তোঽয়মর্থ ইতি।

"অন্য স্থলে তো এই একই অর্থ বলা হইয়াছে—তুমি তো তাহা হইতে চুরি করিয়াছ, তোমার আবার কৃতিত্ব কি? তুমি তো চৌরকবি?" সুতরাং দেখা যাইতেছে, দিঙ্‌নাগাচার্যের মতে কালিদাসের প্রধান সাহিত্যিক অপরাধ ছিল—চৌর্যাপরাধ (plagiarism)![২৫] এবং ইহার দ্বারা দিঙ্‌নাগ যে বাল্মীকীয় রামায়ণের নিকটই কালিদাসের ঋণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা স্বতঃই মনে উদিত হইয়া থাকে।

কিন্তু কোন্ কবি না চৌর্যের অপরাধে অপরাধী? জগতের যে কোনও মহাকবি তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের সারস্বত সম্পদের উত্তরাধিকারী। পাশ্চাত্যজগতের শেক্‌সপীয়র মিল্‌টন প্রভৃতি প্রথিতযশাঃ কবিগণও তাঁহাদের পূর্বগামিগণের রচনাসম্পদের নিকট অপরিমেয় ঋণে আবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে কয়েকটি সুন্দর শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

নাস্ত্যচৌরঃ কবিজনো নাস্ত্যচৌরো বণিগ্‌জনঃ। আচ্ছাদকস্তথা চান্যস্তথা সংবর্গকোঽপরঃ॥
স নন্দতি বিনা বাচ্যং যো জানাতি নিগূহিতুম্॥ শব্দার্থোক্তিষু যঃ পশ্যেদিহ কিঞ্চন নূতনম্।
উৎপাদকঃ কবিঃ কশ্চিৎ কশ্চিচ্চ পরিবর্তকঃ। উল্লিখেৎ কিঞ্চন প্রাচ্যং মন্যতাং স মহাকবিঃ॥"[২৬]

মিল্‌টন হোমর ভর্জিল আরিওস্টো শেক্‌সপীয়র্ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের নিকট বহুলপরিমাণে ঋণী। অনেক উৎসাহী সমালোচক সেইজন্য মিল্‌টনের কবিপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ও অপূর্বত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই মত কি সত্য? হোমর্, ভর্জিল প্রভৃতির কাব্য থাকা সত্ত্বেও প্যারাডাইস লস্ট্ কাব্য ছিল না। মিল্‌টন্ ছাড়া আরও অনেক কবি সেই সেই পূর্বকবিগণের কাব্যসম্পদের সহিত পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাই বা কেন আর একখানি প্যারাডাইস লস্ট্ রচনা করিতে পারিলেন না? এই প্রসঙ্গে আমরা বিখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক সার্ ওয়াল্‌টার র‍্যালের যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও, উদ্ধার না করিয়া পারিলাম না—

In one sense, of course, and that not the least important, the great works of Milton were the product of the history and literatures of the world. Cycles ferried his cradle. Generations guided him. All forces were steadily employed to complete him.

But when we attempt to separate the single strands of his complex genealogy, to identify and arrange the influences that made him, the essential somehow escapes us. The genealogical method in literary history is both interesting and valuable, but we are too apt, in our

২৫ কালিদাসের পূর্বেও কি অন্যান্য দূতকাব্য রচিত হইয়াছিল? ভামহ তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে মেঘ, বায়ু, চন্দ্র প্রভৃতি অচেতন পদার্থের দূত্যকল্পনাকে 'অযুক্তিমৎ' নাম কাব্যদোষের উদাহরণ রূপে পরিগণনা করিয়াছেন। যথা—"অযুক্তিমদ্ যথা দূতা জলভৃন্মারুতেন্দবঃ। তথা ভ্রমর-হারীত-চক্রবাক-শুকাদয়ঃ॥ অবাচোঽব্যক্তবাচশ্চ দূরদেশবিচারিণঃ। কথং দূত্যং প্রপদ্যেরন্নিতি যুক্ত্যা ন যুজ্যতে॥ যদি চোৎকণ্ঠয়া যত্তদুন্মত্ত ইব ভাষতে। তথা ভবতু ভূম্নেদং সুমেধোভিঃ প্রযুজ্যতে॥"—কাব্যালঙ্কার, ১, ৪২-৪৪। ভামহের জীবিতকাল আনুমানিক খৃঃ ৫ম শতক।

২৬ কাব্যমীমাংসা, পৃঃ ৬১-৬২।

admiration for its lucid procedure, to forget that there is one thing which it will never explain, and that thing is poetry. Books beget books, but the mystery of conception still evades us. We display, as if in a museum, all the bits of thought and fragments of expression that Milton may have borrowed from Homer and Virgil, from Ariosto and Shakespeare. Here is a far-fetched conceit, and there is an elaborately jointed comparison. But these choice fragments and samples were to be had by any one for the taking; what it baffles us to explain is how they came to be of so much more use to Milton than ever they were to us. In any dictionary of quotations you may find great thoughts and happy expressions as plentiful and as cheap as sand, and for the most part, quite as useless. These are dead thoughts: to catalogue, compare, and arrange them is within the power of any competent literary workman; but to raise them to blood-heat again, to breathe upon them and vitalise them is the sign that proclaims a poet. The *ledger school of criticism,* which deals only with borrowing and lending, ingeniously traced and accurately recorded, looks foolish enough in the presence of this miracle. There is a sort of critics who, in effect, decry poetry, by fixing their attention solely on the possessions that poetry inherits. They are like Mammon—

> the least erected Spirit that fell
> From Heaven ; for even in Heaven his looks and thoughts
> Were always downward bent, admiring more
> The riches of Heaven's pavement, trodden gold,
> Than aught divine or holy else enjoyed
> In vision beatific.

With curious finger and thumb they pick holes in the mosaic; and whenever there is wealth they are always ready to cry "Thief". [২১]

৩

আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে প্রধানতঃ কালিদাসের মেঘদূত ও রঘুবংশ এই কাব্যদ্বয়ের উপর বাল্মীকীয় রামায়ণের দূরপ্রসারী প্রভাবের কথাই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু মহাভারত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের নিকটও কালিদাসের সাহিত্যিক ঋণ নিতান্ত যৎসামান্য নহে। কিন্তু কালিদাসের এই অধমর্ণত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহার প্রতিভার দিব্যজ্যোতিঃ কিছুমাত্র ম্লান হয় না। কালিদাস পূর্বগামিগণের কাব্য হইতে যাহা লইয়াছেন, তাহা শতগুণে ফিরাইয়া দিয়াছেন। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে হনূমানের দৌত্য ও রামচন্দ্রের বিলাপোক্তি এবং মেঘদূতে মেঘের দৌত্য ও নির্বাসিত যক্ষের বিলাপবার্তা—একটি অপরটির মূল বটে। কিন্তু মেঘদূতের কাব্যসুষমা ও রসগাম্ভীর্য রামায়ণকে শতগুণে অতিক্রম করিয়াছে। এ যেন—

সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।

"সূর্য পৃথিবী হইতে যে রস আহরণ করেন তাহা সহস্রগুণে ফিরাইয়া দিবার জন্যই।" কালিদাস কাহার

২১ **Sir Walter Raleigh : *Milton,* pp. 170-172.**

নিকট হইতে কি কি লইয়াছেন, তাহার পরিমাণই বা কত—কালিদাসের কাব্যালোচনায়, প্রয়োজনীয় হইলেও, ইহা প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা। কিন্তু কালিদাসের দিব্যপ্রতিভার স্পর্শে সেই সকল প্রাথমিক উপাদান কি অলৌকিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া, কি রসস্নিগ্ধ হইয়া বিপরিণত হইয়াছে, তাহাই মুখ্যভাবে বিচার্য। রামায়ণে রামবিলাপসত্ত্বেও কালিদাসের মেঘদূত তাহারই ব্যর্থ পুনরুক্তি নহে। বিভিন্ন প্রতিভাব্যক্তির (individual genius) মধ্যে পরস্পর সংবাদ অবশ্যই থাকিতে পারে। আচার্য আনন্দবর্ধন তাঁহার 'ধ্বনিকারিকা'র চতুর্থ উদ্দ্যোতে এই সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

সংবাদাস্তু ভবন্ত্যেব বাহুল্যেন সুমেধসাম্। নৈকরূপতয়া সর্বে তে মন্তব্যা বিপশ্চিতা॥
স্থিতং হ্যেতৎ সংবাদিন্যো হি মহাত্মনাং বুদ্ধয়ঃ। —ধ্বন্যালোক. ৪.১১

'সাদৃশ্য' মাত্রই পরিহরণীয় নহে। সাদৃশ্য বা সংবাদ আচার্য আনন্দবর্ধনের মতে তিন প্রকারের হইতে পারে। ১. প্রতিবিম্বকল্প, ২. আলেখ্যপ্রখ্য, এবং ৩. তুল্যদেহিতুল্য।—

সংবাদো হ্যন্যসাদৃশ্যং তৎ পুনঃ প্রতিবিম্ববৎ।
আলেখ্যপ্রখ্যবৎ তুল্যদেহিবচ্চ শরীরিণাম্॥

প্রথমজাতীয় সাদৃশ্য—অর্থাৎ প্রতিবিম্বকল্পে, মূল এবং অনুকরণের মধ্যে সম্বন্ধ যেন ঠিক বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব। মূলটি (orignal) যেন বিম্বস্থানীয় এবং অনুকরণটি তাহারই যেন ছায়া বা প্রতিবিম্ব। আকাশস্থিত পূর্ণচন্দ্রের সহিত সরোবরবক্ষে প্রতিফলিত চন্দ্রবিম্বের যেরূপ সম্বন্ধ—ঠিক সেইরূপ। বিম্ব যদি না থাকে প্রতিবিম্বের সত্তা কোথায়? গগনের চন্দ্র যদি মেঘে আচ্ছন্ন থাকে, জলচন্দ্রের অস্তিত্ব কোথায় থাকিবে? সুতরাং বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও, তত্ত্বদৃষ্টিতে তো অভিন্নই বটে। দ্বিতীয় প্রকার সাদৃশ্য—অর্থাৎ আলেখ্য-প্রখ্য সাদৃশ্য প্রথমটি হইতে কিয়দংশে প্রশংসনীয়। ইহাতে কবিপ্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপযোগিতা আছে, কবিশক্তির স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ কিছুটা আছে। তাই 'আলেখ্য-প্রখ্য' নামটিও সার্থক। চিত্রকর যখন আলেখ্য অঙ্কন করে, তখন সে মূলেরই হুবহু অনুকরণ করে না। চিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে মূল আকৃতিটিরই অন্তর্নিহিত স্বরূপ যথাযথভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কিছু কিছু পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হয়। মহাকবি কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তলের' ষষ্ঠ অঙ্কে চিত্রাঙ্কনের এই তত্ত্বটুকু মহারাজ দুষ্মন্তের মুখে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

যদ্‌যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা। তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্॥

সুতরাং চিত্রকরের স্বাধীনতা আছে। 'আলেখ্যপ্রখ্য'-কাব্যেও কবি মূল হইতে সমাহৃত বস্তুর সংস্কারসাধন করেন—স্বকীয় প্রতিভাশক্তির সাহায্যে। এই সংস্কারের ফলে মূল ও অনুকরণের মধ্যে পার্থক্যের উপলব্ধি হয়—কিন্তু সাদৃশ্য অবলুপ্ত হয় না।[২৮] পারমার্থিক দৃষ্টিতে এখানেও বস্তুদ্বয় একই—যদিও প্রতিভার দ্বারা কিছু সংস্কারসাধন করা হইয়াছে বটে। কেননা, আলেখ্য দেখিয়া মূলকেই মনে পড়ে, আলেখ্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও উপকরণের দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রাথমিকভাবে নিবদ্ধ হইতে

---

২৮ দ্রষ্টব্য: কিয়তাপি যত্র সংস্কারকর্মণা বস্তু ভিন্নবদ্ ভাতি।
তৎকথিতমর্থচতুরৈ-রালেখ্যপ্রখ্যমিতি কাব্যম্॥—রাজশেখর: কাব্যমীমাংসা. পৃ ৬৩

পারে না।[২৯] চিত্রের চিত্রত্ব আচ্ছাদিত করিয়া তাহার মূলটিকে পরিপূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলাই চিত্রকরের প্রধান লক্ষ্য। যে চিত্রকর যত নিপুণভাবে এই বিভ্রম (illusion) সৃষ্টি করিতে পারিবেন, তিনি ততই প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গেও অভিজ্ঞানশকুন্তলেরই ষষ্ঠ অঙ্কের কথা মনে পড়ে। শকুন্তলার স্বচিত্রিত আলেখ্যদর্শনে বিভ্রান্তদৃষ্টি মহারাজ দুষ্যন্তের প্রতি বিদূষকের সেই প্রতিবোধবাক্য—

ভো। চিত্তং কৃখু এদং।

"মহারাজ এ তো চিত্র!" এবং তৎশ্রবণে বিদূষকের প্রতি দুষ্যন্তের সেই স্মরণীয় নির্বেদোক্তি!—

বয়স্য! কিমিদমনুষ্ঠিতং পৌরোভাগ্যম্— স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরপি চিত্রীকৃতা কান্তা॥
দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।

"বয়স্য! একি করিলে? এতক্ষণ তন্ময় হইয়া আমি সাক্ষাৎ যেন প্রিয়াকে দর্শন করিতেছিলাম, আমার প্রতিবোধ জন্মাইয়া আবার জীবন্ত শকুন্তলাকে চিত্রে পরিণত করিলে!"

সাদৃশ্যের তৃতীয় প্রকার—'তুল্যদেহিতুল্য'। মনুষ্যলোকে কমনীয় আকৃতিদ্বয়ের মধ্যে কত ঘনিষ্ঠ সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়, একটি যেন অপরটিরই প্রতিকৃতি,—একটিকে দেখিয়া অপরটির কথা মনে পড়ে—

প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ!

কিন্তু, তাই বলিয়া কোনটিরই সৌন্দর্য, কোনটিরই চমৎকারিতা কি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়?— মোটেই নহে। রাজর্ষি জনক বাল্মীকির আশ্রমপদে অপরিচিত তাপসবেশধারী কুমার লবকে দেখিয়া যখন মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন—

বৎসায়াশ্চ রঘূদ্বহস্য চ শিশাবস্মিন্নভিব্যজ্যতে সা বাণী বিনয়ঃ স এব সহজঃ পুণ্যানুভাবোঽপ্যসৌ
সম্পূর্ণপ্রতিবিম্বিতেব নিখিলা সৈবাকৃতিঃ সা দ্যুতিঃ। হাহা দৈব! কিমুৎপথৈ-র্মম মনঃ পারিপ্লবং ধাবতি॥"

—তখন রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর লাবণ্য ও সন্নিবেশ কুমার লবের শরীরের মধ্যে প্রতিফলিত দেখিয়া, লবের সৌন্দর্য্য বিষয়ে তাঁহার মনে পৌনরুক্ত্যবুদ্ধির উদয় হয় নাই। বরং প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টির সমক্ষে লবের দেহসুষমা নব নব বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল! কারণ, কমনীয় আকৃতিদ্বয়ের অন্তরালে দুইটি প্রাণশক্তি পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্পন্দিত হইতেছে, সেই প্রাণেরই পরিস্পন্দ সাদৃশ্যের মধ্যেও বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিতেছে, একটিকে কেবলমাত্র অপরটির প্রাণহীন জড় পৌনরুক্ত্যে পরিণত হইতে দেয় নাই। সুন্দরী রমণীর মুখচ্ছায়ায় আমরা পূর্ণচন্দ্রের সুষমা দেখিতে পাই,—কিন্তু, তাই বলিয়া কি সুন্দরীর মুখচ্ছবি পূর্ণচন্দ্রেরই নিষ্ফল পুনরুক্তি মাত্র?—তাহা নহে। কেননা সেই শশিচ্ছায় মুখাভোগের অন্তরালে রহিয়াছে চেতন আত্মার চিরনবীন লীলা! সেইরূপ সাহিত্যেও দুইটি রচনার মধ্যে পরস্পরসংবাদ সত্ত্বেও যেখানে বাহ্য আকৃতিগত কমনীয়তা ও সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া কাব্যের আত্মস্বরূপ রসের বিচিত্র পরিস্পন্দজনিত নবীনতা ভাসমান, সেখানে একজন কবি আর একজনের নিছক 'অনুকারক' (imitator) নহেন।— দুইজনেই সমানভাবে নূতন স্রষ্টা। জগতের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় মহাকবি তাঁহারাও ত' বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা—উপনিষদে যিনি "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ" রূপে অভিহিত, তাঁহারই রচিত এই অনন্ত

---

২৯ তুলনীয়: অনুকারে হি অনুকার্য্যবুদ্ধিরেব চিত্রপুস্তাদৌ ইব ন তু সিন্দূরাদিবুদ্ধিঃ স্ফুরতি।
সাপি ন চারুত্বায়েতি ভাবঃ।—অভিনবগুপ্ত : লোচনব্যাখ্যা

বিশ্বসৃষ্টিরূপ মহাকাব্যেরই অক্ষয়ভাণ্ডার হইতে একই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন—একই সূর্য, একই চন্দ্র, একই নভস্তল, ষড়্‌ঋতুসমন্বিত সেই একই সংবৎসরের নিয়ন্ত্রিত পর্যায়, একই শৈলশ্রেণী এবং সমুদ্রমেখলা, চিরপুরাতনী অথচ চিরনবীনা এই ধরিত্রীর সেই একই রূপ মহাকবিগণের কাব্যের উপাদান জোগাইয়াছে! কই, সেজন্য ত মহর্ষি ব্যাস মহাকবি হোমরের অনুকর্তা নহেন, 'উত্তর-রামচরিত' নাটকের স্রষ্টা ভবভূতি আদিকবি রত্নাকরের নিছক অনুকর্তা নহেন, 'কাদম্বরী' স্রষ্টা ভট্টবাণ 'বৃহৎকথা' প্রণেতা গুণাঢ্যের অনুকর্তা নহেন! সেইজন্যই সহৃদয় চক্রবর্তী আচার্য আনন্দবর্ধন এই ত্রিবিধ সাদৃশ্যের পরস্পর তারতম্য বিচার প্রসঙ্গে মন্তব্য করিতে গিয়া যথার্থই বলিয়াছেন—

তত্র পূর্বমনন্যাত্ম তুচ্ছাত্ম তদনন্তরম্। তৃতীয়ং তু প্রসিদ্ধাত্ম নান্যসাম্যং ত্যজেৎ কবিঃ॥

কেননা,—

আত্মনোঽন্যস্য সদ্ভাবে পূর্বস্থিত্যনুযায্যপি। বস্তু ভাতিতরাং তন্ব্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্॥

—ধ্বন্যালোক. ৪. ১৩-১৪

"প্রথম প্রতিবিম্বকল্প প্রকারটি বিম্বের সহিত অভিন্ন; দ্বিতীয় আলেখ্যপ্রখ্য প্রকারে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিলেও চমৎকারিতার অভাবে তাহা নিতান্তই তুচ্ছ; কিন্তু তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ তুল্যদেহিতুল্য প্রকারে স্বতন্ত্র সত্তার স্ফুরণ প্রসিদ্ধ;— সেইজন্য কবির পক্ষে সর্বথা অন্যসাদৃশ্য পরিহরণীয় নহে। কেননা,— পৃথক্ আত্মার অস্তিত্ব যদি সংবেদনগোচর হয়, তবে পূর্বমর্যাদার অনুযায়ী হইলেও কাব্যবস্তু নিরতিশয় সৌন্দর্য লাভ করিয়া থাকে। যেমন তন্বী রমণীর শশিচ্ছায় মুখমণ্ডল আত্মার স্ফুরণের ফলে অনির্বচনীয় সুষমার অধিকারী হয়, সেইরূপ।"[৩০] সেই জন্যই রাজশেখর 'প্রতিবিম্বকল্প' কাব্যবস্তুর পরিকল্পনাকে 'অকবিত্বদায়ী' বলিয়াছেন— সুকবির পক্ষে ইহা সর্বতোভাবে বর্জনীয়—

"সোঽয়ং কবে-রকবিত্বদায়ী সর্বথা প্রতিবিম্বকল্পঃ পরিহরণীয়ঃ।"[৩১]

অপরপক্ষে, আলেখ্যপ্রখ্য ও তুল্যদেহিতুল্য ভেদদ্বয় কবিগণের গ্রহণীয় মার্গ।[৩২] এই তৃতীয় 'তুল্যদেহিতুল্য' ভেদকেই 'বক্রোক্তিজীবিত'-কার কুন্তকের অভিমত প্রবন্ধবক্রতার অন্যতম প্রকাররূপে পরিগণনা করা যাইতে পারে। একই মূলবস্তু বিভিন্ন মহাকবির লেখনীতে বিচিত্ররসে অভিষিক্ত হইয়া নবনবরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে—সহৃদয়চিত্ত তখন তাহাদের বাহ্যসাদৃশ্যের পরিধি উত্তীর্ণ হইয়া আন্তর রসবৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। একই রামায়ণকথা অবলম্বন করিয়া কত কবিই না তাঁহাদের কাব্য ও নাট্য

৩০ তুলনীয়: "তত্র পূর্বং প্রতিবিম্বকল্পং কাব্যবস্তু পরিহর্তব্যং সুমতিনা। যতস্তদনন্যাত্ম তাত্ত্বিকশরীরশূন্যম্। তদনন্তর-মালেখ্যপ্রখ্যমন্যসাম্যং শরীরান্তরযুক্তমপি তুচ্ছাত্মত্বেন ত্যক্তব্যম্। তৃতীয়ং তু বিভিন্নকমনীয়শরীরসদ্ভাবে সতি সসংবাদমপি কাব্যবস্তু ন ত্যক্তব্যং কবিনা। ন হি শরীরী শরীরিণাঽন্যেন সদৃশোঽপ্যেক এবেতি শক্যতে বক্তুম্।—আনন্দবর্ধনঃ ধ্বন্যালোকবৃত্তি. ৪.১৩।

৩১ কাব্যমীমাংসা. পৃ. ৬৮

৩২ তুলনীয়: তা ইমা আলেখ্যপ্রখ্যস্য ভিদাঃ। সোঽয়মনুগ্রাহ্যো মার্গঃ।—পৃ. ৭১। অপি চ তা ইমাস্তুল্যদেহিতুল্যস্য পরিসংখ্যাঃ। 'সোঽয়মুল্লেখবাননুগ্রাহ্যো মার্গঃ' ইতি সুরানন্দঃ॥—ঐ. পৃ. ৭৫।

রচনা করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহাদের 'বক্রতা' সম্পাদনের অলৌকিক প্রতিভাশক্তি প্রত্যেকটির মধ্যেই এক অভিনব প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়াছে। তাই কুন্তকাচার্য বলিয়াছেন—

অপ্যেককক্ষ্যয়া বদ্ধাঃ কাব্যবন্ধাঃ কবীশ্বরৈঃ। কথোন্মেষসমানেঽপি বপুষীব নিজৈর্গুণৈঃ।
পুষ্ণন্ত্যনর্ঘ্যমন্যোন্যবৈলক্ষণ্যেন বক্রতাম্॥ প্রবন্ধাঃ প্রাণিন ইব প্রভাসন্তে পৃথক্ পৃথক্॥[৩৩]

—বক্রোক্তি জীবিত. পৃ. ২৪৪-৫

রসের স্পর্শেই কুৎসিত সুন্দর হইয়া উঠে, যাহা লৌকিক তাহা অলৌকিকত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়, যাহা নির্জীব তাহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে, এবং যাহা চিরপুরাতন তাহাই চিরনবীন রূপ পরিগ্রহ করিয়া সহৃদয়হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। কেননা, রসই অন্তর্নিহিত আত্মবস্তু, তাহাই কাব্যের রসায়নস্বরূপ। আচার্য আনন্দবর্ধনের সেই সুপ্রসিদ্ধ উপমাটি এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়—

দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ। সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ॥—ধ্বন্যালোক. ৪. ৪

কিন্তু একই বস্তু বিভিন্ন কবিকর্তৃক বর্ণিত হইলেও পুনরুক্ত হয়না কিজন্য? ইহার দার্শনিক ভিত্তি কি? আমাদের প্রাচীন সাহিত্যমীমাংসকগণ এই প্রশ্নেরও গূঢ় রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই বিশ্বের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের দুইটি রূপ (aspect) আছে—একটি তাহার 'সামান্য' (universal) রূপ, এবং আর একটি তাহার স্বকীয় রূপ, তাহার যে 'স্বলক্ষণ' স্বভাব, যে স্বরূপটুকু শুধু তাহারই নিজের, যাহার জন্য বিশ্বের অন্য সকল বস্তু হইতে তাহা স্বতন্ত্র—সেই বিশিষ্ট রূপটুকু শুধু মহাকবিগণের প্রাতিভদৃষ্টির (intuition)ই গোচর হইয়া থাকে, মহাকবিগণই অনুগুণ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা তাহার সেই অনন্যসাধারণ স্বরূপটুকু লোকলোচনের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতে পারেন। আমরা যেখানে কোনও বস্তুর সন্নিবেশরেখাটিমাত্র (outline) দেখিতে পাই তখন কবির তত্ত্ববেধী প্রাতিভদৃষ্টির সম্মুখে সেই বস্তুর মূলীভূত উপাদান পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়া উঠে। প্রাকৃতজনের লৌকিক দৃষ্টি বস্তুর বাহ্য আবরণ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু কবির প্রাতিভদর্শন সেই বস্তুর বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া গভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া থাকে। তাই লৌকিক বাক্য যেখানে অস্বচ্ছ, নির্বিশেষ, সামান্যপর্যবসায়ী, কবিবাক্য সেখানে স্বচ্ছ ও বিশেষপর্যবসায়ী। কাশ্মীরীয় সাহিত্যমীমাংসক আচার্য মহিমভট্ট তাঁহার ব্যক্তিবিবেক গ্রন্থে প্রতিভার এই রূপটি নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি কারিকায় অতি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

[উচ্যতে] বস্তুন-স্তাবদ্ দ্বৈরূপ্যমিহ বিদ্যতে। অতএবাভিধেয়ং তে সামান্যং বোধয়ন্ত্যলম্॥
তত্রৈকমত্র সামান্যং যদ্ বিকল্পৈকগোচরঃ॥ বিশিষ্টমস্য যদ্রূপং তৎ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ।
স এব সর্বশব্দানাং বিষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। স এব সৎকবিগিরাং গোচরঃ প্রতিভাভুবাম্॥

---

৩৩ দ্রষ্টব্য: ইদমত্র তাৎপর্য্যম্—একামেব কামপি কন্দলিতকামনীয়কাং কথাং নির্বহন্তি-র্বহুভিরপি কবিকুঞ্জরৈর্নিবধ্যমানা বহবঃ প্রবন্ধাঃ মনাগপ্যন্যোন্যসংবাদমনাস্বাদয়ন্তঃ সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদকং কমপি বক্রিমাণমাদধতি। যথা রামাভ্যুদয়-উদাত্তরাঘব-বীরচরিত-বালরামায়ণ-কৃত্যারাবণ-মায়াপুষ্পক-প্রভৃতয়ঃ। তেহি প্রবন্ধপ্রবরাঃ তেনৈব কথামার্গেণ নিরর্গলরসাসারগর্ভসম্পদা প্রতিপদং প্রতিবাক্যং প্রতিপ্রকরণঞ্চ প্রকাশমানাভিনবভঙ্গীপ্রায়াঃ···ভ্রাজিষ্ণবো নবনবোন্মীলিতনায়কগুণোৎকর্ষা-স্তেষাং হর্ষাতিরেকমনেকশোঽপ্যাস্বাদ্যমানাঃ সমুৎপাদয়ন্তি সহৃদয়ানাম্।—ঐ. কুন্তকরচিতবৃত্তি. পৃ. ২৪৪

যতঃ—

রসানুগুণশব্দার্থচিন্তাস্তিমিতচেতসঃ। সা হি চক্ষু-র্ভগবতস্তৃতীয়মিতি গীয়তে।
ক্ষণং স্বরূপস্পর্শোত্থা প্রজ্ঞৈব প্রতিভা কবেঃ॥ যেন সাক্ষাৎকরোত্যেষ ভাবাংস্ত্রৈকাল্যবর্ত্তিনঃ॥[৩৪]

'কাদম্বরী' কথার প্রারম্ভেই শবরযূথকর্ত্তৃক নিহত শুকশাবকগণের বর্ণসুষমার সেই স্মরণীয় বর্ণনাটি এপ্রসঙ্গে উদাহরণরূপে উদ্ধার করা যাইতে পারে—

কিমিব হি দুষ্করমকরুণানাম্। যতঃ স তমনেকতালতুঙ্গমভ্রংকষশাখাশিখরমপি সোপানৈরিবাযত্নেনৈব পাদপমারুহ্য তানস্মুপজাতোৎপতনশক্তীন্ কাংশ্চিদল্পদিবসজাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শাল্মলীকুসুমশঙ্কামুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুদ্ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিনসংবর্ত্তিকানুকারিণঃ, কাংশ্চিদর্কফলসদৃশান্, কাংশ্চিল্লোহিতায়মানচঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্‌বিঘটিত-দলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্‌বহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃকম্পব্যাজেন নিবারয়ত ইব প্রতীকারাসমর্থান্, একৈকতয়া ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখান্তরেভ্যঃ কোটরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ—অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ॥

একই বর্ণের সূক্ষ্ম তারতম্যটুকু ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কবির কি আবেগ! বর্ণান্ধ (colour-blind) প্রাকৃতজনের দৃষ্টিতে সূক্ষ্মভেদজনিত বর্ণের এই উৎকর্ষটুকু কি ধরা পড়িত? যাযাবর কবি রাজশেখর সত্যই বলিয়াছেন—

অন্যদৃষ্টচরে হ্যর্থে মহাকবয়ো জাত্যন্ধাঃ তদ্বিপরীতে তু দিব্যদৃশঃ।

—অন্যে বস্তুর যে রূপ দেখিতে পায় মহাকবিগণ তদ্বিষয়ে স্বভাবতঃই জাত্যন্ধ; কিন্তু বস্তুর যে স্বরূপটি প্রাকৃতজনের অবাঙ্‌মনসগোচর, কবির সারস্বত চক্ষুর দিব্যদৃষ্টি তদ্বিষয়েই প্রবৃত্ত হয়। এ যেন—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

কিন্তু শুধু অর্থদৃষ্টিই কবিত্বের একমাত্র উপাদান নয়, সেই অর্থই ভাষার মধ্য দিয়া 'বর্ণন' করিবার শক্তিও তাহার পরিপূরকরূপে অপেক্ষিত। 'দর্শন' এবং 'বর্ণন'—intuition এবং expression—এই উভয়ের সমবায়েই কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ।[৩৫] কিন্তু কবিত্বের পক্ষে এই উভয়বিধ উপাদানের অপেক্ষা থাকিলেও, কোনও যুগে 'দর্শনে'র (intuition) উপরই অধিকতর অভিনিবেশ প্রদর্শিত হইয়াছে, কোনও যুগে বা বর্ণনের expression সৌষ্ঠবকেই প্রাধান্য দান করা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যেতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে 'দর্শনে'র অপরোক্ষতা (immediacy) ও তীব্রতাই কবিত্বের মানদণ্ডরূপে পরিগণিত হইত বলিয়া মনে হয়। 'বর্ণন'-সৌষ্ঠব ছিল যেন আনুষঙ্গিক, অবলীলাসম্ভূত। সেই যুগের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত। কিন্তু কালক্রমে তপস্যা ও সমাধির ক্রমিক অবনতির ফলে যখন কবিগণের প্রাতিভদর্শন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন 'দর্শন' ছাড়িয়া 'বর্ণন' রূপ দ্বিতীয় উপাদানের উপরই প্রাধান্য আরোপিত হইতে লাগিল। এই যুগের মহাকবিগণ কাব্যবস্তুর পরিকল্পনার জন্য স্ব স্ব প্রাতিভদর্শনের উপর নির্ভর না করিয়া পূর্বযুগের তপোনিষ্ঠ, সমাধিনিরত মহাকবিগণের সারস্বত চক্ষুর দ্বারা উন্মীলিত অর্থের অপূর্ব, অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই তাহা আহরণ করিতে লাগিলেন। এই যুগে কবিত্বের মানদণ্ড হইল ভাষার অপূর্ব কারুকার্য, শব্দচয়নের অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য, নির্বাচিত শব্দের

---

৩৪ ব্যক্তিবিবেক পৃ. ৯০-৯১ (কাশী সংস্করণ)

৩৫ দর্শনাদ বর্ণনাচ্চাপি রূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ—ভট্টতৌত : কাব্যকৌতুক।

সন্নিবেশের বিচিত্র কৌশল। অর্থদৃষ্টি হইতে শব্দশিল্পের দিকে, matter হইতে formএর দিকে, কবিগণের দৃষ্টি সঞ্চারিত হইল। অর্থাহরণের জন্য তাঁহারা নির্ভর করিতেন পূর্বযুগীয় কবিগণের কাব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, পরম্পরায়াত, সকল কবিসম্প্রদায়ের সাধারণ নীবী—(capital) স্থানীয়[৩৬] 'কবিসময়' (poetic conventions) শাস্ত্রের উপর। রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে 'কবিসময়ে'র আলোচনাপ্রসঙ্গে এই ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতিই যেন গূঢ়ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন—

পূর্বে হি বিদ্বাংসঃ সহস্রশাখং সাঙ্গং চ বেদমবগাহ্য, শাস্ত্রাণি চাববুধ্য, দেশান্তরাণি দ্বীপান্তরাণি চ পরিভ্রম্য, যানর্থানুপলভ্য প্রণীতবন্ত—স্তেষাং দেশকালান্তরবশেন অন্যথাত্বেঽপি তথাত্বেনোপনিবন্ধো যঃ স কবিসময়ঃ। কবিসময়শব্দশ্চায়ং মূলমপশ্যদ্ভিঃ প্রয়োগমাত্রদর্শিভিঃ প্রযুক্তো রূঢ়শ্চ ॥[৩৭]

পূর্বযুগের কবিগণ ছিলেন 'অযোনি' কবি, পরবর্তী যুগের কবিগণ নিয়মতঃই 'অন্যযোনি'। এইযুগে অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্ভব। 'বর্ণনে'র সৌষ্ঠবসম্পাদনের জন্য কত বিচিত্র মতবাদের সৃষ্টি হইতে লাগিল, কত বিভিন্ন প্রস্থান, কত সংখ্যাতীত বিধিনিষেধ! কবিযশঃপ্রার্থী লেখকগণের শুধু অর্থদৃষ্টিবিষয়েই নহে, বর্ণনবিষয়েও নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যের আর অবসর রহিল না। মহাকবি ভাস, মহাকবি কালিদাস, মহাকবি অশ্বঘোষ এই যুগের প্রতিনিধি। তাঁহাদের লেখনী তখন অলঙ্কারশাস্ত্রের অসংখ্য বিধিনিষেধের দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলের দ্বারা নিগড়িত —"চীননারীসম পদ তব লৌহ ফাঁসে"। আর্যযুগের মহাকবিগণের কাব্যবস্তু চিন্তাসমকালেই রসস্নিগ্ধ হইয়া প্রসূত হইত—সুন্দর ও কুৎসিত, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, জীব ও জড়, ভীষণ ও রমণীয়—সকলই তাঁহাদের চিন্তায় ও লেখনীতে তুল্যভাবে রূপপরিগ্রহ করিয়া ধন্য হইয়াছে—একটি হইতে অপরটিকে পৃথক করিবার জন্য তাঁহাদের কোনও প্রযত্ন যেন ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারত যেন প্রাকৃতিক আরণ্যস্থলী—সেখানে একদিকে যেমন ফলপুষ্পবিশোভিত বনস্পতির অনির্বচনীয় দৃষ্টিবিলোভি রমণীয়তা অপরদিকে সেইরূপ তরঙ্গসঙ্কুল, গ্রাহবিক্ষোভিত স্রোতস্বতীর ত্রাসজনক, তির্যক্ কটাক্ষ; একদিকে যেমন তুষারমৌলি পর্বতের গগনলেখি তুঙ্গতা, অপরদিকে সেইরূপ নির্জন, নিস্তব্ধ পর্বতকন্দরের নিঃসীম গভীরতা, একদিকে যেমন লতাপাদপশ্যামল বিশাল রমণীয় প্রান্তর, অপরদিকে সেইরূপ শস্পলেশবিবর্জিত ধূসর মরুস্থলী। ভবভূতির সেই প্রসিদ্ধ জনস্থান বর্ণনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িবে—

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎস্বল্পাম্ভসো যাস্বয়ং
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরভোগভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ। তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে ॥—উত্তরচরিত ৩, ১৬

এ যেন—

অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।

রামায়ণ ও মহাভারত প্রকৃতির মতই নৈসর্গিক সৃষ্টি।[৩৮] এই কাব্যদ্বয়ের ভাষা ও রীতি, পরবর্তী

৩৬ তুলনীয়: সকল-সৎকবিসার্থ-সাধারণী খল্বিয়ং বাল্মীকীয়া সুভাষিতনীবী।—মুরারিকৃতঃ 'অনর্ঘরাঘবঃ', প্রস্তাবনা।

৩৭ কাব্যমীমাংসা, পৃ. ৭৮। এইযুগে কবিগণ যদি এমন কিছু বর্ণনা করিতেন যাহা কবিসময়বিরুদ্ধ, তবে তাহা সাহিত্যিক দোষের ('খ্যাতিবিরুদ্ধতা') মধ্যে পরিগণিত হইত।

যুগের অলঙ্কারশাস্ত্রের সঙ্কীর্ণ বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে—বর্ণনীয় বস্তুর মত ভাষাও যেন নৈসর্গিক সারস্বতনিঃস্যন্দ![৩৯]

অপরদিকে মহাকবি কালিদাসের কাব্য যেন নিপুণ শিল্পিকর্তৃক সযত্ন-পরিকল্পিত লীলোদ্যান। কালিদাস সম্প্রদায়ক্রমাগত কবিসময়ের অলঙ্ঘনীয় বর্ণনপদ্ধতি, অলংকারশাস্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সৎকবিসম্মত সহস্র বিধিনিষেধ যেন প্রসন্নচিত্তে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও বিধিনিষেধের সহস্র শৃঙ্খলের দ্বারা নিগড়িত হইয়াও তাঁহার সারস্বতপ্রতিভা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, পীড়িত হয় নাই। তাঁহার সারস্বতপ্রতিভার প্রতি শৃঙ্খলিত পদক্ষেপে মণিনূপুরের তানলয়পরিশোধিত, রাগপরিবাহী শিঞ্জিতধ্বনি উদ্‌গত হইয়াছে, শৃঙ্খলের শ্রবণকটু ছন্দোহীন রুক্ষ ঝঙ্কার শ্রোতার চিত্তকে নিপীড়িত করে নাই। অন্য কবির পক্ষে যাহা বন্ধনস্বরূপ কালিদাস যেন তাহাকেই স্বকীয় প্রতিভার মুক্তির উপায়রূপে পরিণত করিয়াছেন!—

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ!

শব্দচয়নের ও শব্দবিন্যাসরীতির যে নৈসর্গিক প্রতিভা লইয়া কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার বলেই পূর্বকবিগণের কাব্যভাণ্ডার হইতে আহৃত অর্থসম্ভারও তাঁহার লেখনীতে অপূর্ব সুষমা ও কমনীয়তা পরিগ্রহ করিয়া এক অনির্বচনীয় রসময়তা লাভ করিয়াছে। কালিদাসের প্রতিটি শব্দ অপরিবর্তনীয়, প্রতিটি বিন্যাস আম্নায়বচনের মতই অপ্রকম্প্য। আচার্য আনন্দবর্ধনের ভাষায় কালিদাস-কাব্যের প্রতিটি শ্লোকই 'উক্ত্যন্তরাশক্য-চারুত্বহেতু'। ইহাই পরবর্তী আচার্যগণের মতে শব্দপাকের লক্ষণ।[৪০] মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে সেই 'শব্দপাক' চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে।

---

৩৮ Shakespeareএর নাট্য সম্বন্ধে Ben Jonsonএর উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

Nature herself was proud of his designs,
And joy'd to wear the dressing of his lines.

অপিচ—"Shakespeare, with whom quick Nature died."—Stratford Churchএ মহাকবির স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ লিপি।

৩৯ তুলনীয়: **The dogmatic grammarians, a race not yet exinct, make rules for language as the Aristotelians made rules for the Epic poem, and impose their chill models on submissive decadence. Much of Shakespeare's language is language hot from the mind and only partially hardened into grammar. It cannot be judged save by those whose ease of apprehension goes some way to meet his ease of expression.—Sir Walter Raleigh : *Shakespeare* (English men of Letters Series, Macmillan & Co.) p. 28**

৪০ দ্রষ্টব্য: "পদনিবেশনিষ্কম্পতা পাকঃ" ইত্যাচার্যাঃ। তদাহ:
"আবাপোদ্ধারণে তাবদ্ যাবদ্ দোলায়তে মনঃ।
পদানাং স্থাপিতে স্থৈর্য্যে হন্ত সিদ্ধা সরস্বতী॥"
"আগ্রহপরিগ্রহাদপি পদস্থৈর্য্যপর্য্যবসায়-স্তস্মাৎ পদানাং পরিবৃত্তিবৈমুখ্যং পাকঃ।" ইতি বামনীয়াঃ॥ তদাহ:—
"যৎপদানি ত্যজন্ত্যেব পরিবৃত্তিসহিষ্ণুতাম্। তং শব্দন্যায়নিষ্ণাতাঃ শব্দপাকং প্রচক্ষতে॥"
—কাব্যমীমাংসা, পৃ. ২০।

কালিদাস রামায়ণ হইতে মেঘদূতের কাব্যবস্তু, প্রেরণা, এমন কি অনেকস্থলে পদ ও ভাবার্থ হুবহু আহরণ করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের কবিপ্রতিভার উত্তাপে সেই সকল প্রাথমিক উপাদান, অগ্নির উত্তাপে সুবর্ণপিণ্ডের ন্যায়, গলিত ও দ্রুত হইয়া, তাহাদের যতকিছু 'শ্যামিকা' (alloy) সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অপরূপ ঔজ্জ্বল্য ও পরিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে। রামায়ণে যাহা ছিল বিক্ষিপ্ত, মেঘদূতে তাহাই সংহত আকার ধারণ করিয়াছে, যাহা ছিল বিস্তীর্ণ তাহাই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, যাহা ছিল অর্থান্তরসম্মিশ্র তাহাই অবিমিশ্র পরিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন আলংকারিকগণের পরিভাষায় কালিদাস যথার্থই 'দ্রাবক' কবি।—

> ভ্রামকশ্চুম্বকঃ কিঞ্চ কর্ষকো দ্রাবকশ্চ সঃ। অপ্রত্যভিজ্ঞেয়তয়া স্ববাক্যে নবতাং নয়েৎ।
> স কবি-র্লৌকিকো হ্যন্তু চিন্তামণি-রলৌকিকঃ॥ যো দ্রাবয়িত্বা মূলার্থং দ্রাবকঃ স কবি-র্মতঃ॥
>
> —কাব্যমীমাংসা, পৃ. ৬৪-৫

বিশদমণিদর্পণে প্রতিফলিত চন্দ্রকিরণ যেমন সংহত হইয়া অপূর্ব কান্তি ও ঔজ্জ্বল্য লাভ করে, সেইরূপ কালিদাসের প্রতিভার বিমল আদর্শে আদিকবির বিক্ষিপ্ত সূক্তি ও অর্থসম্ভার প্রতিফলিত হইয়া অনাস্বাদিতপূর্ব চমৎকারিতা ও রসসৌষ্ঠবে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই মেঘদূতকে আমরা কালিদাসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দানরূপে পরিগণনা করিয়া থাকি, তাই মেঘদূত পাঠকালে আমরা রামচন্দ্রের বিলাপোক্তি বিস্মৃত হইয়া থাকি।—তখন 'করুণবিপ্রলম্ভ'-রসধারায় আপ্লুত সহৃদয়-চিত্ত নিঃস্পন্দ, স্থির; কালিদাসের অধমর্ণত্ব লইয়া বিব্রত হইবার সামর্থ্য বা অবসর তাহার কোথায়? প্রাচীন ভারতের প্রথিতনামা মহিলাকবি বিজ্জকার স্মরণীয় সূক্তি উদ্ধার করিয়া আমরা রসভারমন্থর, রোমাঞ্চিত কলেবর সহৃদয়ের সেই নির্বাক, ধ্যানগম্ভীর মূর্তির উদ্দেশেই আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবদ্ধ করি, সমালোচকের বুদ্ধিদীপ্ত মুখরতা যাহার নিকট ম্লান—

> কবে-রভিপ্রায়-মশব্দগোচরং বদন্তি-রঙ্গৈঃ স্ফুটরোম-বিক্রিয়ৈ-
> স্ফুরন্তমার্দ্রেষু পদেষু কেবলম্। র্জনস্য তূষ্ণীম্ভবতোহয়মঞ্জলিঃ॥

হৃদয়-কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি।
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা— উপায় কী করি।
ফুটে ফুটে কমল ফুটায় না হয় শেষ।
এই কমলের যে এক মধু রস যে তার বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারে না যে তাই।
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা— মুক্তি কোথাও নাই।

—বিশা ভুঁঞিমালী

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

১৮৫১ - ১৯০৩

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : শিক্ষা : বিবাহ

১২৫৮ সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৮৫১) খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন কপোতাক্ষী-তীরবর্তী সারসা গ্রামে ঠাকুরদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নবকুমার মুখোপাধ্যায়। সারসারই পরপারে সাগরদাঁড়ি, মাইকেল মধুসূদনের জন্মভূমি।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাসের পাঠারম্ভ হয়। তিনি ২৪পরগণা গোবরডাঙ্গার ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়ন করেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে স্কুলে তাঁহার সুনাম ছিল। এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, ফলে তাঁহার পরীক্ষাও দেওয়া হয় নাই, পড়াশুনাও বন্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ১৮ বৎসর। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও ঠাকুরদাসের অধ্যয়ন-স্পৃহা চিরদিন বলবতী ছিল। তিনি বলিতেন, 'পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও কবিগণের মধ্যে আমি মেকলে কার্লাইল এমার্সন বায়রন ও স্কট এবং দেশীয়গণের মধ্যে মুকুন্দরাম মাইকেল হেমচন্দ্র দীনবন্ধু কেশব বঙ্কিম কালীপ্রসন্ন এবং অক্ষয়চন্দ্রের নিকট ঋণী।'

পিতার মৃত্যুর অল্প দিন পরেই ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়। সংসারের গুরুভার নিঃস্ব ঠাকুরদাসের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে, অন্নচিন্তায় তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয়।

অন্নসংস্থান

ঠাকুরদাসের প্রথম চাকরি—স্বগ্রামস্থ মাইনর-স্কুলের হেডমাস্টারি; ইহা বোধ হয় ১৮৭৩ সনের কথা। কিছু দিন পরে স্বাস্থ্যলাভের আশায়—কতকটা কাজকর্মের চেষ্টাতেও বটে—তাঁহাকে বিহার অঞ্চলে গমন করিতে হয়। তথায় অবস্থানকালে তিনি ছাপরা স্কুলের শিক্ষকের পদ লাভ করেন। অবশেষে ১৮৭৬ সনে দ্বারভাঙ্গা মহারাজের কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের অধীনে তাঁহার একটি ভাল চাকরি জুটিয়া যায়। এই পদে তিনি ১৮৯১ সনের শেষ পর্যন্ত বাহাল ছিলেন। অতঃপর তিনি 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করেন।[১] আড়াই বৎসর কৃতিত্বের সহিত সহকারী সম্পাদকের কার্য করিবার পর 'বঙ্গবাসী'র সহিত তাঁহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। আনুমানিক ১৮৯৮ সনে তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের

---

১ ১৮৯২, ২৩এ ডিসেম্বর তারিখে নবীনচন্দ্র সেন একখানি পত্রে ঠাকুরদাসকে লেখেন: 'I am indeed sorry to hear that you have left your late service and turned on a new leaf since. On which paper staff are you serving now and what are your prospects?' ঠাকুরদাসকে লিখিত নবীনচন্দ্রের পত্রাবলী—দ্র° 'ভারতবর্ষ,' জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক ১৩২৪।

স্টেটে একটি চাকরি লাভ করেন, কিন্তু সে অতি অল্প দিনের জন্য।[২] ঠাকুরদাস কিছু দিন 'বঙ্গনিবাসী' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ চাকরি—যশোহর চৌগাছার ঘোষবাবুদের বাটীতে ম্যানেজারি।

মৃত্যু

যশোহরে কর্মকালে ঠাকুরদাস পীড়াক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়া কাঁটাপুকুরে সপরিবারে অবস্থান করিতেছিলেন। এইখানেই ১৩১০ সালের ১১ই কার্তিক (২৮ অক্টোবর ১৯০৩) তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

গ্রন্থাবলী

ঠাকুরদাসের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বেশি নহে। আমরা যে কয়খানির সন্ধান করিতে পারিয়াছি, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিলাম। বন্ধনী-মধ্যে ইংরেজি প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত :

১। **দুর্গোৎসব** ;—উদ্ভটকাব্য। ১২৯০ সাল (৩০-৯-১৮৮৩)। পৃ. ৪৬।

ইহা "ষড়ানন্দ শর্ম্মা প্রণীত সহজ ভাষায়, সরল কথায়, সতেজ গাথায়, বঙ্গের দুর্গোৎসব-বর্ণন।" পরবর্তী কালে ঠাকুরদাসের 'শারদীয় সাহিত্যে' প্রধানতঃ দশম স্তবকরূপে ইহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২। **সাহিত্যমঙ্গল** (সন্দর্ভ)। ১২৯৫ সাল (৫-১২-১৮৮৮)। পৃ. ৮৮।

এই মৌলিক প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য বিষয়—কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা এবং সাহিত্য ও ধর্মমত-বিবৃতি।

৩। **সাত-নরী** (খণ্ডকাব্য)। ? (ইং ১৮৮৮)[৩]। পৃ. ৩৬।

ইহা "প্রবীণ কারিকর কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত ও অঘোরনাথ কুমার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।"

৪। **শারদীয় সাহিত্য**। ১৩০৩ সাল (২-৯-১৮৯৬)। পৃ. ২০২।

"শারদ মহোৎসবের সর্ব্বাঙ্গীণ চিত্র ;—সাময়িক ও সামাজিক 'ফটো'। পদ্য ও গদ্য কবিতাময় ও কোমল গল্পময় ১৪টি স্তবকে সম্পূর্ণ।"

৫। **সহর-চিত্র** (কৌতুক চিত্রাবলী—১)। ১৩০৮ সাল (১৫-৭-১৯০১)। পৃ. ৭০।

সূচী : শীতসুন্দরী, বিডন্‌বালা, ফাল্গুনের হাওয়া, বঙ্গাব্দ বিলাপ, শৈবাল বিধবা, সহর-বধূ ও গ্রাম্য-বধূ।

---

২ ১৩০৬, ৭ই কার্তিক তারিখে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে ঠাকুরদাসকে লেখেন : 'আমাদের সম্বন্ধ পরিত্যাগের পর হইতে আপনার আর কোনও চিঠিপত্র পাই নাই।' ১৩০৩ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'জন্মভূমি' (পৃঃ ১১৭) পাঠে জানা যায়, ঠাকুরদাস তখন বেকার। তিনি সম্ভবতঃ ১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় ঠাকুরবাড়ীতে একটি কর্ম পান। ঠাকুরদাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী—দ্র॰ 'ভারতবর্ষ,' বৈশাখ ও কার্তিক ১৩২৪ ; শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র-সম্পাদিত 'কবি-প্রণাম' (ইং ১৯৪১)।

৩ ১২৯২-৯৫ সালের মধ্যে যে 'সাত-নরী' প্রকাশিত, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত 'কুলীনপত্নী' কবিতাটি ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'নবজীবনে' প্রথমে স্থান পাইয়াছিল, সুতরাং ইহার পরে—কিন্তু ১২৯৫ সালের পৌষ মাসের পূর্বে যে পুস্তিকাখানি প্রকাশিত তাহার প্রমাণ, ১২৯৫ সালের পৌষ-সংখ্যা 'মালঞ্চে' ইহার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছে। ১২৯৬ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা 'কর্ণধারে' পুস্তিকাখানি সমালোচিত হইয়াছে।

ইহার প্রথম ও তৃতীয়টি ১৩০৩ সালের পৌষ ও চৈত্র সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৬। **সোহাগ-চিত্র** (কৌতুক চিত্রাবলী—২)। ১৩০৮ সাল (১৫-৭-১৯০১)। পৃ. ৪৬।

সূচী : সুইট হার্ট, শেফালি-বালা, রাসে—রসবতী, সামার-সুট, বড়দিনে—বিরহিণী, সহর গুলজার, সোহাগ-সাহিত্য।

সাময়িকপত্র-সম্পাদন

দ্বারভাঙ্গায় অবস্থানকালে পত্রিকা-সম্পাদন-কার্যে ঠাকুরদাসের হাতে খড়ি হয়। তাঁহার অবসরকালটুকু মাতৃভাষার অনুশীলনেই ব্যয়িত হইত। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকাগুলির পরিচয় দিতেছি।

'পাক্ষিক সমালোচক': ইহা একখানি "সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থব্যবহার, রাজনীতি, পুরাতত্ব, প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন।" প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—ফাল্গুন, প্রথম পক্ষ, ১২৯০ (ইং ১৮৮৪)। ইহা বঙ্গদেশ হইতে বহু দূর দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রকাশিত হয়। প্রথম কয়েক সংখ্যা কলিকাতায় মুদ্রিত হইবার পর 'পাক্ষিক সমালোচক' দ্বারভাঙ্গা ট্রেডিং কোম্পানির ইউনিয়ন যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুল সমেত) ছিল ৪৲ টাকা।

১৩২৩ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' মুদ্রিত ঠাকুরদাসের 'পাক্ষিক সমালোচক' প্রবন্ধে পত্রিকাখানির বিস্তৃত পরিচয় আছে;[৪] উহা হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :

"১৮৮৩-৮৪ খৃঃ অব্দে আমরা ভিন্ন ভিন্ন আপিসের কয়েকটি কেরাণী মিলিয়া এক কেরাণীদুর্লভ কঠিন কাজে হাত দিয়াছিলাম। সে বড়ই দুঃসাহসের কাজ,—কাগজ। আমরা বঙ্গদেশের বহির্ভাগে বিদেশে বসিয়া এক বাঙ্গালা কাগজ বাহির করিয়াছিলাম।··কাজে কেরাণী ও শক্তিতে শফরী হইলেও, সাহিত্যে 'ছোট নজর' ছিল না।·অসমসাহসিক কার্য্য,—আমরা বাহির করিয়াছিলাম এক বৃহৎ কাগজ, সাহিত্যাদি সমালোচনা বিষয়ক এক পাক্ষিক পত্রিকা। সেরূপ আকৃতির এবং প্রকৃতির পাক্ষিক পত্র এ দেশে তাহার পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই; তাহার পরেও অদ্যাবধি হয় নাই। সামান্য ও নগণ্য কেরাণী-কুলে জন্মিয়াও আমাদের ঐ পাক্ষিক সাহিত্য পত্র কি জানি সৌভাগ্যের কি সিদ্ধিযোগে বা অনুকূল নক্ষত্রে, নেহাত কেরাণী-কলমের পরিচয়-দেয় নাই। উহা সুবিজ্ঞ সমীচীন লোকের শ্রদ্ধা ও সাহিত্যসিংহদিগের সম্যক্ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তখনকার সংবাদ-পত্র ও সাময়িকপত্র-নিচয়ে উহা উচ্চ শ্রেণীর সন্দর্ভ বলিয়া স্বীকৃত ও সমালোচিত হইয়াছিল।··আমাদের ঐ পাক্ষিক পত্র বেশ চলিয়াছিল; বহুকাল বেশ চলিতও বোধ হয়। কিন্তু, অনুষ্ঠাতৃদিগের মধ্যে বাঙ্গালীসুলভ একটি আত্মবিরোধ উপস্থিত হইয়া উহার ভাবী অস্তিত্বের উপর আঘাত করে। আট মাস কাল সতেজে ও সম্মানের সহিত চলিয়া, সাহিত্যের সু-আহার্য্য অভাবে উহা এক বৎসর পরে এ দেশীয় অনেকানেক পত্রিকারই মত পিতৃলোকে বিলীন হয়। পিতৃ-লোক-প্রস্থানের পথে উঠিবার পূর্ব্বেই আমি উহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলাম। অতিকষ্টেই সে কার্য্যটা করিতে হইয়াছিল। প্রথম আট মাসের অধিক কাল উহার সঙ্গে আমার লেখনীর ও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের সংস্রব ছিল না।

বঙ্গীয় ১২৯০ সালের ফাল্গুন মাসে ঐ পাক্ষিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। এবং প্রতি পক্ষে সুন্দর রঙ্গিন-মলাটযুক্ত সুবৃহৎ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে।··পাক্ষিক প্রকাশিত হইবার পরবর্তী শ্রাবণ মাসে 'নবজীবন' ও 'প্রচার' প্রকাশিত হয়।

৪ ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণে' মুদ্রিত ঠাকুরদাসের "স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধেও 'পাক্ষিক সমালোচকে'র একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

সাহিত্যে পরিচিত না হইয়াও সৌভাগ্যক্রমে আমরা তাহার সমালোচনার্থ কিয়ৎপরিমাণে প্রস্তুত ছিলাম। সমালোচনা করিয়াছিলাম প্রচুর; এবং সে সমালোচনা নেহাত ছেলে-খেলাও হয় নাই। আমাদের তখনকার সম্পাদকীয় ইচ্ছার মূলে একটি অপ্রকাশিত উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। সে উদ্দেশ্য বাঙ্গালা ভাষায় একটি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সমালোচন-সাহিত্যের সৃষ্টি করা। ইংরেজীতে যাহাকে Critical Literature বলে, তাহারই জন্য আমরা তখন মাতিয়া উঠিয়াছিলাম, এবং 'সমালোচকে'র অনুষ্ঠানে অন্যান্য বন্ধুদিগকে জুটাইয়া আমি তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম।· ·

পত্রের প্রত্যেক সংখ্যার উদ্বোধন হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত (প্রুফ দেখা ব্যতীত) প্রায়ই সবই আমায় করিতে হইত। পত্র-পরিচালনার পথ ক্ষোদিত করার ভার পাইয়াছিলাম; কার্য্যতঃ তাহার সম্পাদনও করিতাম। কিন্তু সম্পাদকীয় ভার শাফ্ ও সটান ভাবে আমার উপর অর্পিত হয় নাই। অবতরণিকায় লিখিত হইয়াছিল,—সহযোগিবৃন্দের সাধ মিটাইবার জন্য আমি নিজেই লিখিয়াছিলাম;—

'* * এই পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের হস্তে অর্পিত নহে। সম্পূর্ণ সাধারণ-তন্ত্র প্রণালীতে একটি সমিতি কর্ত্তৃক 'সমালোচক' সম্পাদিত হইবে।'

বলা বাহুল্য, সমিতি দ্বারা পত্র-সম্পাদন সম্ভবপর হয় নাই। তবে তাহার জন্য আমাকে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ কষ্টভোগ ও কর্ম্মভোগ করিতে হইয়াছিল।· ·

'পাক্ষিকে'ই বোধ হয়, আমার প্রবন্ধ লেখার প্রথম 'হাতে-খড়ি'। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও বড় কিছু লিখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে ইংরেজী কাগজে কিছু কিছু মক্স করিতাম বটে। বাঙ্গালা প্রবন্ধ উহার পূর্ব্বে আর কখনও লিখি নাই।· ·গদ্য লেখা সহজ ভাবিয়া বাল্যকাল হইতে বুড়া বয়স পর্য্যন্ত আমি তাহার গাত্র স্পর্শ করি নাই।· ·পূর্ব্বাবধি আমি পদ্য ঠাকুরাণীর কিঞ্চিৎ প্রণয়ে পড়িয়াছিলাম। কেরাণীগিরির কার্য্য হইতে কিছুমাত্র বিশ্রাম পাইলেই কাগজ পেন্সিলে কবিতা দেবীর মূর্ত্তি আঁকিতে বসিতাম।· ·

একটু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, 'পাক্ষিক'কে আমরা কি প্রকৃতির পত্র করিয়াছিলাম। সে এক পাঁচ মিশালি রকমের প্রকৃতি। প্রথমতঃ, প্রবন্ধ। সচরাচর সাময়িক পত্রে যে ছাঁচের প্রবন্ধ বাহির হইয়া থাকে, সেই রকমেরই। সকল বিষয়েরই সন্দর্ভ ও সমালোচনা। পরন্তু সংবাদপত্রের একটা অঙ্গ উহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। সেটা রাজনীতিক আলোচনা। মাসের প্রথম পক্ষে 'মাস-সমালোচনা' বলিয়া একটা লম্বা চওড়া প্রবন্ধ থাকিত। তাহাতে সাময়িক রাজনীতিক ব্যাপারের বিবিধ কথা থাকিত। পুনশ্চ, দ্বিতীয় পক্ষে 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' শিরস্ক কতকগুলি 'প্যারা'য় রাজনীতির কথা লিখিত হইত। ইংরেজী পত্রের অনুকরণে (প্রধানতঃ তাৎকালিক 'ম্যাকমিলান্‌স্ ম্যাগাজিন ও ইণ্ডিয়ান রিবিউ') আমরা 'মাস-সমালোচনা' প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। তবে তাহাতে একটু অভিনবত্ব বা আনাড়িত্ব ছিল এই যে, 'মাস-সমালোচনা'র প্রত্যেক প্রবন্ধের মাথায় নিম্নলিখিত একটা করিয়া নোট থাকিত;—

'মাস-সমালোচকে'র মতামতের জন্য এই পত্রের সম্পাদক-সমিতি দায়ী নহেন। 'মাস-সমালোচনা' ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হইবে; অতএব একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

'পাক্ষিক সমালোচকে'র স্বত্বাধিকারীদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান ছিলেন, রাজনীতিক বিষয়ে তখন তাঁহার সবিশেষ ঝোঁক ছিল, এবং তিনি নিজে ঐ সকল কথাই লিখিতে অভিলাষী হইলেন। এই কারণেই ঐ পত্রে রাজনীতির অতটা লম্বা স্থান মিলিয়াছিল। নইলে আমার তখন ততটা রাজনীতিক মেজাজ হয় নাই; সেটা বরং এই বৃদ্ধ বয়সে কিছু কিছু হইয়াছে।"

'পাক্ষিক সমালোচক' দ্বিতীয় বর্ষে বিলুপ্ত হয়। প্রথম বর্ষে ঠাকুরদাস "ষড়ানন্দ"—এই ছদ্ম নামে "ষড়ানন্দের রোজনামচা," "ঠঃ" স্বাক্ষরে "সমালোচনা ও সমালোচক" এবং "ঠঃ দঃ" স্বাক্ষরে "দেবী চৌধুরাণী (সমালোচন)" লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রামদাস সেনের গবেষণামূলক প্রবন্ধ "ব্যূহ," নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের কবিতা; কালীবর বেদান্তবাগীশ, চন্দ্রশেখর বসু ও বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রভৃতির সন্দর্ভও 'পাক্ষিক সমালোচকে'র পৃষ্ঠা অলংকৃত করিয়াছিল।

'মালঞ্চ': 'পাক্ষিক সমালোচকে'র প্রকাশ রহিত হইবার তিন বৎসর পরে ঠাকুরদাস ঝনজারপুরে (ত্রিহুত স্টেট রেলওয়ে) অবস্থানকালে 'মালঞ্চ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন; উহা কলিকাতার নবজীবন যন্ত্র হইতে অঘোরনাথ কুমার কর্তৃক প্রকাশিত হইত; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল দুই টাকা।

'মালঞ্চে'র ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—পৌষ ১২৯৫; এই সংখ্যায় "অঙ্কুর" শিরোনামে পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক যাহা লেখেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"বঙ্গ-সাহিত্যে শস্যক্ষেত্র বিস্তর আছে। সেগুলি সারবান্ শস্যেরই ক্ষেত্র;—সুকুমার শস্যেরও ক্ষেত্র। বিবিধ শস্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই। তবে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে, আমাদের অদৃষ্ট-বশে বা মাটির দোষে,—যে কারণেই হউক,—কোন্ কারণে ঠিক জানি না,—কতক দিন হইতে সাহিত্যের সুন্দর ক্ষেত্রে শস্যের শ্যামল শোভা আর তেমন দেখিতেছি না; কিন্তু অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি চিরস্থায়ী নয়। স্বভাবের নিয়মে শুষ্কতার পর সুবৃষ্টি হয়। সেই নিয়মে অদৃষ্টও ফিরে। সাময়িক অবসাদে অধিক উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। আশা অবশ্যই আছে।

সারবান্ শস্যে সৃষ্টি রক্ষা করে; সুকুমার শস্যও সংসারে প্রয়োজনীয়। কাযেই শস্য-ক্ষেত্রে পৃথিবীর আধখানারও অধিক জোড়া; কিন্তু শস্যের ন্যায়, শাকটি-সব্‌জিটি-ফুলটি-পাতাটিও জীবন ধারণে প্রয়োজন। তা সংসারেই বলুন, আর সাহিত্যেই বলুন। শুভ-যোগে "শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা" হইলেও শাক্-সব্‌জি নহিলে অন্ন উঠে না; ফুল-মুকুল-লতা-পাতা নহিলে পূজা ও প্রেম দুয়ের কিছুই হয় না। শস্যের সঙ্গে সঙ্গে শাক্-সব্‌জি চাই, ফুলটি মুকুলটি লতাটি পাতাটিও চাই। সৃষ্টিরক্ষায় শস্য যদি হন রাজা, শাক্-সব্‌জি প্রভৃতি তাঁর প্রিয় ও প্রভুবৎসল প্রজা। প্রজা নহিলে রাজার রাজত্ব সম্ভবে না। এ বিষয়ে আর অধিক ইঙ্গিত অনাবশ্যক।

আমাদের সাহিত্যে ফলের ক্ষেত ত আছেই। ফলের ক্ষেতের 'আশে-পাশে' এক আধটা ফুলের গাছও আছে, তাহা দেখিতেছি; কিন্তু ফুলের জন্য একটা স্বতন্ত্র উদ্যান আমরা আজিও স্থাপন করি নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে শস্যের চাষই এত দিন চলিয়াছে, শাক্-সবজির উপর আমরা বড় একটা দৃষ্টি করি নাই। ফলের গাছে 'সার' দিতে আমরা যত চেষ্টা এত দিন করিয়াছি, ফুলের চারায় তত জল দিই নাই। আমাদের ফলের গাছ ফলবান্ হউক, শস্যক্ষেত্র সুবিস্তৃত ও সুকর্ষিত হউক; কিন্তু তাহার সঙ্গে ইহাও চাই,—জানিয়াছি অনেকেই চাহেন যে,—শাক-সবজির 'সুপাট' হয়, ফুলটি পাতাটি যত্ন পাইয়া যথাকালে ফুটে। আমরা তাই আজ বড় আদরে, যত্নে ও সন্তর্পণে—কিন্তু বিলক্ষণ ভয়ে ভয়ে,—বঙ্গসাহিত্যের পৈতৃক স্বোপার্জ্জিত ভদ্রাসন হইতে অর্দ্ধ কাঠা মাত্র 'পড়তা' ভূমি চিহ্নিত করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র ফুল-বাড়ী—মহাশয়দিগেরই এই 'মালঞ্চ'—প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।

অধিক নয়, আধ কাঠা মাত্র আমরা আবাদ করিব। তারি মধ্যে যথাসম্ভব, যেখানে যেটি সাজে—ফুলের চারা বসাইব, লতার গাছ পুতিব, শাক-সব্‌জি ছড়াইব। ফুল মুকুল, পাতা লতা, শাক্-সব্‌জি,—সকল রকমের সকল রঙেরই দুই চারিটা করিয়া চারা রোপিব। তবে কোন্ ফুলটি ফুটিবে—কোন্‌টি ফুটিবে না, কোন্ গাছটি গজাইবে, কোন্ বীজটি অঙ্কুরিবে, কোন্ চারাটি বাঁচিবে—কোন্‌টি বাঁচিবে না, সেটি আমরা কেমনে এখন বলিতে পারি? ক্ষেতের বীজ, বৃক্ষের কলম,—না জন্মিলে বিশ্বাস কি? তবে বীজ যাতে 'উঠে,' ফুল যাতে ফুটে—তার 'পা'ট' আমরা প্রাণ দিয়াও করিব, এখন কেবল এই বলিতে পারি। ইহার অপেক্ষা আর অধিক (সত্য বলিলে) কেই বা বলিতে পারেন!· ·

একটা কথা অগ্রেই বলিয়াছি, এখনও আবার বলিতেছি,—শস্য ও ফলের কারবার আমাদের নয়। উক্ত দ্রব্যের জন্য বড় ও বনিয়াদি মহাজনদের মাল-গুদামে মহাশয়কে যাইতে হইবে। 'মালঞ্চ' হইতে কেবল ফুলটি পাতাটি আমরা যোগাইব। 'ফলের প্রত্যাশী' মহাশয়েরা যদি একান্তই হন,—আমরা ক্ষুদ্র ব্যাপারী, অধিক আর কিছু দিতে পারিব না,—সময়ে অসময়ে এক আধ ছড়া রাজনৈতিক রম্ভা দিব। উক্ত অনুপম ফলের বৃক্ষ বাছিয়া বাছিয়া একটি ঝাড় মালঞ্চের এক কোণে আমরা রোপিয়াছি।

তবে বুঝা গেল—'মালঞ্চে'র উদ্দেশ্য কি কি। বঙ্গবাসীর দেবমন্দিরে ও বিশ্রামকক্ষে পুষ্পসম্ভার প্রেরণ করা—মালঞ্চের এক উদ্দেশ্য; আর এক উদ্দেশ্য,—সাহিত্যক্ষেত্রের সামান্য; কিন্তু অত্যাবশ্যক উদ্ভিদ নিয়মিত যোগাইয়া, তাঁহাদের ভোজনগৃহ ও

'ডিনার টেব্‌ল্' প্রফুল্ল করা। যে দিন জানিব, 'মালঞ্চে'র দ্রব্যজাত হিন্দু-গৃহের 'রান্নাঘরে' আদর পাইয়াছে, সেই দিন বুঝিব— 'মালঞ্চ' টি'কিল। তখন আর 'মালঞ্চ' বাজে লোকের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইবে না।

এ 'মালঞ্চে'র মালী যাঁরা সখ করিয়া—আদর ও অনুগ্রহ করিয়া হইয়াছেন এবং হইবেন আশা দিয়াছেন, তাঁরা সকলেই সাহিত্যে স্ব স্ব ক্ষেত্রের সু-কৃষক, তাঁদের হাতে তাঁদের কারকিতে 'মালঞ্চ' মুকুলিত—পুষ্পিত—হইবার ত কথা। তবুও যদি না হয়, সে দোষ মালঞ্চেরও নয়, মালীরও নয়; সে দোষ—মহাশয়দের মাটির।"

'মালঞ্চ' সাহিত্য-পত্র হইলেও ইহাতে রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত; প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন: "রাজনীতির আলোচনা যদিও আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য নহে, তথাচ রাজনীতির সহিত আমাদিগের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। কারণ, সন্নীতিতে শাস্তি ও স্বচ্ছলতা। স্বচ্ছলতা ও শাস্তিতেই সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি।

প্রথম বর্ষের পত্রিকায় ঠাকুরদাসের অনেকগুলি গদ্য-পদ্য রচনা—"কংগ্রেস," "প্রয়াগ—চস্‌মাহীন চক্ষে," "বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গসমাজ," "ফুল্লরা," "প্রবাসীর পূর্ব্বস্মৃতি" (কবিতা), "কার্ত্তিকে কুমারীব্রত" প্রভৃতি স্থান পাইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের "বিবাহ-রহস্য," 'স্বর্ণলতা'-রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "অদৃষ্ট" উপন্যাস ২১ অধ্যায় পর্যন্ত,[৫] বিহারিলাল চক্রবর্তীর খণ্ড-কাব্য "সাধের আসন"; নবীনচন্দ্র সেন, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায় ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কবিতা প্রভৃতিও 'মালঞ্চে'র শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা পত্রিকায় নবীনচন্দ্রের "নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন" নাটকের কিয়দংশ ও বিহারিলালের "সাধের আসনে"র ৪র্থ সর্গ প্রকাশিত হয়।

'মালঞ্চ' প্রায় দুই বৎসর চলিয়া বিলুপ্ত হয়। ইহাকে অনায়াসেই একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক-পত্রিকার সম্মান দেওয়া যাইতে পারে।

'বঙ্গবাসী': দ্বারভাঙ্গার চাকরি হইতে বিদায় লইয়া ঠাকুরদাস ১২৯৯ সালে 'বঙ্গবাসী'র অন্যতম সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব হইতেই 'বঙ্গবাসী'তে ও তথা হইতে প্রচারিত 'জন্মভূমি' মাসিকপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 'বঙ্গবাসী'র সহিত তিনি আড়াই বৎসর কাল যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার লিখিত বহুবিধ প্রবন্ধ 'বঙ্গবাসী' ও 'জন্মভূমি'র পৃষ্ঠা অলংকৃত করিয়াছিল।

'বঙ্গনিবাসী': ১২৯৭ সালে 'বঙ্গনিবাসী' নামে সাপ্তাহিক পত্র বামদেব দত্তের পরিচালনায় প্রকাশিত হয়। ঠাকুরদাস কিছু দিন ইহা সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় (দ্র° 'বঙ্গ-ভাষার লেখক,' পৃ. ৬৭৮)।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা: ঠাকুরদাসের বহু সুলিখিত রচনা পুরাতন সাময়িকপত্রের— 'প্রচার,' 'নবজীবন,' 'প্রবাহ,' 'পাক্ষিক সমালোচক,' 'মালঞ্চ,' 'নব্যভারত,' 'সাহিত্য,' 'জন্মভূমি,' 'অনুসন্ধান,' 'ভারতী,' 'প্রদীপ' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় সাদরে স্থান লাভ করিয়াছিল। ইহার অধিকাংশই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই; আমরা এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার একটি তালিকা দিতেছি:

'নব্যভারত': ১২৯৪, বৈশাখ ·· স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরী
১২৯৭, পৌষ ·· মন্ত্রি-অভিষেক (আলোচনা)
১৩০১, জ্যৈষ্ঠ ·· নিমাই চরিত (সমালোচনা)
শ্রাবণ ·· এক অপরিজ্ঞাত কবি [বিহারিলাল চক্রবর্তী]

---

৫ এই প্রসঙ্গে ঠাকুরদাসকে লিখিত তারকনাথের একখানি ইংরেজী পত্র ১৩২৪ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে।

	ভাদ্র, কার্ত্তিক-পৌষ	..	বেঙ্গল স্যানিটারী ড্রেণেজ বিল
	১৩০৩, ভাদ্র, কার্ত্তিক	..	সাহিত্য ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সমালোচনা)
	অগ্র., পৌষ	..	শিশির বাবুর গীতি-গ্রন্থ
	১৩০৪, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ	..	শেলি
	১৩০৫, জ্যৈষ্ঠ	..	রাজধানী
	পৌষ	..	রাজনীতি ও স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র
	১৩০৭, অগ্র., পৌষ	..	সাহিত্যের সাধারণ তন্ত্র
	১৩০৮, আষাঢ়	..	ভারতেশ্বরীর স্মারক (লর্ড কর্জ্জন ও তদীয় ব্যক্তিত্ব)
	ভাদ্র	..	ভিক্টোরিয়ণ হল
	আশ্বিন	..	(১) মহাত্মা মিষ্টার কটন, (২) প্রেম ও পেট্রিয়টিজম্
'নবজীবন' :	১২৯৫, পৌষ	..	সমালোচনী পত্রিকা
'জন্মভূমি' :	১২৯৭, মাঘ	..	বিলাতে নারী-সভা
	১২৯৮, বৈশাখ	..	অমূল্য-নিধি
	মাঘ	..	পণ্ডিত অযোধ্যানাথ
	১২৯৯, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	..	লর্ড মেয়ো
	ভাদ্র	..	ভাষা-রহস্য
	অগ্রহায়ণ	..	(১) রমণী রেজিমেণ্ট, (২) সমালোচনা (পুরাতন ও নূতন প্রণালী)
	পৌষ, মাঘ	..	সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব
	চৈত্র	..	বন্দর-বংশ (সচিত্র)
	১৩০০, বৈশাখ	..	বিবিধ বানর (সচিত্র)
	জ্যৈষ্ঠ	..	ব্যাঘ্র (সচিত্র)
	আষাঢ়	..	হরিণ (সচিত্র)
	শ্রাবণ	..	লেডীর লড়াই
	ভাদ্র	..	জ্ঞানের প্রমাণ
	আশ্বিন, কার্ত্তিক	..	'কুরুক্ষেত্র কাব্য' (সমালোচনা)
	পৌষ	..	ম্যালেরিয়া-মঠ
	ফাল্গুন	..	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
	চৈত্র	..	স্বপ্ন-কন্যা
'সাহিত্য' :	১২৯৮, শ্রাবণ	..	কবিবর রবার্ট ব্রাউনিঙ্
	১৩০১, ভাদ্র	..	রাজা দিগম্বর মিত্র, সি. এস্. আই
	১৩০৫, জ্যৈষ্ঠ	..	'নয়শো রূপেয়া' (স্মৃতি ও সমালোচনা)
	শ্রাবণ, কার্ত্তিক	..	সাহিত্য-পঞ্জী
	১৩০৬, ফাল্গুন	..	প্রেমবিলাস গ্রন্থ

	১৩১৮, ভাদ্র	..	কুৎসা-কুমারী
	১৩১৯, পৌষ	..	বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধীয় স্মৃতি
	১৩২১, আষাঢ়	..	রচনা-রীতি
	শ্রাবণ	..	গীতি-কবিতা
	অগ্রহায়ণ	..	কুসুম ও কবিতা
	ফাল্গুন	..	নাটক
	১৩২৩, আষাঢ়	..	কঠোর কাব্য
	শ্রাবণ	..	'পাক্ষিক সমালোচক'
	আশ্বিন	..	'পঞ্চ'
	অগ্রহায়ণ	..	সমালোচনা-সোপান (ক্রমশঃ)
	১৩২৪, কার্ত্তিক	..	আমার দুই দুগ্ধবতী গাভী
	অগ্রহায়ণ	..	নিধুবাবু
	১৩২৫, আষাঢ়	..	ন্যাসপাতি ও নবন্যাস
'ভারতী' :	১৩০২, মাঘ	..	প্রজাসূয়া সভা
	ফাল্গুন	..	সমাজ-সংস্কার
প্রদীপ' :	১৩০৭, পৌষ	..	শব্দ
	১৩০৮, পৌষ	..	কংগ্রেস*
	মাঘ-ফাল্গুন, চৈত্র	..	হাস্য রসের রচনা
	১৩০৯, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ		ঐ
নারায়ণ' :	১৩২২, বৈশাখ	..	স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র
'ভারতবর্ষ' :	১৩২৪, অগ্রহায়ণ	..	গ্রন্থ-সমালোচনা
'সারথি' :	১৩২৭, শ্রাবণ, ভাদ্র	..	বঙ্গভাষা
	অগ্রহায়ণ	..	সাহিত্য সমালোচনা
	চৈত্র	..	সমালোচনা প্রসঙ্গ
'সচিত্র শিশির' :	১৩৩১, ২১ চৈত্র	..	সমালোচনা-সোপান
	১৩৩২, ১২ অগ্র.	..	কথা কাণে হাঁটে
	১৩৩৩, ১৮ অগ্র.	..	সাহিত্য-সমালোচনার বৈজ্ঞানিক ভূমি
	১৭, ২৪ পৌষ	..	ব্যাকরণ
	১, ৮, ১৫, ২২ মাঘ	..	অলঙ্কার
	১৫ মাঘ	..	সাহিত্য-চিন্তা
	২৮ ফাল্গুন	..	নবেল

* এই প্রবন্ধে এবং ১৩১৮ সালের পৌষ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' লেখকের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইয়াছে।

শিল্পের স্বরূপ

শ্রীকানাই সামন্ত

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

একই বৃক্ষে দুই সুপর্ণসখা। একটি পাখি মধুর বা তিক্ত ফল ভোগ করে, অন্যটি চেয়ে দেখে।

সুখকর আর দুঃখকরের উপলব্ধি ঘটে তারই যে ফলভুক্। অতএব সেই বোঝে কী যে ভালো আর কী যে মন্দ, কোন্‌টি তার লোভের সামগ্রী আর কোন্‌টি তার ত্যাগ করাই ভালো। অথচ যেমন ভাবেই চেষ্টা করা যাক, ভালো আর মন্দ, হর্ষ আর বিষাদ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, আলো অন্ধকার — অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা। অবিমিশ্রভাবে একটিকেই বেছে নেবার কোনো উপায় নেই।

এ দিকে যে শুধু দ্রষ্টা সেই মুক্ত ও শান্ত, শাশ্বতকাল সেই তো সুখী, আনন্দময়। ফল সে ভোগ করে না, ভোগ করে ফলভোক্তাকে। কাজেই বিভিন্ন ফল, বিভিন্ন স্বাদ, বিভিন্ন ক্ষণের বিচিত্র উপচয় আর ক্ষয়, কিছুতে নেই তার কোনো আসক্তি। শুভে অশুভে, সুখে দুঃখে, লাভে ক্ষতিতে, জয়ে পরাজয়ে যে একান্ত ভেদ জীবের অমূলক কল্পনামাত্র সেই ভেদকে সত্য বলে সে তো গণনা করে না; সেই ভেদের ভূমিতে উর্ধ্বাসীন তার স্থিতি, পদ্মপত্রে জ্যোতির্বিচ্ছুরিত শিশিরবিন্দুরই মতো। অভেদের সম্বন্ধে আর অখণ্ড সমগ্রের উপলব্ধিতে দেখা যায়, নিখিলের সর্ব সত্তাই অনির্বচনীয় আনন্দের স্ফুরণ; অবিকৃত আনন্দই অখণ্ড একের স্বভাব।

উপনিষদের পরবর্তী শ্লোক-দুটিতে বলা হয়েছে, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের টানা-পোড়েনে বোনা জটিলঘন জালে বিজড়িত এই পাখি সহসা উর্ধ্বে চেয়ে আবিষ্কার করে আপন মহিমায়, আপন আলোকে প্রচ্ছন্ন, আনন্দিত, অবিচলিত, শান্ত ওই বিহঙ্গকে যে তার আপনারই স্বরূপ; চেয়ে চেয়ে সত্তা থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে তার ক্ষণিক যত উল্লাস আর অলীক যত যাতনা, ক্লেশ— পার্থিব সুখ সেও তো নিশ্চিত দুঃখেরই সম্ভাবনা— চেয়ে দেখতে দেখতে আপন ঋত ও মহিমময় স্বরূপেই হয় এ আবৃত, পায় চিরন্তন আবাস ও নিঃশেষ আত্মপরিচয়।

মুণ্ডক উপনিষদের আশ্চর্য এই রূপাখ্যান, মন্ত্রময়ী এই বাক্‌পরম্পরা, ঋজুগতি নিশিত শরের মতো বিদ্ধ হয়েছে দেখি নিখিল জীবন-রহস্যের অন্তরতম অন্তরে।

ফলভুক্ বিহঙ্গ তো অন্য কেউ নয়, মন প্রাণ দেহের আবরণ-স্তরে আবৃত এই মানবাত্মা। উর্ধ্বে শান্তিতে আসীন বিহঙ্গম আত্মারই আত্মা বা পরমাত্মা। যে পর্যন্ত আছে মানুষ হর্ষ শোক, পুণ্য পাপ, আলো অন্ধকার, জাগৃতি ও মোহ, থাকা আর না-থাকার খণ্ড ক্ষুদ্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জীবনে ক্ষণনির্ভর হয়ে— প্রত্যেকটি অস্থির ক্ষণ এই আছে এই নেই, আছে কি নেই জানবার সময় ও সুযোগ নেই কোনো— যে পর্যন্ত এই মায়িক জগতে মায়ার অধীন হয়ে আছে, সে পর্যন্তই তার পরিচয় সাধু বা অসাধু, প্রাজ্ঞ বা অজ্ঞ, ধনী বা দরিদ্র, সুস্থবুদ্ধি বা বাতুল, মানুষের তথা মনুষ্যসমাজের নৈতিক ও মানসিক বিচার-বিবেচনায় নির্ধারিত এমন অসংখ্য অভিধানে।

এই মানুষ শিল্পী নয়, কবি নয়, স্বরূপদ্রষ্টা ঋষি নয়। শিল্পী কবি বা ঋষির পদবীতে কখন হয় সে উত্তীর্ণ? যখন আপন মুক্ত শান্ত নিরাবৃত স্বরূপ থাকে তার দৃষ্টি বা চেতনার গোচরে। যতক্ষণ সেই স্বরূপের ধর্মেই থাকে সে বিধৃত, যে ধর্মের স্বল্পও মহাভয় থেকে, অজ্ঞান ও মোহ থেকে ত্রাণ করে। যে পর্যন্ত আপনাকে সে জানে আপন স্বরূপেরই জ্যোতি ও চেতনার, শান্তি ও সমতার, স্বভাবগত ও সর্বগত আনন্দের নিষ্ক্রিয় আধার বা প্রণালী -রূপে— উন্মুক্ত দ্বার বা বাতায়ন -রূপে। যে ভাবে বা যে উপলক্ষেই হোক, অন্তরতম আত্মার সঙ্গে এই একাত্মতা যে ভাগ্যবান্ যে পরিমাণে অর্জন করে সেই পরিমাণেই সত্য ও সার্থক হয়ে ওঠে তার শিল্পস্রষ্টৃত্ব কবিত্ব বা ঋষিত্ব।

তখন তুচ্ছ মৃৎপাত্র আর শিলামূর্তিই অমৃতে বা রসে উপচে ওঠে। মানুষের মুখের ভাষাই ছন্দের বেগে ও সুরের পাখায় চিন্তার অতীত ঊর্ধ্বে আর কল্পনার অমেয় গভীরে নিয়ে যায় এই মানুষী চেতনাকে। তখন মৃত্যুতেও অমরতার উপলব্ধি ঘটে, বন্ধনেও মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়, অস্থির বাসনা-বেদনার অন্তরে স্থির শান্তি ও গভীর সুখের স্মিতহাস্য দেখা যায়— এক কথায়, সত্যের মুখ থেকে মায়া-গুণ্ঠনের অপসৃতিতে মানুষ 'নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব'।

সত্য কী বস্তু? আমরা যা হয়ে উঠছি সেই সত্য। তর্ক দিয়ে যা নির্ণয় করতে চাই, ইন্দ্রিয় দিয়ে যা দেখি শুনি, সত্য তা নয়।

তর্কসহচারী ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে যা জানি তা জানি বাইরে থেকে আর অনিশ্চিত ভাবে। অনুভবে, অর্থাৎ যা ভব, যা হয়েছে, তারই অনুসরণে, আমরা অন্তরের নিধিকেই অন্তরে পাই। আর, নিষ্কল চৈতন্যের অবর্ণ ভাস্বরতায় স্বভাবতঃই দীপ্ত হয়ে ওঠে যে প্রেম তাতে ঘুচে যায়— আমি আর তুমির ভেদ, এই ক্ষণ আর পরক্ষণের মায়া, সত্যের সম্পর্কে সকল তর্ক আর সকল সংশয়।

এ প্রশ্ন তবে নিরর্থক, শিল্পী, কবি, ঋষি, কে কতখানি বাঁধা নীতির বাঁধনে। শিল্পী কবি বা ঋষির আসন ও অস্তিত্ব সুনীতি দুর্নীতির ঊর্ধ্বে। সুখ-দুঃখ শুভ-অশুভের উৎপত্তি তথা সুনীতি-দুর্নীতির বিচার, বিভেদের বোধ থেকেই এসেছে— মুহূর্ত থেকে মুহূর্তের ভেদ, অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতার ভিন্নতা, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির দেহমনবিচ্ছিন্ন অলীক ও অসংখ্য সীমা। সর্বব্যাপী একের জ্যোতির্বিভাসিত সাক্ষাৎকারে বা তার আভাসমাত্রেও এই ভেদ ও অনৈক্যের ঐকান্তিক সীমা যায় লুপ্ত হয়ে। এরূপ প্রত্যক্ষে বা উপলব্ধিতেই যেমন ঋষির সত্য-আবিষ্কার তেমনি শিল্পী বা কবিরও রসরূপের সৃষ্টি। এই দৃষ্টি আর এই উপলব্ধি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে লোকাচার শাস্ত্রাচার সমাজবিধি প্রভৃতি সাংসারিক সকল নীতির ঊর্ধ্বে; তার নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব নেই, যে পরিচয়ে তাকে অন্য ব্যাপারে বা অন্য সময়ে চিনি আর জানি সে তো তার স্বরূপ নয়।

আরণ্য মৃগ বা ব্যাঘ্র নীতিবিহীন; যেখানে মন নেই, আত্মসমীক্ষা নেই, সেখানে আদৌ উদ্ভব হয় নি নীতির। মানুষের আছে মন, মানুষের আছে সমাজবদ্ধ জীবনযাত্রা, কাজেই মানুষেরই আছে সামাজিক সুনীতি বা দুর্নীতি। কিন্তু, শিল্পী বা কবি বা ঋষি মনুষ্যদেহধারী মাত্র; তাদের অন্তর্নিহিত শিল্পীসত্তা বা ঋষিসত্তা বিশুদ্ধ চেতনামাত্র। অর্থাৎ, সে শুধু জ্যোতি, সর্বত্র প্রসারিত হয়ে সব-কিছুকে প্রকাশ করে; সে শুধু বায়ু, সর্বত্র প্রবাহিত হয়ে নিশ্বাসে নিশ্বাসে সব-কিছুকে জীবন দেয় ও নিখিল জীবনকে আহরণ করে। আকাশের আলো, বায়ু— তার কি আছে কোনো নীতির বালাই?

প্রশ্নের জড় মরে না তবু— শিল্পী কবি ঋষি এদের কায়িক বাচিক মানসিক কোনো প্রকারের কোনো চেষ্টা থেকেই কোনো অকল্যাণ বা পাপের সূচনা হয় না তবে কি ? না, তা হতে পারে না, যতক্ষণ এবং যে ব্যাপারে সে যথার্থই শিল্পী, কবি, ঋষি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, বেতালে তার পা পড়ে না নৃত্যে যে সিদ্ধ; বহির্ভূত নীতিতে নয়, কিন্তু আন্তর্ভৌম ছন্দে ছন্দোময় তার সত্তা— আত্মার এই ছন্দ বাইরের দিক থেকে সংযম বলে প্রতীয়মান হলেও ভিতরের দিকে মুক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

গায়কের মুক্তি গানে, সুর ও তালের চিরবিচিত্র ও চিরচঞ্চল সমন্বয়ে; সুর বা তালের অবহেলায় বা তা থেকে স্খলনে নয়। কবির মুক্তি ছন্দোবেগতরঙ্গিত বাক্যে ও বাঙ্‌নিবদ্ধ প্রতিমা-পরম্পরায়; ছন্দোবিচ্যুত কোলাহলে বা মৌনে নয়। শিল্পীর মুক্তি রূপের পূর্ণতায় ও সৌন্দর্যে; অসুন্দর আকার-হীনতায় নয়— অমৃতের আধার তো হতে পারে না মৃত্তিকার তাল বা ভগ্ন ভাণ্ড। প্রেমিকের মুক্তি সেবায় ও আত্মোৎসৃজনে; অহমিকাবদ্ধ বিরাগে বা ঔদাসীন্যে নয়। সত্যদ্রষ্টা ঋষির মুক্তি বিশ্বতোমুখ চৈতন্যের প্রবাহে ও প্রসারে; যা কিছু ম্লান ও নিষ্প্রভ করে সেই আনন্দকে, সেই আলোককে, সেই শুধু দুর্নীতি— লোকাচার ও দেশাচার -লঙ্ঘনে কী যায় আসে যদি যথার্থ জীবন্মুক্তি থাকে অক্ষুণ্ণ।[১]

সামাজিক নীতি নিয়তপরিবর্তনশীল, দেশ কাল জাতি ও পরিবেশের নিত্য পরিবর্তনে। নিত্যমুক্ত ও স্বভাবে অধিষ্ঠিত যারা তাদের যে নীতি সে তো বাইরের কোনো বিধিনিষেধ নয়, আপন অন্তরাত্মারই বিধান, অন্তরাত্মারই ইচ্ছার লীলা ও শক্তির প্রয়োগ।

মানব-সাধারণের চিত্তে ও জীবনে শিল্পের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তবে কি কেবলই কল্যাণকর ? পূর্ববর্তী আলোচনা থেকেই যদিও এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হওয়া উচিত তবু সুনির্দিষ্ট ভাবেই বললে দোষ নেই—

সত্য ও সার্থক শিল্প— মন্দির, মূর্তি, চিত্র, কবিতা, গান— নীতিবিচারের বহির্ভূত বা উর্ধ্বস্থিত। এবম্বিধ রসরূপের স্রষ্টা বিশ্বস্রষ্টার মতোই উপস্থিত বিষয়ের সমুদয় মানসিক ও নৈতিক মূল্য বা মান সম্পর্কে বিবিক্ত; সে-সবই রসসৃষ্টির উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নয়। আদিকবির মতোই এই রসরূপের কবিও বহুধাবিচিত্র জীবনের বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে আপন চেতনা দিয়ে, আস্বাদন করে অনাসক্ত অনুরাগে বা আনন্দে, এবং সেই স্বরূপের উদ্ভাস ও আনন্দের দিব্যভোগকেই সৃষ্টি করে, শরীরী করে ও রসিকমাত্রেরই দৃষ্টি শ্রুতি চিত্ত ও চেতনার গ্রাহ্য করে নানা ছলে— ধ্যানী বুদ্ধ; রাত্রিচর তস্কর; রভসবদ্ধ তরুণতরুণী[২];

---

১ সাধু, ঋষি, পরমহংস এঁরা যে লৌকিক আচারও প্রায়শঃই রক্ষা করেন সে কেবল অজ্ঞ ও অবিপশ্চিত জনসাধারণের প্রতি করুণারই বশে।

২ আত্মার দ্বারাই বিশ্বজীবনের সব-কিছু জানা যায়, চেনা যায়। সে পরিচয়ে আসক্তি নেই বলেই মলিনতা নেই। উপনিষদেই আছে—

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তান্ত্রিক মতে সাধনার সিদ্ধিপর্বের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। গাঢ়বদ্ধ যুবক-যুবতীকে দেখামাত্র নিবিড় ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধিতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

অর্বাচীন রুচিবিচারে নিন্দিত ও লজ্জিত পুরী ও কোণার্ক -মন্দিরের আদিরসাত্মক বহু মূর্তিকেই আচার্য নন্দলাল মনে করেন ভারতীয় 'শিল্পসৃষ্টির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন'।

দৃপ্ত শার্দূল, অরণ্যমেঘে প্রচ্ছন্ন-অনল বজ্রের মতো যে।

রূপকে উদ্ভাসিত করে আলোক। সূর্যের আলোক। কোথায় সে পড়ে না? কোথায় সে হেসে ওঠে না, হাসিয়ে তোলে না, এমনকি, তথাকথিত কদর্যকে, মলিনকে? স্বরূপকে উদ্ভাসিত করে আনন্দের চেতনা বা চেতনারই আনন্দ; সেও কিছুই পরিহার করে না; সু কু, পুণ্য পাপ, হর্ষ বিষাদ, এ-সব কোনো দ্বন্দ্বের অপেক্ষা রাখে না। এই চেতনায় বা আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই মানুষ শিল্পী বা কবি; আসক্তি বা বিরাগ তার পরধর্ম, সব-কিছুকে প্রকাশ করাই তার কাজ। সেই প্রকাশ সুনীতি বা দুর্নীতির কোনো খবর রাখে না। স্রষ্টারূপে বা দ্রষ্টারূপে যে জানে, যে দেখে সেই প্রকাশকে, সেই হয় মুক্ত; অন্তত যতক্ষণ দেখে, যতক্ষণ চেনে, ততক্ষণ থাকে সে মুক্ত— আর, পরেও স্মৃতি থেকে যায়। এই মুক্তিতে যে অপরিসীম কল্যাণ নিখিল নীতিশাস্ত্র ও সমাজব্যবস্থার তা স্বপ্নেরও অগোচর।

শিল্প প্রকাশস্বরূপ, স্বরূপেরই প্রকাশ। প্রত্যেক রূপের অন্তরে তার স্বরূপ। আপন আপন স্বরূপেই বিধৃত আছে প্রতিটি রূপ। বদ্ধ ও মুগ্ধ মানবাত্মাকে সৌন্দর্যে আনন্দে চেতনায় মুক্তি দেওয়াই সকল শিল্পের সব-কিছু রূপায়নের অর্থ ও পরিণাম।

বৈদিক ঋষি-পরিদৃষ্ট মন্ত্রের বিদ্যুচ্চকিত উদ্ভাসে সংশয়মোহগহন মানস অন্ধকারে সহসা সত্যের দিশা দেখা গেছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে প্রণাম। সত্যপ্রকাশক মন্ত্রকেও প্রণাম। মুখের কথা আর এই মন্ত্র সমধর্ম নয়। সাধারণ কবিকল্পনা আর এই মান্ত্রিক ইমেজ বা প্রতিমা সেও বিভিন্ন ভূমিতে।

সমুদয় শিল্প সম্পর্কে যে সত্যের ইঙ্গিত আছে এই দৈববাণীতে, আজ পর্যন্ত মানুষ স্রষ্টার সম্পূর্ণ অধিগত যদি নাও হয়ে থাকে তা, আদর্শরূপে, লক্ষ্যরূপে, ধ্রুবতারা-রূপে নিত্যই রয়েছে সম্মুখে। আদর্শ সাকার হবে তখনই, শিল্পী ও সমাজ উত্তীর্ণ হবে লক্ষ্যে, শিল্প যখন আর অবসর-বিনোদনের বা বিলাসের বা খাম-খেয়ালের বা কোনো সাংসারিক প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় ও উপকরণ বলে গণ্য হবে না। শিল্পের জন্যই শিল্প, এ কথার কোনো অর্থ নেই ঠিকই। শিল্প জীবনকে প্রকাশ করবে, আর জীবন সীমাবিহীন আনন্দ চৈতন্য ও সত্তাকে প্রকাশ করবে— বিন্দুতে বিন্দুতেই সিন্ধু।

আজ পর্যন্ত মানুষের জীবনও সম্পূর্ণতা পায় নি, শিল্পও পায় নি; কিন্তু যাত্রাপথ সম্মুখে পড়ে রয়েছে ঐ। পড়ে রয়েছে? সে কি টেনেও নিয়ে যাচ্ছে না? আপাততঃ কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এ কথা বলতেও দোষ নেই: পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রচিত্রকলা। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত। সরস্বতী লাইব্রেরি। মূল্য ছয় টাকা।

ইউরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে বিভিন্ন সময়ে এমন অনেক কবি সাহিত্যিক জন্মেছেন যাঁদের সাহিত্যরচনার প্রতিভা ও চিত্ররচনার শক্তি দুইই ছিল। এঁদের সকলেই যে সাহিত্যে ও শিল্পকর্মে সমান অধিকারী ছিলেন, এমন নয়; সাহিত্য ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার এবং সমান যশ অর্জন করেছেন এমন কবি-শিল্পী যে জন্মগ্রহণ করেন নি তাও নয়। ইংরেজ কবি ব্লেক এমনই এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রতিভার অমরত্ব কবি ও চিত্রকর সমাজে সমানভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

ইউরোপে সাহিত্য ও শিল্প, কাব্য ও চিত্রকলার মধ্যে একটা দূরত্ব প্রায় বরাবরই থেকে গেছে। সেইজন্যেই সে দেশে কবি-চিত্রকরের সংখ্যা চীন-জাপানের তুলনায় কম। চীন-জাপানের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কাব্য ও চিত্রকলার মধ্যে ব্যবধান আনতে দেয় নি, তাই সে দেশে কবি-চিত্রকরের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন নয়। চীনা আদর্শ অনুযায়ী আমাদের দেশে অবনীন্দ্রনাথকে কবি-চিত্রকর বলতে দোষ নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে পারতেন বা তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন এতে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ যে পথে চিত্রের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন সে পথ সত্যই নতুন রকমের, সাধারণ নিয়মের বাইরে।

ইউরোপের সাহিত্যজগতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা চলে এমন কোনো কবি-চিত্রকর জন্মেছেন কি না জানি না। কবি ব্লেক বা নাট্যকার স্টিনবার্গএর সঙ্গে তুলনা ঠিক মেলে না। জীবনের শেষে ক্লান্ত লিওনার্দো দাভিঞ্চির রূপকথা বা মাইকেল এঞ্জেলোর সনেট-চর্চা অনেকটা একরকম। উভয় ক্ষেত্রেই দেখি, অসাধারণ প্রতিভার নতুন পথে শেষ অভিসার। কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর মিল দেখা যায় চীনা কবি-শিল্পীদের। এ মিল চিত্ররচনায় বা আঙ্গিকে নয়, মিল এখানে দৃষ্টিভঙ্গির। উভয় ক্ষেত্রেই চিত্রের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের সন্ধান। রবীন্দ্রচিত্রের অভাবনীয়তা ও অলৌকিকত্ব অনেক ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু কোথায় সেই অভিনবত্ব বা অলৌকিকত্ব তা এই শ্রেণীর গুণগ্রাহী যাঁরা তাঁরা স্পষ্ট করে নির্দেশ করতে পারেন নি। পরিবর্তে এমন কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রচিত্র থেকে তাঁরা দেখিয়েছেন যা কোনো কারণেই অলৌকিকত্ব দাবি করে না। রবীন্দ্রচিত্র সম্বন্ধে এমন অনেক বিপরীত ও পরস্পরবিরোধী উক্তি একই লেখকের একই লেখার ভিন্ন ভিন্ন অংশে পাওয়া যায় যে, সেগুলি বিনা বিচারে গ্রহণ করা সহজ নয়, এবং বিচার করে দেখতে গেলে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। রবীন্দ্রচিত্রের রসগ্রাহী সমালোচকদের মতের ও বিচারের অনৈক্য ঘটার কারণ তাঁদের বুদ্ধি বা বিচারক্ষমতার অভাব হয়তো নয়, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও সাময়িক অবস্থার প্রভাব তাঁদের মতামতকে সহজভাবে ব্যক্ত হতে দেয় নি।

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যসাধনার চরম সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন এমন সময়ে জীবনের শেষ অঙ্কে তাঁর চিত্রসাধনা শুরু হল। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ জনসমাজে যখন আত্মপ্রকাশ করলেন কবি রবীন্দ্রনাথের

যশোরশ্মি তখন দিকে দিকে ছড়িয়েছে। তাই তাঁর অঙ্কিত চিত্র যখন ইউরোপের রসিকসমাজে প্রদর্শিত হল তখন কৌতূহলী গুণগ্রাহী দর্শক এবং তাদের প্রশংসাপূর্ণ অভিনন্দন পেতে বিলম্ব হয় নি। কিন্তু সেইসব উচ্চ প্রশংসা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কিঞ্চিৎ সংকুচিত ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একদিকে যেমন কবি রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ও তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রশংসাবাক্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, তেমনি তৎকালীন শিল্পরুচির সাময়িক প্রভাবের পরিচয়ও কতকগুলি উক্তিতে পাওয়া যায়। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের চিত্র যখন প্যারিস-বার্লিনে পৌছল তখন সে দেশে চিত্রকলা ভেসে চলেছে অনির্দিষ্ট পথে। অনেক ভাঙাগড়া, আঙ্গিকের অনেক বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এসে প্যারিস-বার্লিনের রসিকসমাজ কিছুটা ক্লান্ত। এই ভাঙাগড়া ওলটপালটের মধ্য দিয়ে শিল্পশাস্ত্রের অনেক আপ্তবাক্যকে তাঁরা ছেড়েছেন, চোখ মেলে নতুন কিছু দেখবার তাঁদের আগ্রহ ছিল, ঔৎসুক্য ছিল, প্রয়োজনও ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের ছবির ব্যক্তিকেন্দ্রগত রূপ দেখে তাঁরা ঘাবড়ে যান নি। বরং তাঁদের অনেকেই চকিতে রবীন্দ্রনাথকে নব্য চিত্রকরদের দলভুক্ত করে নিলেন, এবং বলে উঠলেন, 'আমরা প্যারিসে ইউরোপের চিত্রকররা যা অনুসন্ধান করে পাই নি রবীন্দ্রনাথ তাই পেয়েছেন।' রবীন্দ্রচিত্রের এত বড় স্বীকৃতি আমাদের গর্বের কথা, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কী তাঁরা নতুন পেলেন সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ তাঁরা করেন নি। এই কারণেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও এই উক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারেন নি। তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'সেটা কী?' অর্থাৎ নতুনত্বটা কোথায়, কোথায় সেই গুণ যা ইউরোপ অনুসন্ধান করে পায় নি। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ফরাসি সমালোচকদের কাছ থেকে পান নি। তাঁরা কেবল বলেছেন, 'টাগোর, তুমি কি সে কথা বুঝতে পারবে?' এর পর জানতে আরও কৌতূহল হয়, কী সেই অনির্বচনীয় গুণ যা তাঁরা ভাষায় প্রকাশ করেন নি, এবং সে কোন্ তত্ত্ব যা রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি ও অনুভবের বাইরে। উচ্চ প্রশংসা ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্যজাল যাঁরা ছড়িয়েছিলেন তাঁদের আশেপাশে এমন কয়েকজন গুণী রসিক লোক ছিলেন যাঁরা বুদ্ধির দীপ্তিতে রবীন্দ্রশিল্পপ্রতিভার অন্তস্তল পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঁরা চোখ খুলে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছবি। মনের উপর অঙ্কিত বস্তুর প্রতিক্রিয়াকে তাঁরা প্রকাশ করেছেন, তাই এইসব চিত্রসমালোচকের সমালোচনায় রবীন্দ্রচিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা নেই। পরিবর্তে রবীন্দ্রচিত্রজগৎকে আবিষ্কারের তথ্য তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশক্তি, তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভা, ছন্দ-রূপের অচ্ছেদ্যতা সম্বন্ধে রচিত তাঁর রূপের সৃষ্টি— যে সৃষ্টি বাস্তব নয়, অথচ বস্তুর সত্তার মত সত্য, এমন এক বিশেষ গুণের আবিষ্কার তাঁরাই করতে সক্ষম হয়েছিলেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ছবিকে চোখে খুলে দেখতে পেরেছিলেন।

দৈবক্রমে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ উক্তিগুলিই আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়েছিল, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের শিল্প-রসিকরা এই উচ্ছ্বাসের প্রভাব এড়িয়ে চলতে অক্ষম হয়েছিলেন। প্রায়ই আমাদের চিত্র-রসিকদল ইউরোপীয় বিশেষভাবে ফরাসি উচ্চ প্রশংসারউচ্চতর কোলাহলে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের সত্যপরিচয় প্রায় লুপ্ত করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছবির মূল্য বিচার করবার পূর্বে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার। মনে রাখা

দরকার যে কবি রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার আগ্রহ ও প্রেরণা রসপ্রকাশের অবেগ থেকে নয়, বস্তুরূপের কোনো অংশ বা অবস্থা অনুকরণের চেষ্টা থেকেও নয়। ভাবাবেগ সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর। রবীন্দ্রচিত্র সম্পর্কে উল্লিখিত উক্তি ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে যেসব উক্তি 'রবীন্দ্র-চিত্রকলা' পুস্তকে উদ্ধৃত হয়েছে তারই সাক্ষ্যে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে বুঝতে পারব, রবীন্দ্রনাথের সচেতন মন চিত্রের ক্ষেত্রে কী অনুসন্ধান করেছিল। অন্তরের কোন্ স্তর থেকে চিত্ররচনার আনন্দ জাগছে। দৃষ্টান্তরূপে আলোচ্য পুস্তক থেকে নিজের চিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি দুইটি এখানে পুনরায় উদ্ধৃত করছি :

> স্পষ্ট বুঝতে পারছি, জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ। পৃ ৩৭

কিম্বা তাঁর বিখ্যাত উক্তি

> The world of sound is a tiny bubble in the silence of the infinite. The Universe has its only language of gesture, it talks in the voice of pictures and dance. পৃ ১৫

আরও অনেক উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রেরণা বোঝবার পক্ষে উপরোক্ত উক্তি দুটোই যথেষ্ট। চিত্রের জগতে প্রবেশ করবার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ এমন এক সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে সত্য তেমন প্রত্যক্ষভাবে ইতিপূর্বে তাঁর জ্ঞানের গোচর হয় নি।

চিত্রজগত রবীন্দ্রনাথের কাছে নূতন আবিষ্কারের মত বিস্ময়কর, অপ্রত্যাশিত। জগতের 'আকারে'র যাত্রা, ভঙ্গির প্রকাশ তাঁকে এক অবচ্ছিন্ন (abstract) আনন্দে পৌঁছে দিল। রবীন্দ্রনাথ সেই অবচ্ছিন্ন জগৎকে নূতন করে সৃষ্টি করলেন রেখার বাঁধনে, তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার শক্তিতে। রবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধান করে ফিরলেন রেখা ও রূপের সম্বন্ধ, রূপের অবচ্ছিন্ন সত্তা— বাস্তবের প্রতিকৃতি নয়।

যে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবনী শক্তি জাগ্রত থেকেছে সে পর্যন্ত তাঁর কলমের মুখে রূপের ছন্দ অভূতপূর্ব আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এই নামরূপহীন ভাবমুক্ত অসাধারণ আকার রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সৃষ্টি, এ বিষয়ে সংশয়ের সত্যই অবকাশ নেই। যতক্ষণ রবীন্দ্রনাথ এই অবচ্ছিন্ন জগতের আকার ও ভঙ্গিকে জ্ঞানের আলোকে অনুসরণ করেছেন ততক্ষণ তাঁর আনন্দের সীমা নেই। ক্লান্তিহীনভাবে তিনি চিত্ররচনায় মগ্ন থেকেছেন। কিন্তু যখনই তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি বাস্তব রূপের কাছে হার মেনেছে, যখনই তাঁর সৃজনের দৃষ্টি ভাবের দিকে ফিরেছে তখনই তাঁর ক্লান্তি এসেছে ; অবসাদের খেদোক্তি তখনই আমরা শুনি—'আমি ছবি আঁকতে শিখি নি' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার অসাধারণত্ব তাঁর চিত্রের তীব্র আকর্ষণ। অলৌকিক উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় তিনি রেখে গেছেন অনেকগুলি চিত্রে, যে চিত্র ভাবের জন্যে সুন্দর যে তা নয়। সে ক্ষেত্রে আকর্ষণ তীব্র কিন্তু স্বাদহীন ; কিন্তু বিস্বাদও নয়। এই abstract গুণই তাঁর চিত্রকে মহত্ত্ব দিয়েছে বলে আমার ধারণা।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব তাঁর আঙ্গিক করণকৌশল, চিত্রের শ্রেণীভাগ— এসবের অল্পবিস্তর আলোচনা পূর্বে কেউ কেউ করেছেন। রবীন্দ্র-চিত্রকলার লেখক এ বিষয়ে আলোচনা এমন সর্বাঙ্গীণ করবার চেষ্টা করেছেন যার তুলনা রবীন্দ্রচিত্রের পূর্ববর্তী কোনো আলোচনায় পাওয়া যায় না।

লেখক ঠিকই বলেছেন, রবীন্দ্রচিত্রের আঙ্গিক আলোচনা করতে গেলে বিষয়ের কথাও এসে পড়ে।

তবু প্রশ্ন থাকে, রবীন্দ্রনাথের চিত্রের বিষয়ের গুণে আঙ্গিককে দেখছি, না, আঙ্গিকই বিষয়কে বাঁচিয়ে রেখেছে? সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে অসাধারণ অধিকার ছিল, ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর যে ব্যুৎপত্তি ছিল, চিত্রের ভাষা সম্বন্ধে তাঁর সে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল না। কিন্তু চিত্রের ভাষার মূল সত্যকে তিনি দেখেছিলেন অনায়াসে, এবং সেই সহজ জ্ঞানকে ব্যবহার করেছিলেন নিঃসংকোচে। আলো-অন্ধকারের ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন বস্তুজগৎ ফুটে ওঠে আমাদের চোখের সামনে, তেমনি ছবিও গড়ে ওঠে আলো-ছায়া কালো-সাদার ঘাত-প্রতিঘাতে। মানুষ রেখার উদ্ভাবন ক'রে এই আলো-ছায়ায় চঞ্চল বস্তুরূপকে নির্দিষ্ট ছন্দে বাঁধতে পেরেছে। এবং রেখার বাঁধনে বাঁধা বলেই আলো-ছায়া চিত্রের জগৎকে বাস্তব জগৎ থেকে স্বতন্ত্র রেখে এক নূতন সত্তা দিয়েছে। এই রেখাছন্দ না থাকলে বস্তুজগতের সঙ্গে চিত্রজগৎ একাকার হয়ে যেত। স্বতন্ত্র করে চিত্রকে চিত্র বলে আর চেনা সম্ভব হত না। রবীন্দ্রনাথ বস্তু-অস্তিত্বের এই মূল সত্যকে জেনেছিলেন, তাই তাঁর চিত্র আলো-ছায়ায় স্পষ্ট; কালো-সাদার বাঁধন, কঠিন রেখার ছন্দ সেখানে অনবদ্য। ছবির আঙ্গিক বা করণকৌশলের নূতনত্ব আবিষ্কারের সামান্যতর চেষ্টাও রবীন্দ্রনাথের ছবিতে দেখা যায় না। তাঁর করণকৌশলের এক উদ্দেশ্য, এক চেষ্টা— ছবিকে ছবির রাজ্যে ফুটিয়ে তোলা। কলমের আঁচড়ে, রঙে ডোবানো ন্যাকড়ার ছোপে, আঙুলের ঘষায় ছবিকে কালো-সাদার রাজ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ছবির রাজ্যে তাঁর রচিত রূপ সত্য হয়ে ওঠে এই তার লক্ষ্য। এবং বোধ হয় কখনোই তিনি এই সত্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রেরণার গতি ও লক্ষ্য যেমন একদিকে অভিনব তাঁর করণকৌশল তেমনি সহজ ও সাধারণ।

লোকসাহিত্যের ভাষা যেমন রীতিধর্মী, শব্দ বা অলংকারের লেশহীন, সরল, অথচ তার গতিবেগ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে চলেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রের ভাষা সরল অনাড়ম্বর; কিন্তু তার গতিবেগ যেমন, লক্ষ্যও তেমনি নির্দিষ্ট। লোকসাহিত্যের ভাষা যেমন লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তার নানা দোষত্রুটি ধরা পড়ে তেমনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রের ভাষা যে পর্যন্ত লক্ষ্য স্থির রেখেছে সে পর্যন্ত তা ত্রুটিহীন মনে হয়, কিন্তু কিঞ্চিৎমাত্র লক্ষ্যচ্যুত হবার সম্ভাবনাতে দেখা দেয় নানা ত্রুটি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনার ইতিহাস, তাঁর চিত্রকলার বিবর্তন, আঙ্গিক করণকৌশল ইত্যাদি সব দিক দিয়ে আলোচনার পর আমাদের জানতে কৌতূহল হয় রবীন্দ্রচিত্রের রসতত্ত্ব। রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়, তাঁর অবচ্ছিন্ন রূপছন্দমূলক ছবির উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর ছবির গুণগ্রাহী অনেক আছেন কি না জানি না।

এর পর আমরা দেখি কতকগুলো আশ্চর্য জীবজন্তু, অদ্ভুত ইমারত ইত্যাদি। ইউরোপীয় ক্রিটিকরা বলেছেন, এরা জন্তু বটে, কিন্তু চিড়িয়াখানায় এদের সাক্ষাৎ মেলে না, রাত্রের দুঃস্বপ্নে এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'সে' বই যাঁরা পড়েছেন তাঁরা বুঝবেন, রবীন্দ্রনাথের এই জীবজন্তুরা নানা ভঙ্গিতে আমাদের দেখা দিচ্ছে, কিন্তু অন্তরালে রয়েছে রহস্যময় 'সে', যার দ্বারা এইসব জীবজন্তুর নড়াচড়া নির্দিষ্ট হচ্ছে। 'সে' বইখানিতে যেমন উপলক্ষ্য অনেক, কিন্তু লক্ষ্য আমাদের অগোচরে দুর্জ্ঞেয় রহস্যরূপে বিরাজ করছে, তেমনি দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় জগৎ থেকে এসেছে রবীন্দ্রনাথের জীবজন্তুর বহু বিকট মূর্তি। ক্রমে ক্রমে এইসব জীবজন্তুর বিকট আকারের সঙ্গে তাল রেখে দেখা দিল মানুষের মুখভঙ্গি। এইসব মুখভঙ্গি

কি কোনো একটা বিশেষ ভাবপ্রকাশক বা বস্তুরূপকে আকারের নির্বিকার লোকে নিয়ে যাবার জন্যে যে লড়াই, তার ইতিহাস এগুলি ? মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, অবচেতন মনের অতি গভীরে অবদমিত কামনার প্রকাশ এগুলি। যেমনই হোক, জ্ঞানের নির্বিকার সাধনা থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি দূরে চলে এসেছেন, এ সময়ে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রের বিবর্তনের শেষদিকে কতকগুলি দৃশ্যচিত্র, অনেকগুলি মানুষের প্রতিকৃতি পাই যা নির্বিকার আকারও নয়, আবার বিকট ভয়ংকর রকমের অদ্ভুতও নয়। এগুলিতে তাঁর পূর্বেকার রচনার মত মিষ্টত্বহীন তিক্তকষায়মিশ্রিত যে বিশেষ একপ্রকারের স্বাদ তা নেই, পরিবর্তে মিষ্টতর, মনোরম স্বাদপূর্ণ বাস্তব ভাবের আশ্রয়ে এদের আত্মপরিচয় সহজ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের বক্রতায় একটা নাটকীয় ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রচিত্রের গুণগ্রাহীরা এই শ্রেণীর চিত্রকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বা তাঁর অলৌকিক সৃষ্টি বলে মনে করেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তির উল্লেখ করে পূর্বেই দেখিয়েছি যে ভাবপ্রকাশ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। 'ভাব আমি নিংড়ে নিই অন্য ক্ষেত্রে' এ জাতীয় উক্তিও রবীন্দ্রনাথের আছে। চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ নিজের ছবি সম্বন্ধে যা বলেছেন তা অভ্রান্ত সত্য নাও হতে পারে ; কারণ, সেদিকে লেখকের যুক্তি

Great art is an unconscious creation. পৃ ৫

কাজেই এ কথা হয়তো বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথ নিজে না জেনেই গভীর ভাবসকল প্রকাশ করেছেন তাঁর ছবিতে। যদি আমরা স্বীকার করেও নিই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে অলৌকিক ভাবসকল প্রকাশ করেছেন তা হলেও প্রশ্ন থাকে, যে ভাব তাঁর চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা মনে করছি সেগুলি ভাবের তীব্রতা বা গভীরতার জন্যে অলৌকিক, না, তার মানবীয় পরিবেশ আমাদের আকর্ষণ করে ? রবীন্দ্রচিত্রে সৃষ্টিশক্তি, উদ্ভাবনী প্রতিভা, এমনকি তাঁর রচিত চিত্রে ভাবের প্রকাশ ও সেক্ষেত্রে অলৌকিকত্ব মেনে নিলেও সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যা এই, আমাদের সংশয়ী মন প্রশ্ন করে— চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ কি কবি রবীন্দ্রনাথের মতই অসাধারণ ? রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা কি তাঁর কাব্যপ্রতিভার মতই গগনস্পর্শী ? রবীন্দ্র-চিত্রকলার লেখক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়ের মনে এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ মাত্র নেই। পুস্তকের মুখবন্ধে অকুণ্ঠিতভাবে তিনি বলছেন—

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। অন্যের মতামতের অপেক্ষা না করে আমার নিজের যতটুকু রসানুভূতির ক্ষমতা তা থেকে আমি এ কথা বলতে পারি।

রবীন্দ্র-চিত্রকলা বইখানিতে লেখক পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। মনোরঞ্জনবাবুর সমালোচক মন যুক্তিবাদীর নয়। শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমেরই সঙ্গে, পরম ধৈর্যের সঙ্গে নানা তথ্য সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত মতামতকে সর্বসাধারণগ্রাহ্য সত্যের পদে স্থাপিত করতে যথাসাধ্য পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। এই জাতীয় আলোচনায় বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত অপরকে গিলিয়ে দেবার চেষ্টা থাকে। আশ্চর্যের বিষয় যে, বইখানির কোনো অংশে অসাবধানতাবশতঃও লেখক সে চেষ্টা করেন নি। লেখক সকল বিষয়েই প্রামাণিক উক্তির দ্বারা নিজের মতামতের সত্যতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে লেখক চীনা calligrpahyর মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি উৎকৃষ্ট উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। নিজের ছবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তির সঙ্গে calligraphy সম্বন্ধে চীনা

রসজ্ঞের উক্তি পাশাপাশি রাখলে দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্য ঐক্য আমাদের চমৎকৃত করে। লক্ষ্য করা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই প্রেরণার উৎস উজ্জ্বল জ্ঞানের জগৎ।

ছবির ছন্দ মানে কী, বোঝাতেই প্রধানত চীনা calligraphyর উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু 'ছন্দ' যেখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে তেমন ছবির কোনো দৃষ্টান্ত বইখানিতে নেই। বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিষয়ক ছবির দৃষ্টান্তও যেমন নেই, তেমনি সে বিষয়ে লেখক তেমন বিশদ আলোচনাও করেন নি। রবীন্দ্রনাথের একটা উক্তি বইখানিতে উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে তিনি যা বলেছেন তার ভাবার্থ এই যে, 'আমি কী করতে চেয়েছি আর কী করেছি নিজে জানি না'। যদিও রবীন্দ্রনাথ কী করতে চেয়েছেন তা তিনি অন্যত্র বলেছেন। কিন্তু এই সাময়িক উক্তি স্বীকার করে নেবার পরেও রবীন্দ্রনাথের abstract ছবি দেখে বলা যায়, কী তিনি চেয়েছিলেন আর কী তিনি করেছেন।

বইখানির শেষে এক অধ্যায়ে লেখক রবীন্দ্রচিত্র সম্বন্ধে নানা মত উদ্ধৃত করেছেন। ইউরোপীয় সমালোচক-দর্শকরা রবীন্দ্রচিত্র সম্বন্ধে যেসব উক্তি করেছেন তার বহু অংশই লেখক উদ্ধৃত করেন নি। বিশেষ রকমের এক দিকের উক্তিই তিনি উদ্ধৃত করেছেন। এই অসম্পূর্ণতার জন্যে লেখককে দোষী করতে পারি না। ইউরোপের লোকে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে ঠিক কী চোখে দেখেছিল, কত উচ্চে তাকে স্থান দিয়েছিল, এবং কী অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে তারা বিশ্লেষণ করেছিল, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের ধারণা হওয়া দরকার। সাহিত্য বা শিল্পের আলোচনায় অভ্রান্ত সত্য, অকাট্য যুক্তির স্থায়িত্ব প্রায়ই বড় ভঙ্গুর। সামান্য আঘাতে তথাকথিত অনেক অভ্রান্ত সত্য চূর্ণ হয়, যুক্তির অকাট্যতা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। কাজেই সে দিক থেকে ন্যায়ের যুক্তি তোলবার চেষ্টা করতে চাই না।

রবীন্দ্র-চিত্রকলা বইখানি প্রামাণিক গ্রন্থের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম, এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

কে জানে কার মুখের ছবি কোথার থেকে ভেসে
ঠেকল অনাহূত, আমার তূলির ডগায় এসে।
সাইকোএনালিসিস্‌-যোগে ইহার পরিচয়
পণ্ডিতেরা জানেন স্পষ্ট, আমার জানা নয়॥

—রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবম বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৫৭ - আষাঢ় ১৩৫৮

রচনাসূচী

চিত্রসূচী